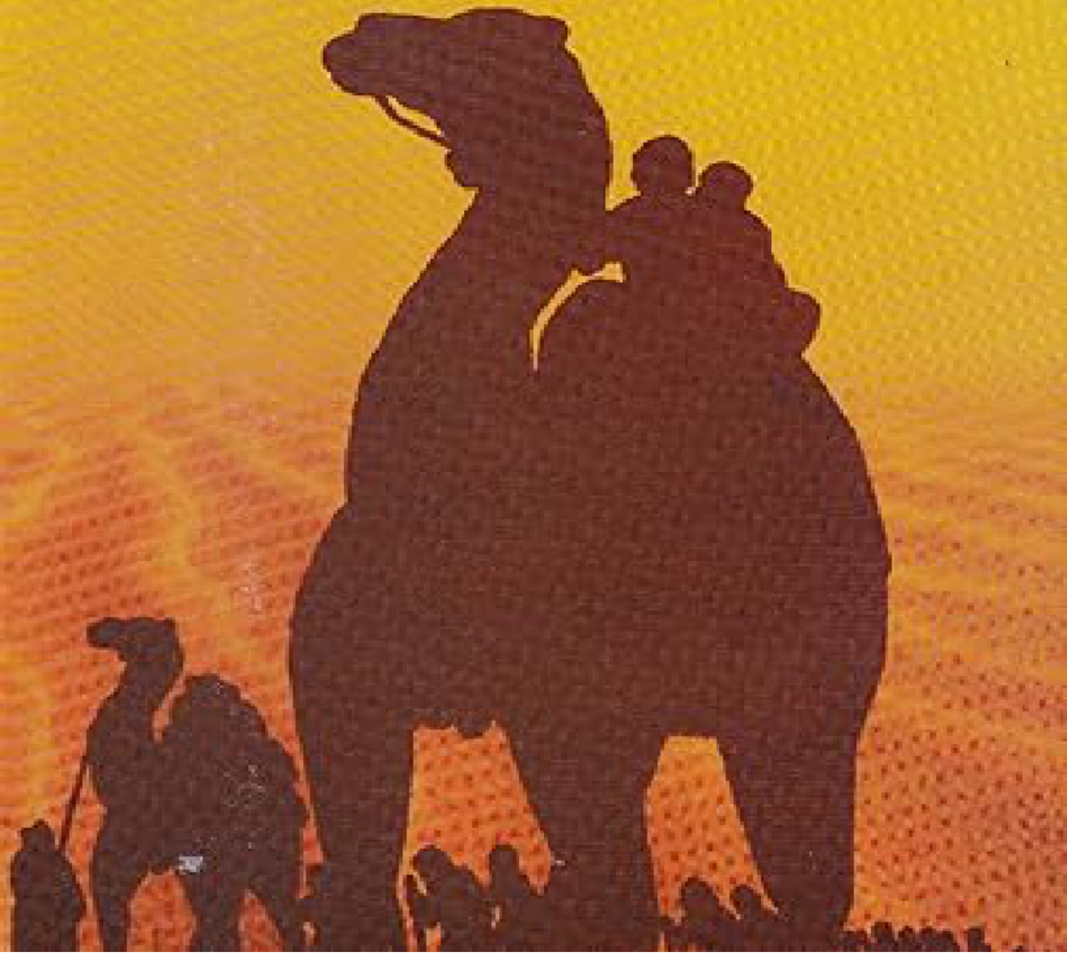
মরুতীর্থ হিংলাজ

অবধূত



মরুতীর্থ হিংলাজ

অবধূত

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা – ১২

দ্বিতীয় সংস্করণ
পাঁচ টাকা

মিত্র ও ঘোষ ১০ শ্যামাচরণ দেশ স্ট্রিট কলিকাতা ১২ হইতে শ্রী ভানু রায় কর্তৃক প্রকাশিত
প্রভু প্রেস ৩০ কর্ণওয়ালিশ স্ট্রিট, কলিকাতা ৬ হইতে শ্রী প্রাণকৃষ্ণ ভট্টাচার্য কর্তৃক মুদ্রিত

উৎসর্গ

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রো জয়তু
শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রায় গ্রন্থহয়মপর্য্যতে ময়া

কৈফিয়ৎ

একদা হিংলাজ দর্শনে গিয়েছিলাম। বই লেখার কথা তখন মনের কোনেও উদয় হয়নি। আমার বন্ধু চুনী ঘোষের মামা শ্রদ্ধেয় কবি সুবোধ রায় মহাশয়ের সঙ্গে পরিচয় না ঘটলে কোনদিন কিছু লিখতেও বলতাম না। এর সংস্পর্শে এসে এই অসাধ্য সাধন করতে বাধ্য হলাম।

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সহজ লোক নন। তার হুকুম অমান্য করার শক্তি আমার ছিল না তিনি যখন হুকুম করলেন শেষ করে ফেলুন লেখাটা তখন মরিয়া হয়ে শেষ করে ফেললাম এরা দুজনে বইখানি লেখার জন্য দায়ী আজ যদি এদের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে যাই সেটা বাঁচলতা করা হবে। আমার কৃতজ্ঞতা এদের নাগাল পাবে না নতুন পাথেয় পত্রিকায় তারা এবং তরুণের স্বপ্ন পত্রিকার এরা আমাকে ভালোবাসা দিয়ে কিনে রেখেছেন নেপথ্যে বসে যিনি নিরলস পাহারা দিয়েছেন বানান ভুলের উপর তার নাম শ্রীকৃষ্ণ দয়াল বসু। এই ভয়াবহ কাজটি আমাকে করতে হলে কোন কালে এ বই ছাপা হতো না এই নিরাশ দায়িত্ব তিনি স্বেচ্ছায় বহন করেছেন তাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা জানাচ্ছি।

ভৈরবীর স্মৃতিশক্তির সহায়তা না পেলে এ কাহিনী লেখা সম্ভব হতো না। অতদিন আগেকার ঘটনার খুঁটিনাটি সবই তার মনে আছে কাজেই তার স্মৃতিশক্তির কথা উল্লেখ না করা অন্যায় হবে।

ইতি-

আষাঢ় ১৩৬২

অবধুত

স্বীকৃতি

প্রকাশক জানালেন "প্রথমবার যা ছাপা হয়েছিল সব ফুরিয়ে গেছে, আবার বই ছাপাখানায় পাঠাচ্ছি নতুন যদি কিছু বলবার থাকে তা লিখে পাঠান।"

হিতৈষীরা বললেন "আগাগোড়া ভালো করে দেখেশুনে দাও, বড্ড কাঁচা হাতের ছাপ রয়েছে বহু জায়গায় গুরুচন্ডাল দোষ ঘটেছে।"

ভাবতে বসলাম এবং সভায় ভাবা বন্ধ করলাম। ভালো করতে গিয়ে যদি আরো মন্দ করে বসি, তা-হলে উপায়? তারচেয়ে যেমন আছে থাক, আমি সাহিত্যিক নই, সুতরাং আমার সাত খুন মাফ।

দোষ গুণ সুদ্ধ ভালোলাগাই আসল ভালোলাগা। যারা পড়বেন তারা যে খুঁতখুঁতে স্বভাবের মানুষ তাই বা আমি মনে করতে যাব কেন।

লিখে পাঠালাম "আমার কিছু বলবার নেই যা খুশি আপনারা বলুন ।"

ইতি-

মাঘ ১৩৬২।

অবধূত

আবেদন

নুক্‌, কিন্ডেল, কবো বা ট্যাব ছাড়া ই-বই পড়ার অদম্য আগ্রহ থেকেই এই ইপাব তৈরি যা খুব সহজেই হাতের স্মার্টফোনে যে কোন অবসরেই পড়ে ফেলা যায়। আলাদা করে ই-বুক রিডার কেনার কোন প্রয়োজন নেই বা পিডিএফের মত জুম করে ডান-বা দিকে সরিয়ে পড়ারও দরকার নেই।

কিন্তু অন্তর্জালে পছন্দের বাংলা বইয়ের পিডিএফ যাও বা পাওয়া যায়, ইপাব অপ্রতুল। ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ও প্রচারের জন্য তাই নিজের সোশ্যাল মিডিয়ায় (ফেসবুক, ইনস্টাগ্রাম, টুইটার, লিঙ্কডইন ইত্যাদিতে) এই ইপাব ছড়িয়ে দিতে হবে।

প্রচ্ছদ, প্রকাশনা, উৎসর্গ ও ভূমিকা (যদি কিছু থাকে) ইত্যাদি প্রথম দিকের পাতাগুলো দেখতে না পেলে ঠিক বই বই বুঝতে অসুবিধা হয়, তাই তথাকথিত এই অপ্রাসঙ্গিক পাতাগুলিও রাখা হয়েছে।

অন্তর্জাল থেকে পছন্দের বইয়ের পিডিএফ নামিয়ে টেক্সটে রূপান্তরিত করা- এ কাজে ভি-ফ্ল্যাটের এখনো কোন জুড়ি নেই। এবার একে ওয়ার্ড বা অন্য কিছুতে এডিট করে ক্যালিবার এর সাহায্যে ইপাব। এটাই সহজ পদ্ধতি।।

ভি-ফ্ল্যাটের সাহায্যে পিডিএফ থেকে তৈরি, ভুল থাকলে জানান। বইটির বিষয়বস্তু ইন্টারনেটের বিভিন্ন ওয়েবসাইটে প্রকাশ্যেই উপলব্ধ। সমালোচনা, মন্তব্য, প্রতিবেদন, শিক্ষাদান, বৃত্তি এবং গবেষণার মতো অলাভজনক শিক্ষামূলক বা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য, বাণিজ্যিকভাবে বিতরণের জন্য কখনোই নয়।



[মরুতীর্থ হিংলাজ বাংলা ভাষায় রচিত একটি আত্মজৈবনিক কাহিনি। এটির রচয়িতা অবধূত তথা দুলালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। বইটি ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। পাকিস্তানে বেলুচিস্তান প্রদেশে অবস্থিত মরু এলাকা হিংলাজ' হিন্দুদের একটি তীর্থস্থান; ৫১ শক্তিপীঠের এক পীঠ।

মন্দিরের নামেই গ্রামটির নাম হিংলাজ। বাংলা, হিন্দি, অসমীয়া ও সিন্ধি ভাষায় দেবীর নাম হিংলাজ হলেও মূল সংস্কৃত শব্দটি হলো "হিঙগুলা"।

হিংলাজের তীর্থযাত্রীরা সেকালে যেতেন উটের পিঠে চড়ে। যাত্রা শুরু হত করাচি শহরের কাছে হাব নদীর ধারে। সঙ্গে থাকত এক মাসের রসদ, যেমন শুকনো খাবার, মরুদস্যুদের প্রতিরোধ করার জন্য অস্ত্র, পানীয় জল ইত্যাদি। এছাড়া সঙ্গে থাকত হিংলাজ মাতার প্রসাদের জন্য শুকনো নারকেল, মিছরি, বাতাসা ইত্যাদি। এক মাসের অত্যন্ত কঠোর যাত্রার পর শ্রান্ত তীর্থযাত্রীরা পৌঁছতেন হিংলাজে। অঘোর নদীতে স্নান সেরে তাঁরা দর্শন করতে যেতেন হিংলাজ মাতাকে। এই মন্দির স্থানীয় বালুচ মুসলমানদের কাছেও পরম আদরণীয়। তাদের কাছে এটি "নানী কী হজ" নামে পরিচিত।

হিংলাজের মন্দিরটি একটি গুহার মধ্যে অবস্থিত। এটি আসলে একটি অগ্নিকুণ্ড। অগ্নিজ্যোতিকেই হিংলাজদেবীর রূপ বলে মানা হয়।

বাঙালী ঔপন্যাসিক কালিকানন্দ অবধূত-রচিত 'মরুতীর্থ হিংলাজ এবং 'হিংলাজের পরে' উপন্যাস-দুটিতে হিংলাজ ও কোটেশ্বর তীর্থদ্বয়ের বিস্তৃত ও অনুপুঙ্খ বিবরণ রয়েছে।

বইটি কেবল হিংলাজে গমনাগমনের কাহিনী নয়, এতে আছে একজন সংসারবিরাগী মানুষের জীবনদর্শন। চমৎকার গদ্যের জন্য এর সাহিত্যমূল্যও উঁচু। প্রথম স্ত্রীর মৃত্যুর পর দুলালচন্দ্র সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করেন এবং উজ্জয়িনীর মহাকাল মন্দিরে গিয়ে অবধূত হন। তাঁর নতুন নাম হয় কালিকানন্দ অবধূত। অবধূত বলতে একরূপ সাধক বোঝায়। হিংলাজ যাত্রা শুরু হয় বাংলা ১৩৫৩ সনের আষাঢ় মাসে। এই উপন্যাসটি অবলম্বনে ১৯৫৯ সালে একটি জনপ্রিয় চলচ্চিত্রও নির্মিত হয়, যার কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেন বিকাশ রায় ও উত্তমকুমার।]

মরুতীর্থ হিংলাজ – অবধূত

১

১৩৫৩, আষাঢ় মাস। ছিটে-ফোঁটা বৃষ্টিরও দেখা নেই। ধূলার সমুদ্রের মাঝে সর্বপ্রকার আভিজাত্যের ছোঁয়া এড়িয়ে করাচী শহরের শেষ প্রান্তে একটি বস্তি, সেইখানে নাগনাথের আখড়ায় অতি প্রাচীন দালানটার এক কোণে আশ্রয় নিয়েছি হিংলাজ-যাত্রী আমরা কয়জন।

এই স্থানটি করাচী শহরের অনেকগুলি ফালতু মানব মানবীর রাত্রের আস্তানা। পথে কাটে যাদের দিন, তাদের অনেকে রাতটা এখানেই কাটায়। সারাদিনের দেওয়া-নেওয়ার হিসাব নিকাশের জের রাতের আঁধারে এখানেই টানা হয়। পাশাপাশি শয়ন করলে জনা-শতেক লোক এখানে ধরে। কিন্তু গরজ যখন অনেকের তখন একটু আপদ-বালাই যে ঘটবেই তাতে সন্দেহ কি-তার ওপর অনেকের আবার তিন দিক খোলা দালানটায় ওরই মধ্যে একটু আড়াল সম্ভব হওয়া চাই। বিড়ি ধরাবার প্রয়োজনে রাত্রে দিয়াশলাই জ্বালানোও নিষিদ্ধ। শালীনতায় আঘাত লাগতে পারে।

এই নাগনাথের আখড়া একদা নাথ-সম্প্রদায়ের সাধুরা স্থাপন করেন। সেই একদা যে কবে তার ইতিহাস জানা অসাধ্য। কালে তাঁরা যথাস্থানে প্রস্থান করেছেন। বর্তমানে আখড়া যারা দখল করেন তাঁরাই এর চারিদিকে সসংসার বসবাস করছেন।

এঁদের পেশার অন্ত নেই। জুতা সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ পর্যন্ত। তার মধ্যে বড় পেশা-বছরে দু-একদল যাত্রী নিয়ে হিংলাজ যাত্রা। একদা সাধুরা এই আখড়া স্থাপন করেন হিংলাজ দর্শনাভিলাষী সাধুসন্তের আশ্রয়স্থানের অভাব পূরণের জন্যেই।

কিন্তু আজ যাঁরা পেশা হিসাবে হিংলাজ-যাত্রী নিয়ে তীর্থদর্শন করাতে যান তাঁদের পোড়া পেটের দাবি মেটাবার মতো উদ্বৃত্ত এ পেশায় সম্ভব নয়। সারা ভারত থেকে প্রাণের মায়া ত্যাগ করে রসকষহীন এই তীর্থে যাত্রীই বা জোটে কয়জন? যদিও বা কেউ আসেন তিনি হয় লোটা-কম্বল-চিমটা-সম্বল মাকে-খানেওয়ালা অথবা বড়জোর একদল কাথওয়াড়ী চাষি। সম্বল যাদের আটা লবণ মরিচ ও কম্বল।

সুতরাং হিংলাজের ছড়িদারদের সংসার ও সংসার-লক্ষীদের চেহারায় আর যে কোনো পরিচয়ই থাকুক, শ্রী ও শান্তির চিহ্নমাত্র নেই, থাকতেও পারে না।

দু-জন চার-জন করে জমতে জমতে শেষ পর্যন্ত যাত্রীদল ত্রিশ পর্যন্ত পৌঁছল গোটা এক মাস অপেক্ষা করে। আর অপেক্ষা করাও সম্ভব নয়। পথের নদীগুলো শুকনো থাকতেই ফিরে আসা চাই। অনেকবার নাকি এমনও ঘটেছে যে নদীর জল বৃদ্ধির ফলে দিনের পর দিন আটকে পড়ায় যাত্রীদলের আহার্য গেছে ফুরিয়ে, তারা আর কখনো ফিরে আসেনি। পরের বছর যারা গেছেন তারা এখানে-ওখানে বালুর ওপর রাশি রাশি শুকনো শুভ্র হাড় দেখতে পেয়েছেন।

ছড়িদারদের তরফ থেকেও এবার যাত্রার তাগিদ দেখা দিল। এখন উটওয়ালা এলেই হয়।

গোটা একটা মাস পার হয়ে গেল সেই নাগনাথের আখড়ার দালানটায়। নিশীথ রাত্রে চারিদিকের রহস্যময় ঘুমন্ত মানুষগুলির মধ্যে শুয়ে কত কি যে ভাবতাম-জন্ম মৃত্যু, পাপ-পুণ্য, ইহকাল-পরকাল। কোনো কিছুরই কূল-কিনারা নেই। সারা জীবনটা চোখের সামনে গড়গড় করে বয়ে চলে যেত। আমি নামক লোকটি যেন এই জীবন-নাটকটার নাম ভূমিকার অভিনেতা। কিন্তু নাটকটা যাঁর লেখা-তাঁর ইচ্ছা ও মর্জির বাইরে এক পা ফেলবার ক্ষমতা আমার নেই। সবচেয়ে বড় মজা, এখনও যে অঙ্কগুলি বাকি আছে-তাতে যে আমাকে কি অভিনয় করতে হবে, তাও জানবার উপায় নেই।

ঐ যে দূরে আকাশের পশ্চিম দিকে আস্তে আস্তে সন্ধ্যাতারাটি চলে যাচ্ছে, ঐ দিকেই কোথাও হিংলাজ। আজও জানি না ঐখানে পৌঁছানো আমার কপালে ঘটে উঠবে কিনা! আর এই সুদীর্ঘ ধৈর্য পরীক্ষার শেষ ফল যখন মিলবে তখন কৌতূহল নিবৃত্তির আফশোস ছাড়া আর কি আমার ঘরে পড়বে তাই বা কে জানে!

দীর্ঘনিঃশ্বাস আপন হতেই বুক থেকে বেরিয়ে আসে। ছুটে চলেছি যেখানে সতীর ব্রহ্মরন্ধ্র পড়েছিল, সেই মহাপীঠ হিংলাজে। ভগবান রামচন্দ্র রাবণ-বধ করে ব্রহ্মহত্যার পাপ-ভাগী হয়েছিলেন, তাঁর সেই পাপস্খলন হয় এই মহাতীর্থ-দর্শনে। অত বড় পাপ অবশ্য আমার হিসাবের ঘরে জমা থাকা সম্ভব নয়। এ যুগে ব্রাহ্মণ কোথায় যে ব্রহ্মহত্যার পাপ ঘটবে আমার! তবে অন্তত এইটুকু আমার কপালে নিশ্চয়ই জুটবে যাতে আমার এই জীবন-নাটকের অনাগত অজানা অঙ্কগুলিতে ছুটোছুটির পালা আর থাকবে না, আকুলি-বিকুলির যবনিকাপাত হবে। এই আশাটুকুই মনের কোণে চেপে আগামী কালের অপেক্ষায় পাশ ফিরে শুই।

দিনের বেলা ব্যস্ত থাকি-পাথেয় জোগাড়ে। শেঠ ভগবান দাস সব থেকে বড় সোনার ব্যবসায়ী করাচী শহরে। তিনি কলকাতার কালি আর গৌহাটির কামাখ্যা মাকে দর্শন করেছেন। তিনি ব্যবস্থা করলেন আমাদের হিংলাজ দর্শনের। কামাখ্যার তান্ত্রিক ভৈরব-ভৈরবীর প্রতি তার অটল আস্থা-যদিও তিনি নিজে গোড়া জৈন। পোকা খাবার ভয়ে অর্থাৎ পাছে জীবহত্যা হয় এ কারণে সন্ধ্যার পর তিনি জলও পান করেন না।

কিন্তু মুশকিল বাধল বাংলা দেশের আওরাতকে নিয়ে। হিংলাজ-পথের কষ্ট সহ্য করা কোনোক্রমেই তার পক্ষে সম্ভব নয়।

শেষ পর্যন্ত প্রচুর অর্থ ব্যয় করে একটা আস্ত উট ব্যবস্থা করলেন তিনি ভৈরবীর জন্যে। সেই উটের পিঠে উঠল মুখঢাকা টিনে টিনে বোঝাই চীনাবাদাম আখরোট

কিশমিশ খেজুর মিছরি আর বস্তা বস্তা চাল আটা লবণ মরিচ আলু পেঁয়াজ। বড় বড় বোম্বাই পেঁয়াজ কেন হিংলাজে চলছে? শেঠজি আমাদের বোঝালেন, বালুর মধ্যে এই পেঁয়াজ চিবিয়ে খেলে ‘লু লাগবে না আর পিপাসাও কম পাবে।

ব্যবস্থা এতই দরাজ হাতে হল যে দলসুদ্ধ সবাই মায় ছড়িদাররা আমাকে মোহান্ত মহারাজ বলে ডাকতে শুরু করলে।

তারপর বিপুল পরিমাণ লটবহরকে দুই ভাগে ভাগ করে উটের দু-ধারে ঝুলিয়ে দেওয়া হল, তাতে তার পিঠের উপর খানিকটা সমতল স্থান তৈরি হল। তার উপর একটা খাঁটিয়া চিত করে পেতে উটের সঙ্গে আচ্ছা করে বেঁধে দেওয়া হল। শেষে খাঁটিয়ার পায়া চারটে ঘিরে দড়ি বাঁধা হল। সেই চিত করা খাঁটিয়ার মধ্যে দড়ি ধরে বসে চললেন ভৈরবী। তাজ্জব ব্যাপার হচ্ছে এই যে, যাওয়া আসার ষোল দুগুণে বত্রিশ দিন দৈনিক আধঘণ্টা হিসাবে সমানে তিনি ঝাঁকি খেলেন। আর সে কি ঝাঁকানি! উট এক কদম চরণ ফেললে ঈশান অগ্নি নৈঋত বায়ু চারকোণে চারবার টাল সামলাতে হয় তাঁকে যিনি উপরে চড়ে বসে থাকেন। কিন্তু কোনো অভিযোগের কোনো তোয়াক্কা নেই ভৈরবীর। খুশি মনে সামনের চীনাবাদাম ও খেজুর চিবনোই হচ্ছে তার কাজ। একেবারে রাজসিক ব্যাপার। লটবহর নিয়ে যাত্রা আরম্ভ হল একদিন বিকেল তিনটের সময়। তার পূর্বে প্রত্যহ সকাল-সন্ধ্যা অষ্টপ্রহরে কমসে কম অষ্টআশী বার ‘উটওয়ালা কবে আসবে এই কথা জিজ্ঞেস করতে করতে আমাদের নাভিশ্বাস উঠবার উপক্রম হল। এদিকে আমাদের শ্রদ্ধেয় ছড়িদারগণ নির্বিকার ভাবে উত্তর দিতেন, “কে জানে কবে আসবে, সংবাদ তো দেওয়া হয়েছ; স্বাধীন মুল্লুকের লোক তারা, সবই তাদের মেজাজের উপর নির্ভর করে।”

স্বাধীন দেশের লোক উটওয়ালারা। আমরা যেখানে তীর্থ করতে যাব–সেইদেশ লাসবেলা স্টেট। করাচী সীমানা পার হয়ে সেই দেশের আরম্ভ এবং শেষ বালুচিস্থানের সীমানায়। সেখান থেকে আসবে সেই দেশের উট আর উটওয়ালা। লোক গুনে সরকাররে খাতায় লিখিয়ে দিয়ে আমাদের ভার নেবে সে। ফিরিয়ে দিয়ে যাওয়াও তার দায়িত্ব। রাস্তা সে-ই জানে, কিন্তু কার্যক্ষেত্র প্রমাণ হল, না তা নয়, জানে তার উট।

অবশেষে একদিন এসে পৌঁছল তারা চারজন। উটের মা ও মেয়ে দুজন, আর বাপ ছেলে উটওয়ালারা দুজন।

শেখ গুলমহম্মদ অর্থাৎ বাপ-মহাশয় বকতে বকতে উপস্থিত হলেন। তাঁর ভয়ানক ক্ষুধা এবং ক্ষুধার তাড়নাতেই এত বয়সে তাঁকে ঘর ছেড়ে এই শক্ত কাজ করতে হচ্ছে। সবই

নসীব! তবে হ, ধর্মপিপাসু 'নানী কি হজ' যাত্রিগণের তিনি নোকর, সুতরাং পরপারে তাঁর বেহেস্ত বাস ঠেকায় কে।

আমাদের সকলকে নত হয়ে বার বার সেলাম করে উটদের তিনি বলতে লাগলেন যে, তাদেরও জন্ম সার্থক, কারণ এ হেন পুণ্যাত্মা যাত্রিগণ ইতিপূর্বে আর কখনো আসেনি এবং এটা একেবারে সুনিশ্চিত যে, এবারের যাত্রায় খয়রাৎ যা জুটবে তাতে নিশ্চিন্তে এক বছর ঘরে বসে আরাম করা যাবে। আরও কত কি তিনি বলে যেতে লাগলেন কে তার হিসাব রাখে।

রৌদ্রদগ্ধ সাড়ে ছয়ফুট লম্বা গুলমহম্মদ এককালে রূপবান ছিলেন। পুত্র দিলমহম্মদও লম্বায় সাড়ে ছ'ফুট, স্বাস্থ্যও বেশ সুন্দর। রূপ, রং ও মুখ টিপে হাসি সমস্ত মিলিয়ে যেন রূপকথার রাজপুত্র। একমাত্র বিপদ হচ্ছে ওদের পরিধেয়গুলির দুর্গন্ধ। কলকাতায় কাবুলিওয়ালা দেখা যায় অনেক। সুতরাং এদের আকৃতি সম্বন্ধে সকলেরই মোটামুটি একটা ধারণা থাকতে পারে। কিন্তু সাজ-পোশাকের কদর্য নোংরা অবস্থাটা কল্পনা করাটা অসাধ্য। আর তাদের প্রকৃতির মাধুর্যের তুলনা দিতেও আমি সম্পূর্ণ অক্ষম।

বত্রিশ দিন এদের হাতে জীবন-মরণ, মান-ইজ্জত সব কিছু সমর্পণ করে জনমানবহীন আকাশ তলে ঘুরেছি আর প্রতি পদে পদে মর্মে মর্মে এই সত্যটুকু অনুভব করেছি যে, দরিদ্রতা আর নীচতা এক বস্তু নয়। সেবা করার প্রবৃত্তি উপদেশ শুনে বা বই পড়ে কারও মধ্যে গজায় না। সততা ব্যাপারটা পেনাল কোডও পুলিশের চোখ রাঙানিতে বেঁচে আছে এও সত্য নয়। ভাল-মন্দ, ন্যায় অন্যায়-এই সমস্ত প্রশ্নের বাইরে আলাদা আর একটা জগৎ আছে যেখানে নিদারুণ অভাবেও প্রকৃতির নিরাভরণ নিঃস্ব সন্তানেরা দরদওয়ালা বুকের ছাতি নিয়ে ঘুরে বেড়ায়। সেই বুকগুলির মধ্যে একমাত্র প্রেম ও ভালোবাসারই রাজত্ব। সেই রাজত্বের রাজা ও রাজপুত্র নির্বিকারচিত্তে আমাদের সকল দায়িত্ব তুলে নিলে।

আমাদের যাত্রা হল শুরু। উটের মায়ের পিঠে উঠল জনা-প্রতি বত্রিশ সের হিসাবে আটা লবণ মরিচ গুড়। মেয়ের পিঠে উঠলেন সভোজ্য ও সবস্ত্র ভৈরবী। দল বেঁধে বস্তির মেয়েরা ভৈরবীকে বিদায় দিতে ঘিরে দাঁড়াল। মেটে সিঁদুরে তাঁর কপাল লালে লাল, লাল সুতোর গুচ্ছ কবজি থেকে কনুই পর্যন্ত সকলে বেঁধে দিল। সকলের চক্ষু সজল।

সূর্য তখন অস্তগামী। অস্তগামী সূর্যকে সামনে রেখে আমরা এগিয়ে চললাম। ফিরে আসার পর-গুলমহম্মদ ও দিলমহম্মদকে পুরো দু-থান পাগড়ির কাপড়ের অঙ্গীকার করলেন শেঠজি। ভৈরবীর পিঠে কমসে কম দশ সের ওজনের পাঞ্জাখানা রেখে গুলমহম্মদ তার জীবনভর না-মাজা সত্তর বছরের পুরনো হলুদ রঙে-এর বত্রিশখানা মজবুত দাঁত বার করে শপথ করলে-জান কবুল করে তার মায়ের মান-ইজ্জত সে রাখবেই। উপযুক্ত পুত্র তার সহায়, আর খোদা উপরে আছেন।

প্রথমে মিনিট-কুড়ি করাচীর পিচঢালা রাস্তা, তারপর খানকতক চষাজমি। সর্বসমেত দেড়ঘন্টা চলার পর আমরা হাব নদীর ধারে রাত্রের জন্য থামলুম। বাঁয়ে করাচী এরোড্রামের লাল আলোগুলি মাথা উঁচু করে পাহারা দিচ্ছে। আমরা নদীর কিনারায় পুলের দক্ষিণে খোলা মাঠে আসন পাতলুম, এইখানে অতি প্রত্যূষে আমাদের যাত্রার সংকল্প গ্রহণ করতে হবে। তারপর নদী পার হয়ে আমাদের সত্যকার যাত্রা শুরু হবে।

আমাদের ছড়িদার যে কারা তখনও তা আমরা জানতে পারিনি। ছড়ি, অর্থাৎ হিংলাজ থেকে আনা একটা গাছের ডাল, দেখতে অনেকটা ত্রিশূলের মতো। জিনিসটাকে সিঁদুর মাখিয়ে এক অপূর্ব বিস্ময়কর বস্তুতে পরিণত করা হয়েছে। মুশকিল-আসানদের মতো তাতে বিচিত্র বর্ণের কাপড়ের ফালি ঝোলানো। এটি একটি ভয়ানক পবিত্র বস্তু। যেখানে পৌঁছে প্রতিদিনের যাত্রার বিরতি হবে সেখানে এটিকে বালির উপর পুঁতে সর্বপ্রথম এর ভোগ লাগানো হবে। ভোগ লাগানো মানে হচ্ছে এক ছিলিম গাঁজা সেজে এঁকে সসম্ভ্রমে নিবেদন করে নিজেরা কষে দম একটি ভয়ানক পবিত্র বস্তু। যেখানে পৌঁছে প্রতিদিনের যাত্রার বিরতি হবে সেখানে। এটিকে বালির উপর পুঁতে সর্বপ্রথম এর ভোগ লাগানো হবে। ভোগ লাগানো

মানে হচ্ছে এক ছিলিম গাঁজা সেজে এঁকে সসম্ভ্রমে নিবেদন করে-নিজেরা কষে দম লাগানো। এই ছড়ির প্রসাদাৎ-অর্থাৎ একে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য না করলে-আমাদের যাত্রা হবে নির্বিঘ্ন।

শেষ রাত্রে হাব নদীর কিনারায় আমরা দলসুদ্ধ লোক সন্ন্যাসী সাজলাম। প্রত্যেকের জন্য এক একখানা রুমালের মাপে নূতন কাপড় গেরুয়া রঙে ছুপিয়ে নিয়ে এলেন এক প্রৌঢ় পান্ডা। তিনি গুরুগম্ভীর গলায় তার নিজস্ব ভাষায় আমাদের শপথ করালেন। যে, মাতা হিংলাজ দর্শন করে এখানে ফিরে আসা পর্যন্ত আমরা আমাদের সন্ন্যাস-ব্রত পালন করব এবং কেউ কাউকে হিংসা করব না। আমরা সকলে সকলকে সাধ্যমতো সাহায্য করব কিন্তু কোনোক্রমেই নিজ নিজ কুঁজোর জল অপরকে দান করব না। এমন কি স্বামী, স্ত্রীকে, স্ত্রী স্বামীকে, মা ছেলেকে বা ছেলে মাকেও নিজের কুঁজোর জল দিতে পারবে না। তার কারণ, তাতে শেষ পর্যন্ত দুটো জীবনই নষ্ট হতে পারে। প্রত্যেকের মাথায় সেই গেরুয়া বস্ত্রখণ্ড বেঁধে দিয়ে দলের মধ্যে একজনকে মোহন্ত, একজনকে ভাণ্ডারী ইত্যাদির কার্যভার দিয়ে তিনি ব্রাহ্মমুহূর্তে আমাদের নদী পার করে । দিয়ে বিদায় দিলেন। হিংলাজ মাতার জয়ধ্বনির সঙ্গে ছড়ি উঠল। সবিস্ময়ে দেখলাম আমাদের ছড়িদার বা সঙ্গী দুজনের বয়স এক সঙ্গে যোগ দিলে ত্রিশ পার হবে না। অর্থাৎ বড়োটি সতেরো বা আঠারো এবং ছোটটি বারো বা তেরোর সীমানা পার হয়নি। ভরসা কোথায়?

এদের দু-জন সারা দিনরাত্রে ছিলিম তিরিশেক গাঁজা খেতে পারে, অশ্রাব্য ভাষায় গালাগালি করতে পারে এবং সদাসর্বদা হিন্দি ফিল্মের গান গাইতে পারে।

আমরা যাত্রীরা হলাম এঁদের যজমান। আমরা এঁদের ভক্তি করব, এঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করব, এঁদের সেবাও করব। নচেৎ তীর্থদর্শনের কষ্টটুকুই লভ্য হবে, পুণ্যটা উবে যাবে।

এঁরা চললেন ছড়ি ঘাড়ে করে প্রথমে; কণ্ঠে হিন্দি ফিল্মের গান। আমরা চললাম পিছনে; কণ্ঠ রুদ্ধ, মাথায় দুশ্চিন্তা।

ঠাণ্ডা হাওয়া বইছে। পাখিরা জাগছে, পিছনে ফেলে আসা এরাড্রোমের লাল আলোকগুলো তখনও বোধহয় আমাদের ফিরে যেতেই ইশারা করছে। পায়ের তলায় কাঁটা ফুটছে, কাঁটাগাছের ঝোঁপগুলির মধ্যে দিয়েই পথ।

পিছনে পূর্ব আকাশে আলো ফুটে উঠল। মনে পড়ল, এতক্ষণ পুরীতে সূর্যোদয় হয়েছে। আলোয় ভেসে যাচ্ছে সমুদ্র-সৈকত। বহুবার দেখা জগন্নাথদেবের মন্দিরের চূড়াটি ভেসে উঠল চোখের সামনে। নূতন সূর্যের আলোয় সর্বপ্রথম চূড়াটিই ঝলমল করে উঠে।

কি বিচিত্র এই সৃষ্টি! এখানে এখনো আঁধার। বই-পড়ে-জানা প্রকৃতির এই বিচিত্র রূপ মূর্তিমান বিস্ময়ের মত চোখের উপর ধরা পড়ল। এই সৃষ্টির যিনি হেতুস্বরূপ, সেই জগন্নাথদেবকে মনে মনে বার বার প্রণাম করে এগিয়ে চললাম।

আমরা চলেছি…

গাছ। চোখ বুজে বিচিত্র ভঙ্গিমায় ধীরে সুস্থে সেই চর্বণ একটা দেখবার মতো ব্যাপার। জিভ কেটে রক্ত গড়াচ্ছে কষ বেয়ে। তা হোক, তবু এত বড় মুখরোচক খাদ্য চিবনো থামবে না।

আমরাও থামি না। দু-পায়ের তলায় অজস্র কাঁটা ফুটছে, এক-পা তুলে অন্য পায়ে ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে কাঁটাটা টেনে ফেলে দিয়ে আবার চলেছি। দু-একটা ভেঙে পায়ের তলায় থেকেও যাচ্ছে। থাকুক। যখন সেদিনের চলার পালা সাঙ্গ হবে তখন ওগুলোর ব্যবস্থা করা যাবে। আপাতত থামার উপায় নেই। দল এগিয়ে যাচ্ছে। অর্থাৎ উট এগিয়ে চলেছে। একবার চোখের আড়াল হলে বুক চাপড়ে কাঁদলেও আর খুঁজে পাওয়া যাবে না।

কি করেই বা যাবে! ডাইনে বাঁয়ে সামনে পিছনে ঝোঁপ-কাঁটাগাছের বংশাবলীর মধ্যে কেউ বাদ নেই। পাশাপাশি ঠাসাঠাসি সকলে বসে গেছে, শিরশিরিয়ে মাথা নাড়ছে, ফিসফিসিয়ে চলেছে কানাকানি পরামর্শ। বোধ হয়, হঠাৎ-আগন্তুক এই মানুষগুলির ভবিষ্যৎ নিয়েই জল্পনা-কল্পনা হচ্ছে।

এদের কাউকে দক্ষিণে কাউকে বামে রেখে সসম্ভ্রমে পাশ কাটিয়ে ঘুরে ঘুরে আমরা চলেছি। পথ বলতে কোথাও কিছু নেই। হয়তো বা আছে কোথাও, কিন্তু সে পথ উটের মার পছন্দ নয়। দলসুদ্ধ সকলের খাদ্যদ্রব্য ঘাড়ে করে সে সংক্ষিপ্ততম পথে চলেছে সেখানে, যেখানে মিষ্টিজল মিলবে। আমাদেরও আজকের মতো এই দিকদারির হাত থেকে পরিত্রাণ মিলবে।

কিন্তু এর আর শেষ নেই-শেষ নেই অবিরাম মোড় ঘোরার। দশ পা সোজা চলার উপায় নেই। সামনের ঐ ঝোঁপগুলো পার হয়ে নিশ্চয়ই পরিষ্কার জমি দেখতে পাওয়া যাবে এই আশায় সেই ভোর রাত থেকে চোখের দৃষ্টি অনবরত বাধা পেতে পেতে মেজাজ পর্যন্ত বিগড়ে উঠেছে। একটা হাত-দুই উঁচু ঢিপি সামনে দেখে তার উপর উঠে ঘাড় উঁচু করে দেখবার চেষ্টা করলাম আর কতদূর গেলে খোলা মাঠ মিলবে। ‘ধুত্তোর ছাই’ বলে নেমে পুনরায় উটের পশ্চাৎ অনুসরণ। যতদূর দৃষ্টি পৌঁছল ঝোপেদের গুষ্টিগোত্রসুদ্ধ সবাই চতুর্দিকে ঘাপটি মেরে বসে আছে।

এর নাম যদি মরুভূমি হয় তবে আবাল্য যে সব মরুভূমির ছবি দেখলাম অথবা বই-এ পড়লাম ‘ধূ ধূ করছে দিগন্তবিস্তৃত বালু’-সবই স্রেফ ‘ইয়ে’।

পায়ের তলায় অবশ্য বালু, কিন্তু এই গোবেচারা বালুদের দিগন্ত দেখে প্রাণের সাধ মেটানো অনেক দূরের কথা, কতটুকু আকাশই বা দেখতে পায় এরা।

ভাগ্যে পায় না দেখতে আকাশ। যেখানে তা পায়, আর দু-দিন পরেই পৌঁছে গেলাম সেখানে। সেই অগ্নিকুণ্ডের মাঝে পড়ে বার বার স্মরণ হল-দু-দিন আগে ছেড়ে আসা কাঁটাঝোঁপগুলোকে। যাত্রার প্রথম দু-দিন যদি সেই কাঁটাগাছের ছায়ায় পায়ের তলার ধরিত্রী শীতল না থাকত তবে হয়তো আবার হাব নদী পার হয়ে করাচী পোঁছে সেইখানেই যাত্রার ইতি করতে হত।

বড়লোকদের বৈঠকখানায় মোসাহেবদের নির্লজ্জ হামবড়াপনার সঙ্গে তুলনা দিতে অনেক সময় বলা হয়-সূর্যের চেয়ে বালুর তাপ বেশি। এই নিরীহ তুলনাটা যে কী মারাত্মক ব্যাপার তার মর্মান্তিক পরিচয় পেয়ে বড়লোকের মোসাহেবদের কথা মনের কোণেও উদয় হল না। তার বদলে চোখের সামনে ভেসে উঠল গোয়ালন্দ থেকে চাঁদপুরগামী জাহাজের গর্ভে বয়লারের ভিতরটা। কয়লা দেবার সময় ওটার দরজা যখন খোলে তখন ভিতরের যে অংশটুকু দেখা যায়-রেলিং-এ ঝুঁকে দাঁড়িয়ে তা দেখে যাওয়া-আসার পথে অনেক সময় কাটিয়েছি। কালো কয়লার চাংড়াগুলো ভিতরে পৌঁছেই বাইরে পালিয়ে আসবার জন্যে ছটফট করে ওঠে, কিন্তু কোনো উপায় নেই। কয়েক মুহূর্ত পরেই লালে লাল, আর নড়তে হয় না।

সেখানে একটু একটু করে সূর্যদেব এগিয়ে এসে ঠিক মাথার উপর দাঁড়িয়ে পড়েন, আর নড়বার নামটি করেন না।

ধীরে ধীরে মা ধরণীর দেহের উত্তাপ বৃদ্ধি হতে থাকে। ক্রমে চারিদিকের জগৎ সঙ্কুচিত হয়ে আসে; যেন ঘন কুয়াশা করেছে। চার হাত দূরেও সব আবৃছা, আরও দূরে কিছুই দেখা যায় না।

প্রথমে মাথার তালু জ্বালা করতে থাকে, পায়ের তলায় শেষ পর্যন্ত কোনও সাড়াই থাকে না। নিঃশ্বাসের কষ্ট শুরু হয়। হাঁ-করা মুখ দিয়ে শ্বাস প্রশ্বাস চলতে থাকে, ফলে গলা থেকে পেটের ভিতর পর্যন্ত শুকিয়ে কাঠ হয়ে যায়।

তখন দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটে কোথাও পালানো ভিন্ন অন্য কিছুই মাথায় আসে না। আর তখন সেই হিংস্র বালুর উপর তাড়াতাড়ি এগুতে গেলেই পায়ের গোছ পর্যন্ত বালুতে বসে গিয়ে ক্রমাগত পিছিয়ে পড়তে হয়। নেই অসহায়তার তুলনা কোথায়।

তার নাম মরুভূমি। তবে সেই মরুর মাঝে গিয়ে পৌঁছেছিলাম আমরা আর কয়েক দিন পরে।

মাথা নিচু করে একমনে কাঁটা এড়িয়ে কতক্ষণ চলেছিলাম খেয়াল ছিল না। হঠাৎ মুখ তুলে দেখি- একি! এরা সব গেল বোথায়? লোকজন, উটেরা। মায় উটের ভৈরবী পর্যন্ত।

ঘাবড়ে গিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লাম। তারপর বালুর উপর মানুষ আর উটের পায়ের ছাপ দেখে এগিয়ে চললাম।

পুনরায় আচম্বিতে-সামনে পরিষ্কার, ঝোঁপজঙ্গল সমস্ত সাফ। আধ মাইল চওড়া সাদা ধপধপে একখানি রুপোর পাত ঐ নীচে দক্ষিণ থেকে এসে বামে চলে গেছে। বামদিকে অতি সন্তর্পণে বোঁচকা-কুঁচকিসহ উট দুটি কোনাকুনি নেমে যাচ্ছে। গুলমহম্মদ বড় উটটার বুকের নীচে কাঁধ ঠেকিয়ে পিছনে ঠেলে রেখে ধীরে ধীরে তাকে নামাচ্ছে। যদি মালপত্র-বাঁধা অবস্থায় বালুর উপর উটের পা হড়কায় তবে গুরুভার মালের টানে সোজা একেবারে নদীগর্ভে গিয়ে পৌঁছে যাবে উট এবং আর কখনো উঠে দাঁড়াবে না।

ছোট উটটির গলার নীচে দু হাত দিয়ে পিছনে ঠেলে রেখে দিলমহম্মদ পিছু হেঁটে নামছে। এবং তখনও সেই উটের উপর খাঁটিয়ার মধ্যে ভৈরবী সমাসীন।

উপরে দাঁড়িয়ে রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সেই নেমে যাওয়া পর্ব দর্শন করলুম। যতক্ষণ না উট নামানো শেষ হল ততক্ষণ খাঁটিয়ার পায়ায় বাঁধা দড়ি ধরে কোনোক্রমে বাহনের উপর টিকে থাকবার জন্যে ভৈরবীর প্রাণান্তকর প্রয়াস দেখতে দেখতে আমার পিঠের শিরদাঁড়ার ভিতরটা জমে হিম হয়ে যেতে লাগল।

অবেশষে অবতরণের পালা শেষ হলে আমিও নেমে গেলাম সোজাসুজি তরতর করে ছুটে। একটা হাত-দুই হাত চওড়া জলের রেখা বয়ে যাচ্ছে। জল- ঠাণ্ডা, মিষ্টি ও পরিষ্কার জল।

সহযাত্রীরা জলের ধারে হাঁটু গেড়ে বসে অঞ্জলি ভরে সেই জল মাথায় মুখে দিচ্ছেন, পানও করছেন। আমি একেবারে সেই জলের ভিতর নেমে দাঁড়ালাম। অজস্র কাঁটার ঘায়ে বিঁধে পায়ের তলা কাঁটার ঘায়ে ছিঁড়ে হাঁটু পর্যন্ত জ্বালা করছিল।

জুড়াল। উটের প্রতি পায়ে দুটি করে হাঁটু। সেইজন্যে বসতে গেলে উট দুই স্থানে পা মুড়ে তবে বসে। প্রথমে সামনের পায়ের নীচের অংশটুকু মুড়ে দেহটা সামনের দিকে কিছুটা নামিয়ে নেয়, তারপর পিছনের পায়ের নীচের অংশটুক মুড়ে ফেলে। তখন সামনের পায়ের উপরে হাঁটু মুড়ে মুখটা মাটির সঙ্গে ঠেকিয়ে শেষে পিছনের পায়ের উপরের হাঁটু ভাঁজ করে বসে পড়ে। কাজে কাজেই উটের টপ করে বসে পড়া হয়ে ওঠে না।

সেইভাবে উটকে বসিয়ে ভৈরবীকে নামানো হল। ভূমিষ্ঠ হয়ে তিনি আমাকে জলের মধ্যে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সেখানেই এগিয়ে এলেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, “কেমন লাগছে উটে চড়া?” অতি প্রশান্ত উত্তর হল, “কি যে মজা উপরে বসে দোল খেতে! আমার তো ঘুম আসছিল।”

মুখের দিকে ভালো করে তাকিয়ে দেখলাম নাঃ, বানিয়ে বলছে না। কায়মনোবাক্যে মজাই উপভোগ করেছে। যাককথা বাড়াতে আর প্রবৃত্তি হল না।

দড়িদড়া খুলে বস্তাগুলো সেখানে ফেলে উটদের জলের ধারে নিয়ে আসা হল। সামনের পা দুটি মুড়ে লম্বা গলা বাড়িয়ে জলে মুখ দিয়ে সমানে আধ ঘণ্টা ধরে তারা জলপান করলে। শেষে উপরের ঝোঁপের ধারে নিয়ে গিয়ে তাদের ছেড়ে দেওয়া হল। দিলমহম্মদ সঙ্গে সঙ্গেই রইল। বিশ্বাস নেই-কাঁটা চিবুতে চিবুতে কত দূরে চলে যাবে কিছুই বলা যায় না।

এধারে তখন কাঁটাগাছের শুকনো ডাল জমা করতে সকলেই ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। রান্না চড়বে। রান্না কিন্তু চড়লও না নামলও না। ডালপালা জ্বেলে যে যেমন ভাবে পারলে, আটা মেখে চাবড়া চাবড়া বানিয়ে পুড়িয়ে নিলে। শেষে লঙ্কার গুঁড়ো ও লবণ সহযোগে তাই চর্বণ। ল্যাঠা চুকে গেল।

আমাদের দন্ধ অদৃষ্টে তখনও অনেক দন্ধানি বাকি ছিল। গুলমহম্মদের চাল খাওয়ার ভয়ানক শখ। সেজন্য বেচারা পরিশ্রমও অল্প করলে না। ডালপালা জোটানো, উনুনের জন্য পাথর খুঁজে আনা, হাওয়া বালির হাত থেকে নিস্তার পাবার জন্যে খাঁটিয়াখানাকে খাড়া করে তাতে কম্বল টাঙিয়ে আড়াল করা, সমস্তই সে করলে। কিন্তু মাথা খোঁড়াখুড়িতেও চুলা থেকে অনর্গল কুণ্ডলী পাকিয়ে ধোঁয়া ছাড়া আগুন বেরুল না। লাভের মধ্যে ভৈরবী চোখের জলে নাকের জলে নাকাল হলেন। তখন শেষ উপায় করাচী থেকে আনা চীনাবাদামগুলিকে পোড়ানো। তাই করা গেল। আগুন বেরুল না। লাভের মধ্যে ভৈরবী চোখের জলে নাকের জলে নাকাল হলেন। তখন শেষ উপায় করাচী থেকে আনা চীনাবাদামগুলিকে পোড়ানো। তাই করা গেল।

সেই সময় স্মরণ হল একটি মুখঢাকা চ্যাপটা টিনের কথা। শেঠজীর স্ত্রী আমাদের বিদায় দেবার সময় ওটিকে নিজে নিয়ে আসেন। ভিতরে কি বস্তু আছে তখনও খুলে দেখা হয়নি। এখন সেটি খুলে তার মধ্যে পাওয়া গেল সযত্নে গুছিয়ে দেওয়া নানারকমের মিঠাই পেঁড়া লাড়ু, আরও কত কি। এমনকি ঝুরিভাজা চানাচুরভাজা আর নানারকমের আচার পর্যন্ত রয়েছে। গুলমহম্মদ তার ছেলে আর আমরা দুজন পোড়া চীনাবাদাম সহযোগে সেইগুলির সদ্ব্যবহার করে পেট ভরে জল পান করলাম।

এই যাত্রার প্রথা হচ্ছে-প্রত্যহ প্রত্যেক যাত্রী একখানি রুটি উটওয়ালাকে এবং আর একখানি রুটি জলওয়ালাকে দেবে। এই পথের যেখানে মিষ্টি জলের সন্ধান পেয়ে বালি খুঁড়ে জল বার করে কূপওয়ালা পাহারা দিচ্ছে সেই কুপওয়ালার প্রাপ্য মাত্র এই দগ্ধ রুটির একখানি প্রত্যেক যাত্রীর কাছ থেকে। এর অতিরিক্ত সে কিছু প্রত্যাশাও করে না, পায়ও না। কিন্তু দেখেছি যে, হয় রুটির ওজন নিয়ে নয় মাথাপিছু প্রত্যেক যাত্রীর একখানি করে হিসাবে কম পড়ার দরুন প্রতি কূপের ধার থেকে রওনা হবার সময় বিড়ম্বনার অন্ত থাকত না। আমরা অনেকেই চেষ্টা করতাম যাতে একখানি পাতলা রুটি বা না-পোড়া রুটি কুপওয়ালাকে দিয়ে তাড়াতাড়ি রওয়ানা হওয়া যায় সেখান থেকে।

কিন্তু এই জল, যার আশায় ঘণ্টা আট-দশ মরুভূমি পার হয়ে ছুটে আসছি, যা আমরা নিজ নিজ কুঁজোয় ভরে নিয়ে পুনরায় রওয়ানা হব-যথাস্থানে পৌঁছে যদি সেই জল না পাওয়া যেত? কিংবা যদি জলওয়ালা নির্বান্ধব একাকী মরুর মাঝে বাসা বেঁধে জল রক্ষা না করত-তা হলে?

তখন আমরা শুকনো কুঁজো ঘাড়ে করে কূপের ধারে পৌঁছে কূপের পাত্তাও পেতাম না। কারণ প্রতিদিন না খুঁড়লে কয়েক ঘণ্টার মধ্যে উড়ন্ত বালিতে কূপ বোঝাই হয়ে চারিদিকের সঙ্গে সমান হয়ে যেত। চিনে নেবার উপায়ও থাকত না যে কোথায় জল ছিল।

ফলে যে তখন কি হতে পারত বা পারত না চিন্তা করতেও সাহস হয় না। সে। চিন্তা না করে জল পেয়ে আকণ্ঠ পান করে কুঁজোয় ভরে নিয়ে সর্বপ্রথম যে ফন্দিটি আমরা অনেকেই আঁটতাম তা হচ্ছে, কি উপায়ে রুটিখানি জলওয়ালাকে দিতে ভুলে যাওয়া যায়।

কূপগুলি সেখানকার মরুবাসীদের কাছে কত বড় সম্পদ তা স্বচক্ষে দেখেছি। দেখেছি

ক্রোশের পর ক্রোশ ভেঙে দল বেঁধে স্ত্রী-পুরুষ আসছে একপাল ছাগল নিয়ে কূপের ধারে। ছাগল জল বয়ে নিয়ে যাবে। জল যাবেও ছাগলের মধ্যে ভরতি হয়ে। একটা ছাগলের গলা থেকে মাথাটা কেটে ফেলে কি এক অদ্ভুত উপায়ে চামড়ার ভিতর থেকে হাড় মাংস সমস্ত বের করে নেওয়া হয়। পায়ের খুর চারটে বাদ দিয়ে পায়ের শেষ প্রান্ত চারটি বেঁধে সেই চামড়ার মধ্যে গলা দিয়ে জল ভরতি করা হয়। তারপর গলাটি চমড়ার ফিতে দিয়ে বেঁধে ছাগলের পিঠে চাপিয়ে তারা স্বস্থানে নিয়ে হয়। এইভাবে মাসের পর মাস জল রক্ষা করা হয়। এতে জল ঠাণ্ডা থাকে, নষ্টও হয় না।

দশ-বিশ ক্রোশের মধ্যে একটিমাত্র মিষ্টি জলের কুয়া, সুতরাং প্রত্যহ 'জলকে চল ব্যাপারটা সেখানে কোনোক্রমেই সম্ভব নয় বলেই এই ব্যবস্থা।

এই ব্যবস্থার অন্য একটা দিকও আছে। জল নিতে এসে উত্তরদিকের লোক দক্ষিণের লোকের জন্যে সংবাদ এই জলওয়ালার কানেই রেখে যায়। এখানেই বহু রকমের দেনা পাওনার হিসাব মেটানো হয়, এমনকি মন দেওয়া-নেওয়ার সাক্ষীও এই জলওয়ালা। অনেকের অনেক ঝামেলা তাকে পোহাতে হয়। বহু সমস্যার হরেক মীমাংসা তাকেই করে দিতে হয়। সে দেশের লোকের কাছে এই জলওয়ালার মর্যাদা সামান্য নয়।

তা হলে কি হবে, আমাদের কাছে সে মাত্র একখানি রুটির প্রত্যাশী-সুতরাং ভিক্ষুক ছাড়া আর কি?

কিন্তু প্রথম দিনে নদীর জলেই যখন আমাদের সমস্ত প্রয়োজন মিটে গেল তখন কুপওয়ালার রুটির কথা আর উঠল না। তার বদলে উটওয়ালার রুটির যথোপযুক্ত ব্যবস্থা করার জন্যে আমাদের প্রথম অধিবেশন আরম্ভ হল।

বহুত বহুত সেলাম জানিয়ে গুলমহম্মদ অতি বিনীত ভাবে প্রস্তাব পেশ করলে যে উটওয়ালার প্রাপ্য একখানি রুটির বিনিময়ে তাকে জনা-প্রতি আধ পোয়া হিসাবে আটা দেওয়া হোক। তাদের রুটি বানাবার কষ্ট থেকে সে এই পুণ্যাত্মা যাত্রীদের রেহাই দিতে চায়

অতি নিরীহ জাতের প্রস্তাব। সকলেই প্রায় একবাক্যে সমর্থন করে ফেললেন।

শ্রীরূপলাল পণ্ডিত হচ্ছেন আমাদের জ্যেষ্ঠ ছড়িওয়ালা-অর্থাৎ আমাদের অভিভাবক। তাঁর মতামতের মূল্য আছে। তিনি তখন চুল আঁচড়াচ্ছিলেন। এই বিশেষ কর্মটি তিনি যখন তখন বহুবার সমাধা করতেন আর সেইজন্যে তার লাল ডোরাকাটা শার্টের বুকপকেটে একখানি চিরুনি সদাসর্বদাই গলা বাড়িয়ে বিরাজমান। চিরুনিখানি থেকে সযত্নে ছেঁড়া চুল ছাড়াতে ছাড়াতে তিনি তাঁর মূল্যবান অভিমত প্রকাশ করলেন।

তাঁর মতে, আটা যদি দিতেই হয় তবে এখনই হিসাব করে সম্পূর্ণ প্রাপ্য আটাটা ওদের দিয়ে দেওয়াই ভাল। বহুবার দেখা গেছে যে, ভোজ্য যা সঙ্গে চলেছে তার দ্বারা শেষ পর্যন্ত যাত্রীদেরই ক্ষুন্নিবৃত্তি হয় না, সেই জন্যেই বলা হয় যে হিংলাজের : পথে আছে ক্ষুধা ও ঝগড়া। এই ঝগড়া যাতে এড়ানো যায়, সেই জন্যেই তার এই সংশোধনী প্রস্তাব।

শুনলে মনে হবে যে এই প্রস্তাবটি আরও নিরীহ জাতের। আটাটা যখন দিতেই হবে তখন দিয়ে দিলেই হাঙ্গামা শেষ হয়। তা হয়তো হত। কিন্তু হিসাব কষে দেখা গেল যে ত্রিশজন লোকের মাথাপিছু আধ পোয়া করে আটা দিতে গেলে দৈনিক দিতে হয় পৌনে চার সের। বত্রিশ দিনে এই যাত্রা সমাপ্ত হবে এই আশায় জনা-প্রতি বত্রিশ সের হিসাবে আটা নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। বত্রিশ দিনের জন্য বত্রিশবার এই পৌনে চার সেরকে যোগ দিলে হয় তিন মণ। অর্থাৎ এখনই দু-বস্তা আটার মায়া ত্যাগ করতে হয়।

হিসাবটা যখন শেষ হল তখন 'সভা হল নিস্তব্ধ'। তবে ঘাতক কেউ উপস্থিত না থাকায় সাঁড়াশি দগ্ধ করে ছেঁড়াছিড়িটা আর হল না।

তখন একটি পাল্টা প্রস্তাব আমি পেশ করে বসলাম। মণ দেড়েক চাল আমাদের উটের পিঠে যাচ্ছে। অক্লেশে আমরা আটার মায়া ত্যাগ করতে পারি। আটাই হোক আর চালই হোক, রান্না না করে গলাধঃকরণ করা সম্ভব হবে না। আজকের রান্নার দুরবস্থা দেখে ও সম্বন্ধে বেশি আশা না করাই শ্রেয়। অতএব সকলের দুশ্চিন্তা দূর করবার জন্যে আমাদের

আটার বস্তাটা শেখ সাহেবদের অগ্রিম সঁপে দিতে চাইলাম।

দুশ্চিন্তা কিন্তু কালো বোরখা ঢাকা দিয়ে আমাদের পিছু নিল শ্রীমান পণ্ডিতজির শেষ কথাটিতে। শেষ পর্যন্ত খাদ্য সকলের ভাগ্যে ঢালাও জুটে যাবে এই অভয় দান করে। তিনি নির্বিকার ভাবে বললেন যে, পথে দু-চারজন ত কমবেই, সুতরাং ভাবনা কি?

কমবে অর্থাৎ আমরা সকলে সশরীরে হিংলাজ পর্যন্ত পৌছঁব না এবং এর কারণটি যে কি তা আন্দাজ করে নিয়ে আমরা প্রত্যেকে অন্য মুখগুলির উপর একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম।

হায়, কে বলে দেবে সেই দু-চারজন আমাদের মধ্যে কে কে?

সভার কার্য শেষ হবার পূর্বেই দিলমহম্মদ উটসহ প্রত্যাবর্তন করলে। আর তৎক্ষণাৎ, বলা নেই কওয়া নেই, পিতাপুত্রে মালপত্র উটের পিঠে তুলে বাঁধতে শুরু করে দিলে।

শেষে যখন বুঝলাম যে সেখান থেকে পুনরায় উঠতে হচ্ছে তখন পশ্চিমের আকাশটায় কে যেন আগুন ধরিয়ে দিয়ে লালে লাল করে তুলেছে। ছেড়ে আসা নদীর পূর্বতীর ইতিমধ্যেই স্বচ্ছ আঁধারে রহস্যময় হয়ে উঠেছে।

সামনের পশ্চিমতীরে গায়ে গায়ে ঠাসাঠাসি করে বসে কারা যেন আমাদের হাতছানি দিয়ে ডাকছে। সেই দিকে চেয়ে আসন্ন সন্ধ্যায় গায়ে কাঁটা দিয়ে উঠল।

কিন্তু উপায় কি?

খাঁটিয়ার আড়ালে চাদর চাপা দিয়ে ভৈরবী ঘুমিয়ে ছিলেন। উটের পিঠে খাঁটিয়া বাঁধা হলে বালিসুদ্ধ চাদরটা তার উপর থেকে সাবধানে তুলে নিলাম। ইতিমধ্যে হাওয়ায় উড়ে একরাশ বালি তার চাদরের উপর জমেছিল। নিদ্রাভঙ্গ হলে অতিকষ্টে কনুই-এর উপর ভর দিয়ে ধীরে ধীরে কোমর সোজা করে উঠে বসলেন তিনি। উটের পিঠে মজায় দোল খাবার ফল হাড়ে হাড়ে মিলেছে। সর্বাঙ্গ টাটিয়ে টনটন করছে।

বললাম- “আবার চড়ে বসো।”

ভগ্নকণ্ঠে তিনি জিজ্ঞেস করলেন-”আজ আবার কেন?” বাহুল্য বোধে এই ‘কেন’র আর উত্তর দিলাম না।

বসুন্ধরা ঘোমটা টেনে মুখ ঢাকা দিলেন। এই নদীটি তার সীমান্তের সিঁথি। ঘোমটার মধ্যেও স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে।

উট দুটিকে ঘিরে আমরা মানুষ কজন নিঃশব্দে অগ্রসর হলাম অজানা ঠিকানার উদ্দেশে, জল যেদিক থেকে আসছে সেইদিকে।

সেদিন সন্ধ্যার পরে চন্দ্রদেব বোধ হয় কোথাও গোপনীয় কর্মে ব্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। অনেক রাতে অর্ধেকেরও বেশি মুখ ঢেকে শরমে জড়িত চরণ দুখানি টানতে টানতে নদীর পূর্ব তীরের ঘুটঘুঁটে আঁধারের ভিতর থেকে যখন তিনি দেখা দিলেন তখন হঠাৎ নদীগর্ভে আমাদের দেখে তার বিস্ময়ের সীমা রইল না। এ-হেন অবস্থায় রাত্রিশেষে তাঁর চুপি চুপি বাড়ি ফেরার সাক্ষী থাকবার জন্যে সেই অস্থানে অতগুলি জীব জেগে রয়েছে, এ নিশ্চয়ই তাঁর কল্পনাও ছিল না- মহা অপ্রস্তুত হয়ে পড়লেন!

আমাদের তবু একজন সঙ্গীবৃদ্ধি হল, একজন নয়-দু-জন। ভোরের তারাটাও একদৃষ্টে আমাদের কাণ্ডকারখানা দেখছিল। তখন আমরা আমাদের নিজ নিজ কুঁজো উটের পিঠ থেকে নামিয়ে নিয়ে নদীর জল ভরে নিচ্ছি। জলভরতি কুঁজোগুলি এবার প্রত্যেকের কাঁধে কাঁধে চলবে। আমার কুঁজোটি অবশ্য ভৈরবীর কুঁজোর সঙ্গে উটের পিঠের খাঁটিয়ার মধ্যেই স্থান পেল। চাঁদের সঙ্গে সঙ্গে আমরা নদীর পশ্চিমতীরে উঠলাম।

রসুলপুরের নদীর তীরে সহযাত্রীগণ কর্তৃক পরিত্যক্ত নবকুমার যখন আগুন দেখতে পেয়েছিলেন, তখন-, ওখানে নিশ্চয়ই মানুষ আছে নয়তো আগুন জ্বালাল কে,-এই চিন্তা করে আশ্রয়ের আশায় তাড়াতাড়ি সেই আগুনের কাছে গিয়ে কাঁপালিকের খপ্পরে পড়েন। আর সেই রাত্রি শেষ প্রহরে তীরে উঠেই, অদূরে আগুন দেখতে পেয়ে সহযাত্রীগণ পরিবৃত আমরা সকলেই একেবারে পঙ্গু হয়ে পড়লাম। কার মনে কি উদয় হয়েছিল তা বলতে পারি

না, তবে কাঁপালিকের কথাটা আমার স্মরণ হয়নি। হলে হয়তো বনদেবী কপালকুণ্ডলার চাক্ষুষ পরিচয় লাভের আশায় কি করে বসতাম তার ঠিক নেই। হলফ করে বলতে পারি বঙ্কিম-গ্রন্থাবলীর মলাটখানির ছবিও মনের কোণে ভেসে ওঠেনি। চরম অসহায়তার নিবিড় অনুভূতি কোনও কিছু চিন্তা বা বিচার করবার পূর্বেই পা দুটিকে একেবারে পাষাণে পরিণত করল, জ্বলন্ত আগুনটা যেন নিষ্ঠুর নিয়তি, রক্তচক্ষু নিয়ে ঐ আঁধারের বুকে নাচছে।

হুঁশ ফিরে পেলাম একটা বিচিত্র শব্দ-তরঙ্গে-বুড়ো গুলমহম্মদ তার দু-হাতের চেটো দিয়ে চোঙা বানিয়ে তাতে মুখ লাগিয়ে একটানা আওয়াজ করলেন-"উ উ উ হো।" সেই আওয়াজ তিনবার করার পর উত্তর ভেসে এল সেই আগুনের দিক থেকে-"উ উ উ হো।"

উত্তর পেয়ে পিতা পুত্রকে আপন ভাষায় কি খানিক গজ গজ করে বললে। তারপর উটের নাকের দড়িতে টান পড়ল, আমরা আগুনের দিকে এগিয়ে চললাম।

একটা ইঞ্চি দু-এক লম্বা কাঠিকে ধুনুরীদের হাতের তুলো ধুনবার মুগুরের মতন বানিয়ে সেই কাঠিটা উটের নাকে ছেদা করে পরিয়ে দেওয়া হয়। নাকের দুই গর্ত থেকে কাঠিটার দুই প্রান্ত বেরিয়ে থাকে। সেই দুই প্রান্তে বাঁধা হয় একগাছি রেশমের বা লোমের তৈরি সরু দড়ি। অপেক্ষাকৃত মোটা দড়ি একগাছি সেই সরু দড়িটার সঙ্গে বেঁধে তার প্রান্ত উটওয়ালার হাতে থাকে। এই হচ্ছে উটের লাগাম, নাকে টান পড়লেই উট জব্দ। এত বড় একটা প্রাণীকে সেই দড়ি টেনে যে-ধারে ইচ্ছা চালনো হয়। যাকে বলে প্রকৃত নাকে দড়ি দিয়ে ঘোড়ানো। কিন্তু এ পর্যন্ত আমাদের নাকেই দড়ি বেঁধে উট ঘোরাচ্ছিল। এইবার তাকে তার অনিচ্ছায় যেতে হল নাকের দড়ির টানে টানে উটওয়ালার পিছু পিছু সেই আগুনের দিকে।

রুদ্রাক্ষ-বাঘছাল-জটাজুটধারী কেউ তপস্যা করেছেন এ দৃশ্য আমাদের ভাগ্যে জুটল না। তার বদলে আমরা পেলাম আপাদমস্তক কাবুলীর সাজ-পোশাকপরা জনা তিনেক করাচী যাত্রী। হাড়গোড়, মড়ার মাথা, খাড়া-এ সমস্ত কিছুই নয়, আগুন জেলে তারা গরম জল চাপিয়েছেন চা বানাবার জন্যে। সাদরে তারা আমাদের চা পানের আহ্বান জানালেন।

স্মরণ হল যে আমাদের সঙ্গেও চা-চিনি-দুধ সবই আছে। কিন্তু তখন সে সমস্ত পাবার উপায় নেই। উটের পিঠ থেকে খাঁটিয়া খোলা হলে মালপত্র নামলে তখন তার নাগাল পাওয়া যাবে। উট এখানে থামবে না, অগত্যা তাদের আপ্যায়ন স্বীকার করা গেল। কাথীওয়াড়ী ভাইরা এ সবের তোয়াক্কা রাখেন না। সপুত্র গুলমহম্মদ ও সভ্রাতা রূপলালকে নিয়ে আমি চা পান করতে বসলাম। আহা, কি তার স্বাদ, আর কি অপরূপ তার গন্ধ, যাকে ভাল কথায় বলা হয় ফ্লেভার। অন্নপ্রাশনের অন্ন উঠে আসবার জোগাড়। বৃহৎ পঞ্চতিকায় গরম গরম ভেল্লি গুড়ের প্রক্ষেপসহ পান। মুখে অবশ্য বললাম 'ইয়াঃ' এবং 'তোফা'। শেষে বহুত পাঞ্জা-লড়ালড়ি ও মাথা নাড়ানাড়ির পর আমরা আমাদের পথ ধরলাম, তাঁরাও নদীতে নামবার জন্যে তৈরি হলেন।

পরদিন প্রথম চোখ মেলে যা দেখলাম তা হচ্ছে মাছি। ছোটখাটো গৃহস্থ মাছি নয়, আসল কাবুলি মাছি-এক একটি চীনাবাদামের মতো বড়। হাজারে হাজারে তাঁরা কোথা থেকে এসে হেঁকে ধরেছেন, তাঁদের সমবেত কণ্ঠের ঐকতানে নিদ্রাভঙ্গ হল!

শেষরাত্রে পৌঁছে দালানটার এক কোণে কম্বল বিছিয়ে চাদর চাপা দিয়ে শুয়ে পড়ি। তখন শরীর মনের যা অবস্থা তাতে সাপ বিছা বা কিসের উপর কম্বল পাতছি, তা দেখার ধৈর্য ছিল না। কিছুমাত্র চিন্তা না করে শয়ন এবং সঙ্গে সঙ্গে সকল দুঃখের অবসান-এই হচ্ছে গতরাত্রের কর্ম।

জেগে উঠে দেখি সকলেই পেটের ব্যবস্থা করতে ব্যস্ত। সেদিন থেকে আমাদের দলে রূপলাল পণ্ডিতের ছোট ভাই সুখলাল যোগদান করায় ভৈরবীর আর কোনো অসুবিধা নেই। তার মহা উৎসাহে সর্বকর্মে সাহায্যদান রান্নার দুঃখ দূর করেছে। ভাত রাঁধার পাত্রটা মাত্র দুজনের উপযুক্ত আনা হয়েছে, তাতেই পাঁচজনের ব্যবস্থা দুবারে হচ্ছে। তারপর ডালও হবে। শেষে হবে রুটি-রাতে পথের সম্বল।

দালানটার দক্ষিণে কুয়া, জল মুখে দেবার উপায় নেই, এতই বিস্বাদ। স্নান করা গেল।

পানের জল তো নদী থেকেই বয়ে আনা হয়েছে। কিন্তু খুব সাবধান, বার বার রূপলাল আর গুলমহম্মদ সকলকে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছে যে, কুঁজোর জলে সারারাত আর পরদিন দুপুর পর্যন্ত চলা চাই। শোনবেণী না পৌঁছলে কোনো উপায় নেই আর জল পাবার।

সে রাজ্যের রাজধানীর নাম শোনবেণী, করাচী থেকে তিন দিনের পথ। পথে এই দালানটাই একমাত্র আশ্রয়স্থান, সে দেশের সরকারের নিজস্ব ব্যবস্থা। সেখান থেকে বেরিয়ে সারারাত হেঁটে পরদিন কোনও এক সময় আমরা শোনবেণী পৌঁছব, অবশ্য ইতিমধ্যে যদি আর কোনো বিভ্রাট না ঘটে বসে।

স্নানের পর পুরো এক গেলাস চা পান করে চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে পড়লাম। হতে থাকুক রান্না ততক্ষণ। বসে থাকবার উপায় কি আছে? ঝাঁকে ঝাঁকে মাছি এসে মুখের উপর আছড়ে পড়ছে।

ডাকাডাকির ফলে আবার যখন উঠে বসলাম, তখন সমস্ত প্রস্তুত। ভাত, ডাল, ডালের মধ্যে আলুসিদ্ধ, সঙ্গে খণ্ড খণ্ড কাঁচা পেঁয়াজ। পেঁয়াজ খেতেই হবে, নয়তো জলতেষ্টা কিছুতেই কমবে না। কাঁচা পেঁয়াজ কামড়ে খাওয়া এর পূর্বে আর কপালে ঘটে ওঠেনি। স্থানমাহাত্মে সত্যিই খারাপ লাগল না। বরং ঐ পেয়াজের দৌলতেই খাদ্য উদরস্থ হল বলা চলে।

সমস্ত ধুয়ে মেজে বাধা-ছাঁদা করে আবার শয়ন। দু-তিন ঘণ্টা পরে রোদ কমলে যখন বালি ঠান্ডা হবে তখন বেরুনো যাবে শুনে যে যার চাদরের তলায় ঢুকল।

ঘুম আর হল না। খাওয়ার আগ পর্যন্ত দু-বারে যা হয়েছে তা একেবারে মন্দ নয়। চাদর মুড়ি দিয়ে জেগে শুয়ে থাকাও আর এক অস্বস্তি। মাছিরা মনে করেছে যে আমরা বেঁচে নেই, মড়া ভেবে চাদরের উপর ছেয়ে ফেলেছে। চাদর ফেলে বাইরে এসে দাঁড়ালাম।

বাইরে গুলমহম্মদ মালপত্রের বস্তাগুলোর উপর ঘুমিয়ে পড়েছে। দালানটার পূর্বদিকে হাত দু-এক ছায়া পড়েছে, সেইখানেই জিনিসপত্রগুলি পাকার পড়ে আছে। যতদূর দৃষ্টি যায় জ্বলন্ত রোদ ঝাঁ ঝাঁ করছে। জনপ্রাণীহীন দগ্ধ মরুর বুকে একটা কাকপক্ষীরও ডাক শোনা যায় না। না জানি কোথায় কোনদিকে উট দুটিকে নিয়ে দিলমহম্মদ চরাচ্ছে। বিধাতা উট সৃজন করে তার আহারের ব্যবস্থা এই বালুর বুকে করতে ভালেননি। পেট ভরে খেয়ে ফিরে এসে তারা লম্বা গলা বোঝাই করে জল নিয়ে নেবে। তারপর নিশ্চিন্তে সারারাত পাড়ি দেবে যতক্ষণ না আবার জলের কাছে পৌঁছানো যায়। মনে পড়ল, দিল্লি মেল হাওড়া ছেড়ে ঘণ্টাখানেক দৌড়ে বর্ধমানে পৌঁছেই একপেট জল খায়, নয়তো আর নড়তে পারে না, সারারাত কত জল খায় কে জানে! উট সারারাত জলের পরোয়া না করে সামনে এগিয়ে চলে। পিঠে বিশ মণ বোঝা। সৃষ্টিকর্তার কারখানায় তার নিজের হাতে গড়া ইঞ্জিন, একেবারে নিখুঁত, কিছু বলবার উপায় নেই।

নির্বাসন-দণ্ড যে কত বড় সুকঠোর শাস্তি, মর্মে মর্মে তা অনুভব করলাম আমাদের আশ্রয়স্থল তিনদিক-বন্ধ একদিক-খোলা দালানটার দিকে চেয়ে। সারা দুনিয়ার তাবৎ শহরপল্লীর ছোট-বড় যত ঘরবাড়ি আছে, সকলে মিলে একদা না জানি কোন মহা অপরাধের দরুন এই দালানটাকে নির্বাসন দেয়, সেই থেকে বেচারা দিগন্তবিস্তৃত বালুরাশির মধ্যে একলা ঠায় দাঁড়িয়ে আছে। ওর মুখ পুড়ে কালো হয়ে গেছে, কারণ যে কেউ কিছুক্ষণের জন্যেও আশ্রয় নেয় সে-ই পেটের দায়ে এর মধ্যে আগুন জ্বালায়। ফলে পশ্চিমের পাঁচটা ভোলা খিলান দিয়ে ধোয়া বেরিয়ে কালো দাগ পড়ে গেছে। এত বালি চারিদিকে তবু এর অঙ্গে কোথাও ছিটে ফোঁটাও চুন-বালির স্পর্শ নেই। এই মুখ-পোড়া হাড়-বার-করা বৃদ্ধ একলা দাঁড়িয়ে ধুকছে কত যুগ-যুগান্ত কে জানে!

নিযুতি রাতে সমুদ্র কিনারায় একলা বহুক্ষণ চুপচাপ বসে থাকলে ঢেউগুলোর আছড়ে পড়া দেখতে দেখতে মনে হয়, হাতের কাছে যদি এমন কোনো একটা উপায় থাকত যার দ্বারা কোনওক্রমে সমুদ্রটাকে কিছুক্ষণের জন্যে ঠাণ্ডা করে রাখা যেত তবে স্বস্তি পাওয়া যেত। একটার পর একটা ঢেউ অনবরত ঝপাং ঝপাং করে আছড়ে এসে পড়ছে তো পড়ছেই,

কিছুতেই বিরাম নেই বিশ্রাম নেই। দেখতে দেখতে শরীরের মধ্যে একটা ভোলপাড় শুরু হয়। একবার যদি কিছু সময়ের জন্যেও চুপ করে তবেই শান্তি।

কিন্তু তা কখনোই হবার নয়। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা তালগোল পাকিয়ে বানিয়ে ব্রহ্ম তার দু হাতের কনুই পর্যন্ত মাখা কাদামাটি পরিষ্কার করবার জন্যেও জলের মধ্যে দু-হাত ডুবিয়ে বেশ করে ধুয়ে ফেলেন। সেই জলে যে দোলা লাগল আজ পর্যন্ত তা আর থামল না। তার আগে নিশ্চয়ই সমুদ্র শান্ত অচঞ্চল ছিল।

কিন্তু এখানে ধরণীর এই অংশটুকু একেবারে বিপরীত। কখনো কোনো কারণে এ নড়ে ওঠে না। সমুদ্রের মতো বালুরাশিও ঢেউ-এর পর ঢেউ তুলে চলে গিয়েছে, গিয়ে আকাশের সঙ্গে মিশেছে। দেখলে মনে হয় একদা এর প্রাণ ছিল সমুদ্রের মতো, তখন এও অশান্ত ছিল। হঠাৎ কোনো এক জাদুমন্ত্রে স্তব্ধ হয়ে গেছে। আজ আর এতে প্রাণের চিহ্নমাত্র নেই। সমুদ্রের দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে নিখিল বিশ্বের বিরাট প্রাণের স্পন্দন স্পষ্ট অনুভব করা যায়। আর সেদিন দুপুরে সেই নিষ্প্রাণ স্তব্ধতার মধ্যে দাঁড়িয়ে জগৎ-জোড়া মৃত্যুর শীতলতার মাঝে ধীরে ধীরে তলিয়ে যেতে লাগলাম। জীবন ও মৃত্যু এই দুটির কোনটি যে বেশি শক্তিশালী তাই চিন্তা করতে লাগলাম।

কতক্ষণ একভাবে তাকিয়ে ছিলাম খেয়াল ছিল না। হঠাৎ মনে হল বহুদূরে আমার দৃষ্টির শেষ সীমায় কি যেন নড়ে উঠল। পশ্চিম দিক থেকে হাওয়া আর বালু পূর্বদিকে বয়ে যাচ্ছিল, তার উপর চোখ-ধাঁধানো রোদ। ভুল দেখছি মনে করে দু-চোখ বন্ধ করে রইলাম। কিছুক্ষণ পরে আবার যখন চেয়ে দেখলাম তখন আরও কাছে স্পষ্ট দেখা গেল কি যেন এধারেই এগিয়ে আসছে। একটা বালুর ঢেউ-এর উপর উঠে আবার যখন সামনের ঢেউটার পিছনে নামছে তখন আর দেখা যাচ্ছে না। কিন্তু আবার যখন আর একটা ঢেউ-এর মাথায় উঠে আসছে তখন স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে। দু হাত দিয়ে চোখ রগড়ে নিয়ে এবার ভাল করে চেয়ে দেখি-না, কিছুতেই ভুল দেখছি না-নিশ্চয়ই কিছু একটা এগিয়ে আসছে এদিকে চেয়ে রইলাম মোহাবিষ্ট হয়ে।

ক্রমে সেই কালো বিন্দুটা বড় হয়ে একটা রূপ গ্রহণ করতে লাগল। মনে হল যেন একটা গুরুভার কিছু টেনে আনছে কোনো প্রাণী। আনতে তারও প্রাণান্ত হচ্ছে। রুদ্ধনিশ্বাসে প্রতীক্ষা করছি।

ঐ আবার একটা বালুর টিলার মাথায় উঠেছে! এবার সন্দেহ হল-মানুষ নয় তো? আবার নেমে অদৃশ্য হল। শেষে যখন আবার দেখতে পেলাম তখন আর ভুল হল না-হাঁ মানুষই বটে! কি একটা কাঁধে করে আনতে আনতে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

তাড়াতাড়ি গুলমহম্মদকে ধাক্কা দিয়ে জাগালাম। উঠে বসে দু-চোখ কচলে বুড়ো ক্ষণিকের জন্যে সেই দিকে তাকিয়ে রইল। মরুবাসীর অভ্যস্ত চক্ষুকে ফাঁকি দেবার উপায় কি। পরমুহূর্তে লাফিয়ে উঠে একটা চিৎকার করে সেই দিকে দৌড় দিলে। কোনো কিছু চিন্তা করবার পূর্বেই আমিও তার পিছু পিছু ছুটলাম।

সেই তপ্ত বালুর মধ্যে বার দুই-তিন যখন আছাড় খেয়ে যখন সেখানে গিয়ে পৌঁছলাম তখন আর বাক্যব্যয়ের অবকাশ ছিল না। চোখের পলকে গুলমহম্মদ একটা দেহ কাঁধে তুলে নিল, আর একটাকে আমিও কাঁধে ফেললাম, তারপর সেই স্পন্দনহীন দেহ নিয়ে যতদূর শক্তিতে কুলোল-দৌড়!

দৌড়োবার উপায় কি? ভার কাঁধে বালুর মধ্যে পা বসে যেতে লাগল। সামনে যেতে যেতে গুলমহম্মদ হুঁশিয়ারি করে দিলে, পা যেন না হড়কায়। এখনও হয়তো এদের প্রাণ আছে, আছাড় খেলে জীবনের আর আশা থাকবে না।

পথ আর শেষ হয় না, দালানটা পিছিয়ে যাচ্ছে। শেষে যখন দালানটার কাছে পৌঁছলাম তখন সকলে জেগে উঠেছে। যাবার আগে গুলমহম্মদের চিৎকারে সকলের ঘুম ভেঙে যায়। কিন্তু আমাদের কেউ দেখতে পায়নি। কারণ দালানটার পিছনে পূর্বদিকে আমরা দৌড়েছিলাম।

সকলেই ঘিড়ে দাঁড়াল। কাঁধের বোঝ নামাতে দেখা গেল গুলমহম্মদ যাকে এনেছে সে একটা পুরুষ এবং আমার কাঁধে এসেছে একটি নারী।

আমার দম তখন শেষ হয়ে গেছে। ভার নামিয়ে তার পাশেই বসে পড়লাম।

ভৈরবী একটা কুঁজো নিয়ে ছুটে এলেন। আমি আমার পাশের দেহটাকে দেখিয়ে দিলাম! সঙ্গে সঙ্গে তিনি বসে পড়ে সেই মহামূল্য শীতল জল, যা কাল পর্যন্ত অতি সাবধানে খরচ করা একান্ত প্রয়োজন, তার সবটুকু অকৃপণ হস্তে মাথায় মুখে ঢালতে লাগলেন। যাত্রার পূর্বে হাব নদীর কিনারায় কাকেও এক ফোঁটা কুঁজোর জল না দেবার সেই প্রতিজ্ঞাটার এইভাবে চরম গতি লাভ হল।

মুখে মাথায় জল ঢেলে কি লাভ হবে? আগে দেখা দরকার এখনও শ্বাসটুকু বইছে কিনা।

ভৈরবী তার বুকের উপর মাথা রেখে কান দিয়ে শোনার চেষ্টা করতে লাগলেন হৃৎপিণ্ডের আওয়াজ। আমি তার একটা হাত তুলে নিয়ে নাড়ী চলছে কি-না দেখবার চেষ্টা করলাম। প্রথমে একেবারেই কিছু বোঝা গেল না, তারপর মনে হল যেন ক্ষীণ, একটা গতি তখনও চলছে।

মেয়েটির বয়স তেইশ-চব্বিশের বেশী হবে না। রোদে পোড়া ফর্সা রং, হাল্কা ছিপছিপে গড়ন। একটু লম্বা ছাঁদের মুখ, চ্যাপটা বা ভোঁতা নয়। চোখ দুটি সে বুজে আছে। মাত্র দু-আঙুল চওড়া কপালে ভ দুটি পরস্পর ছুঁয়ে আছে, কোঁকড়ানো কালো ঘন চুলে বহুদিন বোধহয় চিরুনি ছোঁয়ানো হয়নি। টিকোলো নাকের বামদিকে একটা সস্তা লাল রঙের পাথর বা কাঁচ বসানো নাক ছাবি। পাতলা ঠোঁট একটু ফাঁক হয়ে রয়েছে। দুই কষ বেয়ে গাঁজলা ভেঙ্গেছে, তার স্পষ্ট দাগ দেখা যাচ্ছে। ভৈরবী ঠোঁটের মধ্যে আঙুল দিয়ে বললেন, দাঁতে দাঁত লেগে আছে বোধ হয় অনেকক্ষণ অজ্ঞান হয়ে পড়েছে।

ওধারে তখন পোপটভাই, রূপলাল—ওরা সবাই মিলে সেই লোকটাকে নিয়ে ব্যস্ত। তার দেহটা খাড়া করে বমিয়ে মাথায় মুখে জলের ঝাঁপটা দিচ্ছে, তারও জীবনের লক্ষণ নেই। ক্রমাগত 'হা আল্লা হা আল্লা' বলছে গুলমহম্মদ আর এধার ওধার ছুটোছুটি করছে।

আমি উঠে দাঁড়ালাম। দালানটার ওধারে হাওয়া একেবারে নেই। বললাম, চলো এদের সামনের দিকে নিয়ে, বাতাস পাওয়া যাবে।

পুরুষটিকে ওরা ধরাধরি করে বয়ে নিয়ে গেল। ভৈরবী আর আমি মেয়েটাকে তুলতে গেলাম। তার পায়ের দিকে ধরতে গিয়ে ভৈরবী চমকে উঠে ইশারায় আমাকে দেখালেন। শুভ্র নিটোল পা হাঁটু থেকে শেষ পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে, পায়ের পাতার উপর রুপোর চওড়া একটা অলঙ্কার আর হাঁটুর উপর দিয়ে ঘাগরার নীচে পা বেয়ে রক্তের রেখা পায়ের পাতা পর্যন্ত নেমে শুকিয়ে কালো হয়ে গেছে। সেই দিকে চেয়ে শিউরে উঠলাম!

ফিরোজা রঙের ঘাঘরা তার পরনে, তাতেও রক্ত লেগে শুকিয়ে শক্ত হয়ে রয়েছে। সরু কোমরে ঘাঘরাটা যেখানে কষে বাঁধা তার উপরে পেটের চামড়া অনেকটা দেখা যাচ্ছে। গায়ে একটা কমলা রঙের কাঁচুলি জাতীয় জামা, মাত্র বুকের উপরের মাংসপিণ্ড দুটিকে ঢেকে রেখেছে। উপরে আধখান বুক গলা পর্যন্ত খোলা। মাথার চুল থেকে পায়ের নখ পর্যন্ত খুঁটিয়ে দেখে সন্দেহের অবকাশ রইল না যে হাড় মাংসে রক্তে গড়া এই নিখুঁত বস্তুটির উপর লালসা নখদন্ত নিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ে একে নিংড়ে মুচড়ে দলে থেঁতলে এই অবস্থা করে দিয়ে গিয়েছে।

ভৈরবীর মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম তিনি নির্বাক নিস্পন্দ। তাঁর কপালের উপরে একটা শিরা দাঁড়িয়ে উঠেছে। এক হাত ঘাড়ের নীচে আর এক হাত পায়ের নীচে দিয়ে মেয়েটাকে তুলে নিলাম, যেমন করে ঘুমন্ত ছেলে-মেয়েকে তোলা হয়। ভৈরবী কুঁজোটাকে নিয়ে পিছনে পিছনে এলেন।

দালানের সামনে রকের একধারে তাকে নামিয়ে পোপটভাই আর গুলমহম্মদকে ডাকলাম। কাথীওয়াড়ী ভাইদের মধ্যে পোপটলাল প্যাটেল মুরুব্বী লোক। পাগড়িতে নীচে

তার চওড়া কপালে পাঁচ-পাঁচটা সুগভীর রেখা এধার থেকে ওধার পর্যন্ত চলে গেছে। অবস্থাটা তাঁদের বুঝিয়ে দিয়ে আর সকলকে এধারে আসতে বারণ করতে বললাম। সমস্ত শুনে গুলমহম্মদ "হা আল্লা হা আল্লা" বলে কপাল চাপড়াতে লাগল।

আঠার উনিশ বছরের ছোকরা রূপলাল হঠাৎ একেবারে চল্লিশ পার হয়ে পঞ্চাশের কোঠায় গিয়ে পৌঁছল। সকলেই যখন কিংকর্তব্যবিমূঢ়, তখন সে সমস্ত দলটার নেতৃত্ব গ্রহণ করলে। অভাবনীয় অসহায়তার মধ্যে দুটো জীবন বাঁচাতে গেলে যখন সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন হয় উপস্থিত বুদ্ধির, আর হাতের কাছে যা পাওয়া যায় তার দ্বারা যতটা সম্ভব চেষ্টা করবার- তখন রূপলাল- আমাদের চেয়ে অর্ধেকের কম বয়সের ছড়িওয়ালা, সবাইকে সাহস দিয়ে হুকুম দিয়ে কাজ করাতে লাগল, যেন এ রকমের দু-চারটে কাণ্ড এই বয়সেই তার দেখা হয়ে গেছে।

এই যাত্রায় আগাগোড়া দেখেছি যে, এই ছোকরা সারাদিন হয় চুল আঁচড়াচ্ছে, শিস দিচ্ছে, মুহব্বতকী গীত চালাচ্ছে, নয়তো লম্বা কলকেয় কষে দম দিচ্ছে; কিন্তু ঠিক প্রয়োজনের মুহূর্তে এর মধ্যে থেকে আর একটি মানুষ আত্মপ্রকাশ করেছে, যে জন্মেছে এই মরুসমুদ্রের কাণ্ডারী হয়ে, যার বাপ-ঠাকুরদাদা একের পর এক এই কর্ম করতে করতে শেষে নিজেরা পার হয়ে চলে গেছে ওপারে।

ততক্ষণে লোকটার একটু একটু জ্ঞান ফিরে আসছে। তার গা থেকে ছেঁড়া শার্টটা খুলে ফেলে দিয়ে তাকে দেয়ালে ঠেস দিয়ে বসিয়ে রূপলাল তখনও মুখে জলের ছিটা দিচ্ছিল। সেখান থেকেই আমাকে বলল গরম চায়ের ব্যবস্থা করতে। এদের গরম চা খাওয়ানো জরুরি প্রয়োজন। তৎক্ষণাৎ ছোট ভাই সুখলাল, আরো কয়েকজন জল গরম করতে লেগে গেল।

কুয়ার জল তখনও রোদের জন্য গরম ছিল। আমাদের সঙ্গে বালতি একটি, অন্য সকলের লোটার গলায় দড়ি বাঁধা; সকলেই নিজ নিজ লোটায় জল এনে ভৈরবীর বালতি ভরতি করে দিলে। আমি সেই জল ঢালতে লাগলাম আর ভৈরবী মেয়েটার শরীর থেকে রক্ত ঘষে তুলে দিলেন।

অনেক চেষ্টায় পরিষ্কার করে,কাঁচুলি আর ঘাঘড়া ছাড়িয়ে ভৈরবীর একখানা শাড়ি জড়িয়ে যখন তাকে তুলে এনে কম্বলের উপর শোয়ানো হল তখন একটা লম্বা নিশ্বাস ফেলে সে পাশ ফিরলে। পোপটলাল ভাই তার নিজের কম্বলখানা এনে তার পা থেকে গলা পর্যন্ত ঢেকে দিলেন। এ সময় শরীর গরম থাকা একান্ত প্রয়োজন। রূপলাল একটা চামচ দিয়ে গরম চা তার মুখের মধ্যে দেবার চেষ্টা করে দেখলে তখনও দাঁত ছাড়েনি। পুরুষটি তখন খানিকটা চা খেয়ে কম্বল চাপা দিয়ে শুয়েছে। ভৈরবী পুনরায় স্নান করতে গেলেন। আমি মেয়েটির পাশে বসে রইলাম।

বেলা পড়ে আসছে, রোদের তাপ অনেকটা কমেছে। আমাদের বেরুবার সময় হয়েছে নিশ্চয়ই, কিন্তু কেউ একবার সে কথা মনেও করছে না। সকলেই এদের নিয়ে ব্যস্ত। ফাঁক পেয়ে ওধারে বড় কলকেয় আগুন দিয়ে সকলে গোল হয়ে বসেছে, সেখানে চাপা গলায় কি সমস্ত আলাপ হচ্ছে-হয়তো এদের সম্বন্ধেই। এরা কারা, কোথা থেকে আসছে, কি করে এদের এ দশা হল, এই রকম অনেক প্রশ্ন সকলেরই মনে তোলপাড় করছে। কিন্তু কে উত্তর দেবে যতক্ষণ না এদের জ্ঞান ফিরে আসে!

আমি বসে আছি। ডান পাশে মেয়েটি কম্বল-চাপা পড়ে আছে। ক্রমে তার শ্বাসপ্রশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে আসছে। যেন সে ঘুমোচ্ছে। ভিজে কোঁকড়ানো চুলগুলির কয়েক গোছ মুখের উপর এসে পড়েছে। হঠাৎ মেয়েটি ফুঁপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করল। কপালের উপরের চুলগুলি সরিয়ে দিয়ে তাকে জাগাবার চেষ্টা করলাম। কোনো ফল পাওয়া গেল না। তখনও বেঁহুশ অবস্থা, সেই অবস্থাতেই সে দু-হাতের মুঠোয় আমার হাতখানা চেপে ধরে আবার চুপ করল। যেন একটা আঁকড়ে ধরবার মতো অবলম্বন পেয়ে নিশ্চিন্ত হল।

ঠিক এমনই হয়। ভাগ্যের নির্মম পরিহাসের ফলে উলঙ্গ ভবিতব্যের হাঁ-করা মুখগহ্বরে ঝাঁপ দেওয়া ভিন্ন যখন আর কোনো উপায়ই থাকে না, তখন আর চেনা অচেনা, আত্ম-পর,

জাত-বেজাতের প্রশ্নই ওঠে না। কণামাত্র সহানুভূতি, একবিন্দু সাহায্যে-যা কেবল মানুষের কাছ থেকেই পাওয়া সম্ভব-তার জন্যেই মানুষের কাছেই আমরা আছড়ে গিয়ে পড়ি। মানুষ পেলেই হল, তা সে যত দুর্বলই হোক না কেন। তাকেই আঁকড়ে ধরা তখন পরম সান্ত্বনা।

উট দুটিকে নিয়ে দিলমহম্মদ ফিরে এল। সঙ্গে নিয়ে এল একটা ছোট গলায় ঝুলাবার

হারমোনিয়াম, একটা কাঁধে ঝোলবার ঝুলি, আর একখানা পাতলা ফুলকাটা জরির ফিতে বসানো মেয়েদের চাদর, যাকে বলে ওড়না। নদীর মাঝে এক জায়গায় কুড়িয়ে পেয়েছে। কুলিটির মধ্যে পাওয়া গেল তিনটি হাড়ের চৌকা পাশা, দু-ছড়া পায়ে বেঁধে নাচবার ঘুঙুর, আরশি চিরুনি, ঠোঁটে গালে মাখবার এক শিশি রঙ, আরও এই রকমের কয়েকটি টুকিটাকি জিনিস। আর একখানা ছাপানো শাড়ি, একটা পায়জামা, নগদ এগারো টাকা কয়েক আনা পয়সা। এধারের অবস্থা দেখে শুনে দিলমহম্মদের সমস্ত শরীরে রক্ত মুখে এসে জমা হল। একেই সে কথা কম কয়, দু-হাত মুষ্টিবদ্ধ করে দাঁতে দাঁত চেপে বার-দুই উচ্চারণ করলে, "হারামিকো বাচ্চা, শয়তানকো বাচ্চা লোগ!" তার মুখের অবস্থা দেখে আর কিছু জিজ্ঞাসা করতে সাহস হলো না কারও।

সেই রাত সেখানেই থাকা ঠিক হল। এদের এ অবস্থায় ফেলে রেখে যাওয়া যায় না, সঙ্গে নিয়ে যাওয়াও এখন সম্ভব নয়। এক প্রশ্ন পানীয় জলের। জল যা আছে তাতে সারারাতে অভাব হবে না বটে, কিন্তু তারপর? ঠিক হল, ভোররাতে দিলমহম্মদ যখন উটেদের নিয়ে নদীর ধারে চরাতে যাবে তখন এক-একজন দুটো করে খালি কুঁজো লাঠির দু-মাথায় বেঁধে তার সঙ্গে গিয়ে জল ভরে আনবে। নদী তো মাত্রই আড়াই ক্রোশ। সুতরাং পরোয়া নেই, আজ রাতটা আর কাল সন্ধ্যা পর্যন্ত এদের অবস্থা কি দাঁড়ায় দেখে তারপর যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে।

মেয়েটিকে নিয়ে ভৈরবী এক ধারে আর আমরা সকলে আর এক ধারে কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়লাম। মালপত্র সহ উট দুটিকে দালানের সামনে রেখে দিলমহম্মদ ও গুলমহম্মদ সেখানেই আসন বিছাল, সদাজাগ্রত রূপলাল রোয়াকের উপর বসে একটা জুতসই মুহব্বতি গীত ধরলে।

শহর শোনবেণী হটতে হটতে একেবারে সমুদ্রের কিনারায় গিয়ে আস্তানা গেড়েছে। এমনই অশুভ লগ্নে লাসবেলা রিয়াসতের সুন্দরী রাজধানীর সঙ্গে আমাদের শুভদৃষ্টিটা হল যখন রস নামক পদার্থটি শরীরে মধ্যে থেকে বাষ্প হয়ে বেরিয়ে একেবারে উবে গিয়েছে। ফলে মোট দুই রাত দুই দিন ধরে সেখানকার ঘরকন্নার শেষ মুহূর্তটি পর্যন্ত আমাদের চক্ষু কর্ণ নাসিকা জিহ্বা ত্বক এর একটিরও তৃপ্ত হবার মতো কোন কিছুই জুটল না সেখানে।

বেলা বোধ হয় তখন বারোটার ঘরও ছাড়িয়ে গিয়েছে। উট দুটোর দুই কষ বেয়ে ফেনা দেখা দিয়েছে। আমাদের কুঁজোয় যেটুকু জল অবশিষ্ট আছে তাতে এমন অবস্থায় পৌঁছেছে যে চায়ের পাতা একমুঠো তার ভেতরে ফেলে দিলে সাভ্যালির গরম এক কাপ চা তৎক্ষণাৎ হাতে হাতে মেলে। সে সময় আমরা ঠিক হাঁটছিও না, হামাগুড়িও দিচ্ছি ও না, এই দুই-এর মাঝামাঝি একটা কসরত করে মোটের উপর দেহটাকে এগিয়ে নিয়ে চলেছি।

সর্বশেষ একটা বালির স্তূপের উপর উঠে চোখে পড়ল- চোখে পড়ল না বলে বলি আবির্ভূত হল-নীল-নীলে নীল একখানা ঢাকনা-নিরাবরণ কুশ্রী ধূসর ধরণীর সকল লজ্জা নিবারণ করে আকাশের গায়ে মিশে গিয়েছে। দৌড়ে নেমে গিয়ে ঐ নীলের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে নিজেকে লুকিয়ে ফেলবার একটা অদম্য বাসনা ভিতরে তোলপাড় করতে লাগল। বামদিকে মুখ ফিরিয়ে দেখলাম, দূরে সাগরের জল ছুঁয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে শহর শোনবেণী। নামতে শুরু করলাম।

সমাপ্তি সব কিছুরই আছে। সুতরাং হাড় মাংস অস্থি মজ্জার পিণ্ড দেহটাকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলারও সমাপ্তি হল। চারিদিকে গোল করে সিমেন্ট দিয়ে বাঁধানো একটা ইঁদারার ধারে দেহটাকে আছড়ে ফেললাম। কুয়ার পিছনেই হাত ত্রিশেক দূরে ধর্মশালা। থাকুক-ত্রিশ হাত তখন তেত্রিশ ক্রোশের ধাক্কা। শরীর যখন উঠতে পারবে নিজে থেকে, তখন উঠবে

গিয়ে ঐ ধর্মশালায়। আমার দ্বারা আর এক ইঞ্চিও একে বয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। সেখানেই শুয়ে পড়লাম।

জায়গাটায় ছায়া ছিল, অনবরত জল পড়ার দরুন শীতলও ছিল। ডান পাশ ফিরে মাথার উপর মাথা রেখে চোখ বুজলাম।

আগের দিন ঠিক এমনি সময় যা ঘটছিল আর তখন আমাদের মনের মধ্যে যা হচ্ছিল, সেই সমস্ত আগাগোড়া স্মরণ হল। সকালের রান্না-খাওয়ার পাট চুকলে পর দলসুদ্ধ সবাই একেবারে অস্থির-কতক্ষণে বেরিয়ে পড়া যাবে। অনর্থক অনেক সময় নষ্ট হয়েছে, উড়ে এসে ঘাড়ে পড়া বাজে ঝাটের দরুন। নয়তো কাল ঠিক এমনি সময় এই শোনবেণীতে আমরা পৌঁছে যেতে পারতাম। কমবেশি সকলে সেই আপশোসেই কাল এমন সময় পস্তাচ্ছিলাম। কিন্তু যথাকালে শোনবেণী পৌঁছে একটি প্রাণীর মুখেও ‘রা নেই। শান্তি বা স্বস্তি বোধ করা অনেক দূরের কথা-আমি নামক চিড়িয়াটি শরীর নামক খাঁচাটির মধ্যে টিকে আছে না উড়ে গেছে তাও ষোল আনা মালুম হচ্ছে না।

এরই নাম বোধ হয় ব্যাগার খাটা! ব্যাপার, তা সে ভূতেরই হোক আর ভবিষ্যতেরই হোক, মোটের উপর ব্যাপার হচ্ছে সব সময়েই বিড়ম্বনা। যে কাজে স্বাধীনতা নেই তাতে আনন্দের লেশমাত্র থাকতে পারে না। কি অপরিসীম উৎসাহ বুকে নিয়ে মহানন্দে কাল সন্ধ্যায় আমরা পথ চলা শুরু করি। শেষ রাতের দিকে সেই আনন্দ, উৎসাহ কোথায় কর্পূরের মতো উবে গেল যখন আস্তে আস্তে ভিতরে জন্মাতে লাগল একটা নিরীহ বাসনা-এবার থামলে হত। তার পর থেকে আরম্ভ হল গরজের তাগিদে হাঁটা। শরীর পারছে না, মন মুখ ফিরিয়ে জবাব দিয়ে বসেছে; কিন্তু চলতেই হবে, সামনে এগিয়ে যাওয়া ভিন্ন উপায়ান্তর নাস্তি। ঠিকানায় পৌঁছে থামা মানে চিরকালের মতন চলার চরম বিরতি। কাঁধের কুঁজোর মধ্যে আছে জীবন, সেইটুকু নিঃশেষ হবার পূর্বেই যেভাবে হোক পৌঁছতে হবে সেখানে যেখানে কুঁজো পুনর্বার পূর্ণ করা যাবে। তার পূর্বে মন বা শরীর কেঁদে মাথা খুঁড়ে মলেও তাদের আবদার রক্ষা করা সম্ভব নয়।

সকালে সূর্যদেব যথারীতি উদয় হলেন। কিন্তু মার্তণ্ড ভৈরবকে আমরা কেউ হাত জোড় করে স্বাগত জানালাম না। প্রণাম করার বদলে সভয়ে পিছনে ফিরে তাকিয়ে দেখলাম উদিত আদিত্য রক্তচক্ষু নিয়ে তেড়ে আসছেন আমাদের পাকড়াও করবার জন্যে। তখন সকলের মনে একটিমাত্র প্রশ্ন –”আর কতদূর?” কোনোক্রমে ইনি মাথার উপরে এসে পৌঁছবার পূর্বেই একটা যে কোনো রকমের আশ্রয়ের তলায় আমরা নিজেরা মাথা গুঁজতে যদি পারি সেই আশায় মানুষ কজন আর উট দুটির কি আপ্রাণ চেষ্টা!

কিন্তু তা কি কখনো হয়? পথ কি কারো ব্যাকুল কামনায় কমে? বরং আরও দীর্ঘ হয়। নিজের মধ্যে আকুলি-বিকুলি যত বাড়তে থাকে, পথও সেই অনুপাতে ক্রমাগত লম্বা হয় আর ঠিকানা যায় পিছিয়ে। তখন আরম্ভ হয় প্রাণহীন পথ আর সজীব পথিকের মধ্যে রুদ্ধশ্বাস সগ্রাম, শেষ পর্যন্ত পথ বা পথিক যার জিত হয়, সেই থাকে টিকে। হয় পথ খতম হয়, নয় পথিক সেই পথের বুকেই অন্তিম শয্যায় লুটিয়ে পড়ে। তখন সেই হতভাগ্যে আর তার পথ চলা দু’এরই চিরতরে সমাধি রচিত হয় পথের উপর।

এই জীবনটা কি? সূতিকাগৃহ থেকে যাত্রা শুরু পরে শ্মশান পর্যন্ত পৌঁছবার সময়টুকুর নামই তো জীবন। সেই শ্মশান পর্যন্ত পৌঁছতে কেউ হয়তো দীর্ঘদিন ধরে নানা সড়ক ঘুরে বহু ঘাটের লোনামিঠা পানি গিলে টালবাহানা করে লম্বা দেরি করে ফেলে- কেউ বা সোজা-পথে সট করে গিয়ে পৌঁছয়। কিন্তু সূতিকাগৃহ থেকে শ্মশান পর্যন্ত পথটুকু চলতে যদি ব্যাগার খাটার দিকদারি না ভোগ করতে হয় তবেই না জীবনের সার্থকতা। স্বাধীনভাবে বুক ফুলিয়ে ভালোটা মন্দটা চাখতে চাখতে মর্জিমতো থেমে জিরিয়ে শেষ পর্যন্ত পৌঁছে খুশি মনে তবে আসি’ বলে পথের কাছে থেকে বিদায় নেওয়ার নামই জীবন্ত মৃত্যু অর্থাৎ সার্থক যবনিকা-পতন।

কিন্তু এই আকাশ-কুসুম কজনের ভাগ্যে জোটে। স্রোতের মুখে খড়কুটোর মতো

ভাসতে ভাসতে ঠোক্কর খেতে খেতে উদ্দেশ্যহীন যাত্রার হঠাৎ যেখানে চরম ছেদ পড়ে তখন তাকে যেমন না বলা যায় মৃত্যু, তেমনি গুমরে কাঁদতে কাঁদতে অনিচ্ছায় পথ চলাটাকে কোনোরকমেই জীবন বলা চলে না। বেঁচে থাকা আর মরে যাওয়া-দুটোই এক বিরাট ফাঁকি হয়ে দাঁড়ায়। তাই বিদায়ের ক্ষণে সকরুণ হা-হুঁতাশ ছাড়া জমার ঘরে কিছুই পড়ে থাকে না। এরই নাম বেঁচে থাকার নির্মম পরিহাস।

তবে এবারের মতো যখন পথই খতম হয়েছে এবং আমি এখন পর্যন্ত তা হইনি তখন চোখও খুলতে হয়, উঠেও বসতে হল ছড়িওয়ালা রূপলালের তাড়নায়। ততক্ষণে মালপত্র নামানো হয়েছে, উটেরা আমার পায়ের কাছে এসে বসে পড়েছে, দিলমহম্মদও শিকল-বাঁধা বালতি দিয়ে কপিকলের সাহায্যে ইঁদারা থেকে জল তুলে বাঁধানো নালায় ঢালছে, দুটো উট আর নালায় মুখ জুড়ে চো চো করে সেই জল শুষছে। আমি মাথাটা বালতির নিচে এগিয়ে দিলাম। বালতি বালতি জল মাথা বেয়ে নালায় পড়ে উটের পেটে গিয়ে ঢুকল। ধড়ে প্রাণ ফিরে এল।

ধর্মশালাটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং চুনবালি ধরানো। এমনকি জানালা দরজাগুলিতেও রং দেওয়া। মাড়োয়াড়ীর তৈরি বাড়িটিতে রামসীতার একটি ছোট মন্দিরও রয়েছে। কেবলমাত্র যে হিঙলাজ-যাত্রীদের জন্যই এই ধর্মশালার প্রয়োজনীয়তা তা নয়, শোনবেণীতে এবং এই রিয়াসতের আরও বহুস্থানে রাজস্থানবাসী কারবারি লোক অনেক আছেন, তাঁদের সকলের জন্যে রাজধানীতে এটা একটা মজবুত আশ্রয়স্থান। দূর-দূরান্তরে পাহাড়ে জঙ্গলে দ্বীপে মরুভূমিতে, একেবারে কল্পনায়ও আসে না যে সেখানেও হিন্দু-মারোয়াড়ী থাকতে পারেন, এমন স্থানেও গিয়ে দেখা যাবে, অপরিসীম ধৈর্যের অধিকারী এই বেনিয়ারা স্বচ্ছন্দে ব্যবসা বাণিজ্য চালাচ্ছেন এবং পয়সাকড়ি কামিয়ে একটা ধর্মশালা তুলেছেন এবং একটি মন্দিরও প্রতিষ্ঠা করেছেন। এঁরাই সার্থক বলতে পারেন দেশে দেশে মোর ঘর আছে!

এখানকার বাড়িঘর সব পুবমুখী, সমুদ্রের দিকে পিছন ফিরে রয়েছে। ধর্মশালাটির দু-পাশে দু-খানি লম্বা ঘর। মাঝে চৌকো দালান, তার সামনে রোয়াক। রোয়াকের নীচে বাঁধানো উঠান। ছোট মন্দিরটি উঠানের এক কোনায়। মন্দির উঠান সমস্ত পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। তার বাইরে প্রকাণ্ড ইঁদারা-সারা শহরের ইতর দ্র হিন্দু মুসলমান সকলের পানীয় জল পাবার একমাত্র উপায়। দারা সরকারি সম্পত্তি, বাঁধানো হয়েছে সিমেন্ট পাথর দিয়ে ধর্মশালার প্রতিষ্ঠাতার অর্থে। পাঁচিলের গায়ে ধর্মশালায় প্রবেশের ফটক। মাথায় জল ঢালার পর ফটক পেরিয়ে ধর্মশালায় গিয়ে ঢুকলাম।

রোয়াকের উপর সকলে বসে পড়েছে। অনেকে দড়ি-বাঁধা লোটায় জল এনে মুখ হাত ধুচ্ছে। কে ভৈরবীকেও এক বালতি জল এনে দিয়েছে। বালতিটা সামনে নিয়ে তিনি থামে ঠেস দিয়ে বসে আছেন-একখানা ভিজে গামছায় তাঁর মুখ মাথা গলা পর্যন্ত ঢাকা। ভৈরবী বসে আছেন-হুঁশ আছে কি না বোঝা গেল না, আর তাঁর গা ঘেঁষে বসে রয়েছে সেই মেয়েটি। নাম তার কুন্তি বাই।

কুন্তিকে আনা হয়েছে ভৈরবীর সঙ্গে উটের খাঁটিয়ার মধ্যে শুইয়ে। কাল যাত্রাকালেও তার দাঁড়াবার সামথ্য হয়নি। উটের উপর ভৈরবী তাকে সারাটা পথ খেজুর আর বাদাম খাইয়ে এনেছেন। এই প্রথম তাকে খাড়া হয়ে বসতে দেখে অনেকটা নিশ্চিত হওয়া গেল।

শ্রীমান থিরুমল কিন্তু আমাদের সঙ্গে পায়ে হেঁটেই এসেছে। তবে সমস্ত পথটা দুজন দু-পাশে থেকে তাকে একরকম টানতে টানতে এনেছে। বেদম প্রহারের চোটে বেচারার হাড়গোড় বোধহয় আস্ত নেই। পণ্ডিত রূপলালের বড় কলকের টানের গুণে সেও অনেকটা সামলে গেছে। এ পর্যন্ত কেউই তাদের কোনো কথা জিজ্ঞাসা করেনি। মাত্র নাম দুটো জেনে নেওয়া হয়েছে আর জানা গেছে তারা রাজপুতানার বিকানীরের কাছে একটা গ্রামের ছেলে মেয়ে-বর্তমানে যাযাবর বেদে।

ক্রমে ধাতস্থ হয়ে যে যার কম্বল বিছিয়ে ভিন্ন ভিন্ন সীমানা নির্দিষ্ট করে গুছিয়ে বসল। হাতে অঢেল সময়। এই মুল্লুকের রাজকর্মচারীরা যাত্রী পিছু এক টাকা চৌদ্দ আনা কর নিয়ে

নিজেদের খাতাপত্রে আমাদের জমা করে ছাড়পত্র দিলে তবে আবার রওনা হয়ে যাবে। সুতরাং আপাতত নিশ্চিন্ত।

ধর্মশালায় শিলনোড়া রয়েছে, ইঁদারার আশেপাশে পুদিনার জঙ্গল। পুরানো তেঁতুল আমাদের ঝোলায়। শ্রীমান সুখলাল কালবিলম্ব না করে বাটতে বসে গেল পুদিনা আর তেতুল। আজ ভাগ্যে মহাভোজ।

হইচই করে ভোজ্য বানানো আরম্ভ হল। আমাদের মধ্যে এতেও যাঁদের উৎসাহে ভাটা পড়েনি, তারা ছুটলেন শহরের বাজারে কিছু পাওয়া যায় কি-না দেখতে। পাওয়া গেল ব্যাসম আর ছাগল দুধের দই। তাই নিয়ে তারা ফিরে এলেন। সেই ব্যাসম আর ছাগলের দুই পাতলা করে জলে গুলে নুন আর লঙ্কার গুঁড়ো মিশিয়ে এক কড়াই জ্বাল দিয়ে কাথিওয়াড়ী ভাইরা মহা আরামে রুটি ভিজিয়ে ভোজন করলেন। সেই মহা সুখাদ্য এক লোটা আমাদের জন্যেও এল, রূপ দেখে আর গন্ধ শুঁকে সে পদার্থ মুখে দিতে সাহস হল না। সুখলাল আর কুন্তী সবটুকু চেটেপুটে শেষ করলে।

খাওয়া-দাওয়ার পালা সাঙ্গ হলে আমি আর গুলমহম্মদ বাইরে কুয়োর পাড়ে গেলাম শুতে। ধর্মশালার ভেতরটা তেতে আগুন হয়ে উঠেছে, তার উপর মাছিরা সবংশে সমুপস্থিত ত রয়েছেই। বাইরেও সুবিধা হল না, নাগরিকারা জলকে এসেছেন, 'গাগরি ভরণে' নয়, ছাগলের চামড়ার খোল ভরণে।

তখন আর কি করা যাবে, নিদ্রার আশা ত্যাগ করে আমরা দুজনে শহর দেখতে বার হলাম।

দেখার মতো আশ্চর্য শহরই বটে। ধর্মশালার পশ্চিমে মিনিট পাঁচেক মাঠ আর কাঁটাঝোঁপ পার হয়ে শহরে গিয়ে ঢাকা গেল। প্রথমেই বাজার। পূর্ব পশ্চিমে লম্বা পাশাপাশি পাঁচ-ছটি চালা, এত নীচু যে প্রায় হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকতে হয়। আঁকাবাঁকা তেউড়ানো গাছের ডালের খোটা পুঁতে তার উপর ঘরের চাল। চাল ঢাকা হয়েছে যা হাতের কাছে মিলেছে তাই দিয়েই। কম্বলের টুকরো, ছেঁড়া চট, তার উপরে আলকাতরা মাখানো কাটা ত্রিপল, কোরোসিনের টিন চ্যাপটা করে আটকানো হয়েছে ঘরের চালে, বাজারে যে সমস্ত মালপত্র এসেছে তার বাক্সগুলোর কাঠও ব্যবহার করা হয়েছে। শুকনো ছাগলের চামড়াও বাদ পড়েনি। এক কথায় কিছুই বাদ পড়েনি বা ফেলা যায়নি। ফেলনা যা কিছু সব তুলে দেয়া হয়েছে ঘরের চালে। এই রকমের এক-একটা লম্বা চালার নীচে আট-দশটা দোকান। দোকানগুলিতে চব চুষ্য লেহ্য পেয় সব রকমের দাবি মেটাবার রসদ রয়েছে। তার সঙ্গে শয্যা বস্ত্র দাওয়াই কোনো কিছুরই অভাব নেই।

দুটো চালার মাঝখানে যে রাস্তা-যে রাস্তা দিয়ে খরিদ্দার-লক্ষ্মীরা শুভাগমন করেন। দোকানে-সেই হাত দশেক চওড়া রাস্তার দু-পাশে চার হাত করে বাদ দিলে মাঝখানে যে দু-হাত চওড়া স্থানটুকু থাকে, তার উপর কাঠ, চট-চামড়া, লোহার টুকরো, চাবড়া চাবড় পাথর ইত্যাদি দুনিয়ার সমস্ত প্রকার ফালতু জিনিস বিছিয়ে দিয়ে রাস্তার মাঝখানটা খানিক উঁচু করে জাগিয়ে রাখা হয়েছে, তার দু-ধারে একহাঁটু পচা পাক। দোকানগুলিতে প্রবেশ করার জন্য রাস্তার মাঝের সেই উঁচু আল থেকে দরজা পর্যন্ত লম্বা তক্তা বা লোহা ফেলে রাখা হয়েছে। মোটের উপর রূপে রসে গন্ধে সমগ্র বাজার এলাকাটি যাকে বলা চলে গুলজার করা একটি আদর্শ নরক।

তার মাঝে কাফিখানায় গ্রামোফান বাজছে। দেওয়ালে ঝুলছে সুন্দরী সিনেমা তারকাদের সদাহাস্যমুখ ফোটোগুলো। গোলমাল হাসিঠাট্টা আনন্দ-স্ফূর্তির কিছুমাত্র অভাব নেই। হাঁটু মুড়ে নিচু হয়ে দু-একখানা দোকানে ঢুকে দেখলাম-বস্তা বাক্স গামলা টিন সমস্ত খিচুড়ি পাকিয়ে টাল দেওয়া হয়েছে, মাছিতে সমস্ত কালো হয়ে গিয়েছে। তারই মাঝে কপালে চন্দন কুমকুম লাগিয়ে খুঁড়ি বার করে গেঞ্জির সামনেটা বুকের উপর তুলে, হৃষ্টপুষ্ট রাজস্থানী বেনিয়া মহাজন পরম নিশ্চিন্তে বাম হাতে শরীরের বিশেষ এক অংশ কয়ন করতে করতে ডান হাতে খেরো-বাধানো লম্বা খাতায় জমাখরচ লিখছেন।

গুলমহম্মদ অনেকের সঙ্গে 'সালাম আলেকুম' আর 'আলেকুম সালাম সারতে লাগল। ভ্যাপসা দুর্গন্ধের হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার আশায় আমি তাড়াতাড়ি পশ্চিম দিক দিয়ে বাজার থেকে বেরিয়ে গিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম।

বাজারের পশ্চিমপ্রান্ত থেকে একেবারে সমুদ্রের কিনারা পর্যন্ত বস্তি, তা প্রায় মাইল খানেক হবে। কাঁচা-পাকা ঘর-বাড়ি সমস্ত স্থানটি জুড়ে যার যেমন খুশি বসে আছে। কোনো শৃঙ্খলা নেই। কোনো পরিকল্পনার ধার ধারবার প্রয়োজন বোধ না করে শহর যাঁরা গড়েছেন তারা বাসস্থান বানিয়েছেন। রাস্তা বা গলি এ সমস্তর কোনো হাঙ্গামা নেই। সর্বত্রই পথ, অথবা কোথাও পথ বলতে কিছু নেই। যেখান দিয়ে ইচ্ছে যেমন ভাবে খুশি সব বাড়িতে যাওয়া-আসা যায়। দেখলে মনে হবে মহাশূন্য থেকে মুঠো মুঠো ঘরবাড়ি কে যেন ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছে, সেগুলো সমুদ্রের জলে না পড়ে ছত্রাকার হয়ে ছড়িয়ে পড়ে আছে ডাঙ্গায়।

শহরের ঘরবাড়ির অবস্থা অধিকাংশই বাজারের চালাগুলির মতো; আবার বালি মাটি পাথর জমানো দেওয়ালের উপর স্লেট-পাথরের ছাদওয়ালা অট্টালিকাও রয়েছে। অনেক বাড়ির মেঝে সিমেন্ট করা, কিন্তু সমস্ত ইমারতই বেঁটে। এই খর্বকায় গৃহনির্মাণের হেতু পশ্চিম দিক থেকে আগত সমুদ্রঝড়। এ দেশে ঝড়ের মরশুম বলে কোনো কিছু নেই, যখন-তখন এলেই হল, দু-পাঁচ মিনিট বা বড়জোর আধ ঘণ্টার মধ্যে সমস্ত লণ্ডভণ্ড করে দিয়ে তাড়াতাড়ি পূর্ব দিকে বেগে প্রস্থান, এই হচ্ছে এখানকার ঝড়-জলের রীতি।

বস্তি উত্তর-দক্ষিণ অনেকদূর পর্যন্ত চলে গিয়েছে। এই শহরের বাসিন্দার সংখ্যা কত তার হিসাব দেখবার কেউ নেই। তবে ঘরবাড়ি দেখে ধারণা হল, নেহাত কম ও হবে না। বাংলাদেশের বেশ বড় একটি পল্লীগ্রাম। শহরসুদ্ধ লোকের পেশা সমুদ্রে মাছ ধরা, সেই মাছকে শুঁটকিতে পরিণত করা এবং সেই শুঁটকি মাছ বস্তাবন্দি করে সমুদ্রপথে বা উটের পিঠে করাচী চালান দেওয়া। শহরময় যত্রতত্র ছোট বড় নানা আকারের মাছ-ধরা জাল দেখে এই ধারণাই হল।

শহর ভ্রমণ করতে করতে এ কথা বুঝতে কষ্ট হল না যে, এখানকার লোকে ঝটার ব্যবহার জানে না, এবং আস্তাকুঁড় বলতে কোনো কিছুর বালাই এখানে নেই। ছাই পাশ, পেঁয়াজ, ডিমের খোলা, পশুপাখির চামড়া পালক হাড়গোড়, মানুষ জীবজন্তুর বিষ্ঠা-এক কথায় যা কিছু ফেলে দেওয়া প্রয়োজন-সমস্তই সারা শহরের রাস্তাময় ছড়ানো রয়েছে। বিকারহীন শহরবাসী পরম সন্তোষে এরই মধ্যে বসবাস করছে, গৃহস্থালী করছে, বিয়ে-সাদী সন্তানপালন সমস্তই করছে। সাবাস না দিয়ে উপায় কি!

গুলমহম্মদের পরামর্শমতো, উত্তর দিকে যেখানে শহর শেষ হয়েছে সেই পর্যন্ত গিয়ে এখানকার সরকারি কাছারি পাওয়া গেল। পাকা দালান, উপরে টিন, অনেকটা আমাদের পুলিশ ফাঁড়ির মতো দেখতে। কেউ কোথাও নেই। একটি জোব্বা পরা স্ত্রীলোক এক কোনায় বসে মুরগির পালক ছড়াচ্ছিল। সে বললে যে সরকারি হুজুররা সকালে উপস্থিত থাকেন। শুনে ফিরলাম। কিন্তু আর শহরের ভিতর দিয়ে নয়, সমুদ্রের কিনারায় আরও উত্তরে খানিক এগিয়ে তারপর শহরের পাশ কাটিয়ে পূর্বদিকে মাইল দেড়েক হেঁটে প্রায় সন্ধ্যার সময় ধর্মশালায় এসে উঠলাম।

ধর্মশালার উঠানে রামসীতার মন্দিরের সিঁড়িতে তখন জমজমাট কাণ্ড। বিশ পঁচিশজন নানা বয়সের মারোয়াড়ী মহিলা লাল রঙের উপর কালোর বিচিত্র বরফি কাটা ওড়না জড়িয়ে সেই ওড়নায় মুখ ঢেকে অথচ সমস্ত উদর মায় নাভীর নীচে পর্যন্ত খোলা রেখে বিস্তর ঘেরওয়ালা নানা রঙের ঘাঘরা পরে উপস্থিত হয়েছেন। তারা সমস্ত স্থানটুকু জুড়ে ভৈরবীকে ঘিরে বসে গান আরম্ভ করে দিয়েছেন। প্রায় প্রত্যেকের সামনেই একখানি করে থালি। থালিতে রয়েছে সিঁদুরের দাগ দেওয়া ছোবড়াসুদ্ধ এক-একটি নারকেল, হলুদ ছোপানোসুতার গুচ্ছ-আর কিছু কিছু শুকনো মেওয়া মিছরি। বাংলাদেশের এক আওড়াৎ হিংলাজ-দর্শনে চলেছেন এই সংবাদ শুনে তীর্থযাত্রিনীর দর্শনলাভের জন্যে এই সমস্ত দ্রব্যসামগ্রী নিয়ে উপস্থিত হয়েছেন এঁরা। এগুলি মাতা হিংলাজের পূজার উপাচার, আপাতত হিংলাজ মায়ীর

একটি বন্দনা গীত চলেছে। হঠাৎ এ-হেন স্থানে এই অকল্পনীয় ব্যাপার দেখে থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

মহিলারা চলে গেলেন। পণ্ডিত রূপলাল সযত্নে নারকেল এবং মেওয়া-মিছরিগুলি পোটলা বাঁধলে। লালপাড় একখানি কোরা কাপড় পরা একটি মেয়ে এসে আমার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। এ আবার কে! চমকে উঠলাম। প্রণাম সেঁড়ে উঠে দাঁড়াতে দেখি-আমাদের কুন্তি।

মাথায় সাবান ঘষে স্নান করেছে। অপর্যাপ্ত রুক্ষ চুল ঘোমটার ভিতর থেকে বেরিয়ে মুখের দু-পাশ আবৃত করে নেমে এসে বুকের উপর ছাপিয়ে পড়েছে। ভাল করে স্নান করবার ফলে শরীরের গ্লানি সাফ হয়ে গিয়েছে। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে নূতন শাড়ি পরে আসা এই মেয়েটির সারা শরীরে যে স্নিগ্ধ শুচিতা আর শ্রী ফুটে উঠেছে তা দেখে চোখ জুড়িয়ে গেল। পরশুদিন যাকে কাঁধে করে বয়ে নিয়ে এনেছিলাম এ যেন সে নয়, সে ছিল একটা জড়পদার্থ, আজ এতক্ষণে তাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা হয়েছে।

ভৈরবী কুন্তিকে চায়ের জল চড়াতে বললেন। কুন্তি চলে গেল। এই অপূর্ব সৌষ্ঠববতী তৰঙ্গী মেয়েটির চলার দিকে চেয়ে রইলাম।

সেইখানেই মন্দিরের সিঁড়ির উপর বসলাম। মন্দিরে একটি প্রদীপ জ্বলছে। মাথার উপরে অনেক উঁচুতে অনেকগুলি দীপ একসঙ্গে মিটমিট করে জ্বলে উঠল। সমুদ্র থেকে গুরুগম্ভীর ধ্বনি মিষ্টি হাওয়ায় ভেসে আসছে। বাইরে আমাদের উট-দুটির গলার ঘণ্টার টিং টিং আওয়াজ হচ্ছে। সমস্ত কিছু মিল মিশে সন্ধ্যারতির সমস্ত আয়োজন যেন সম্পূর্ণ করে তুলেছে। স্থান কাল অবস্থা সব কিছু ভুলে গিয়ে ক্ষণিকের জন্যে একটি অপার্থিব তৃপ্তির আস্বাদ পাওয়া গেল। বুক ভরে একটা নিশ্বাস নিয়ে চুপ করে বসে রইলাম।

ভৈরবী বললেন, "কুন্তি আর আমাদের সঙ্গ ছাড়বে না, আমাদের সঙ্গেই সে যাবে।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "কোথায়?"

ভৈরবী উত্তর দিলেন, "এখন হিংলাজে, তারপর সেখান থেকে ফিরে আমরা যেখানে যাব সেইখানে।"

ভয়ানক আশ্চর্য হয়ে গেলাম, "কিন্তু ওর ওই থিরুমল?"

যা কল্পনাতেও আসে না সেই উত্তর পেলাম।

"থিরুমলকে ও জন্মের শোধ ছেড়েছে। থিরুমল ওর কেউ নয়। তার যেখানে খুশি সে চুলোয় যাক না, কে তাকে ধরে রেখেছে। সে কোথায় যাবে, কি করবে, কুন্তি তার জানে কি। সে আমাদের ছেড়ে কোথাও যাবে না। ওই হতচ্ছাড়াই যত নষ্টের মূল, ও দূর হয়ে যাক।

এই পর্যন্ত বলে প্রসঙ্গটা একেবারে ইতি করে তিনি তাঁর কটকী জাতি দিয়ে কটাক করে কয়েক খণ্ড সুপারি কেটে মুখে ফেললেন। তারপর একটুখানি দোক্তাপাতা ছিঁড়ে নিয়ে তাতে উপযুক্ত পরিমাণ চুন প্রয়োগ করতে মনোনিবেশ করলেন।

তা তিনি করুন, কিন্তু আমি পড়লাম ভাবনার অকূল সমুদ্রে। কে এই মেয়ে, কার ঘর থেকে এসেছে-আর অবলীলাক্রমে এই যে সে ছোকারাকে ত্যাগ করে আমাদের সঙ্গ ধরতে চাইছে-সেই ছোকরার সঙ্গে ওর সম্বন্ধই বা কি? সম্বন্ধে যাই হোক, সেই ছোকরা ঐ মেয়ের জন্যে মার খেয়ে হাড় গুঁড়ো করেছে, নিজের চক্ষে দেখেছি-এই মেয়েকে ঘাড়ে করে বয়ে আনতে আনতে সামর্থ্যের চরম সীমায় পৌঁছে নিজে মুখ। ঔজড়ে পড়ে তবে সে ক্ষান্ত দিয়েছে। "থিরুমল ওর কেউ নয়" ভৈরবীর এই কথাটি গুম গুম করে আমার মাথার মধ্যে ঘা দিতে লাগল। কেউই যদি না হবে তবে এভাবে নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে ওকে বাঁচাবার জন্য অন্তিম চেষ্টা সে করে কেন? সেই মরুর মাঝে ঐ মেয়েকে ফেলে রেখে নিজের প্রাণ নিয়ে পালালে আজ কুন্তী। থাকতই বা কোথায় আর আমাদের সঙ্গ পাকড়াতই বা কেমন করে? হয়তো সত্যিই থিরুমল ওর কেউ নয়। হতেও পারে মেয়েটার দুর্দশার কারণও এই থিরুমল ছোকরা। কিন্তু যমের গ্রাস থেকে টেনে আনতে সে নিজেই যমের মুখে ঢুকেছিল এও তো জলজ্যান্ত সত্য। "আমি তোমার কেউ নই" বা "তুমি আমার কে বটে"—এই

দুটি বাক্য উচ্চারণ করা এমন কিছু কঠিন কার্য নয়, কিন্তু... এই কিন্তুটার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেই কুঁকড়ে এতটুকু হয়ে গেলাম। পরশুদিন সেই দুপুর রোদে সেই বালির টিলার উপর দিয়ে এই মেয়েকে ঘাড়ে করে আমি খানিক বয়ে এনেছি। কেন যে সে কাজ করতে গিয়েছিলাম তখন তা ভাববারও অবকাশ ছিল না। একজন পুরুষ থিরুমল যতক্ষণ নিজের পায়ের উপর খাড়া থাকতে পেরেছে ততক্ষণ একে বয়ে এনেছে, তারপর আর একজন পুরুষ, আমি, তার অসমাপ্ত কার্যটি শেষ করেছি। বিনা দ্বিধায় এই মেয়ে বলছে থিরুমলকে, "তুমি আমার কেউ নও!" এই নিরীহ বাক্যটি আর একজন পুরুষের প্রাণে কি সুরে বাজে, এই নারী কী তা চিন্তা করে দেখেছে?

ভৈরবীকে জিজ্ঞাসা করলাম, "এ কথা থিরুমলকে বলা হয়েছে?"

উত্তর হল, "ওকে আবার বলে কি হবে? ওর যেখানে খুশি চলে যাক না, কে ওকে আটকে রেখেছে?"

গরম চা ভরতি পিতলের গেলাসটা নূতন কাপড়ের আঁচল দিয়ে চেপে ধরে কুন্তী এসে দাঁড়াল। বিশেষ এক নূতন দৃষ্টিতে ওর আপাদমস্তক একবার দেখে নিলাম। এই যে ছন্দোময় গতিভঙ্গি, এই যে ঋজুতা আর তনিমা, এর অন্তরালবর্তিনী যে নারী, সেই নারীদেহের প্রতিটি রেখা আমার একান্ত পরিচিত। মাত্র কয়েক ঘন্টা পূর্বে এর নিরাবরণ অচেতন দেহ স্বচ্ছন্দে ধুইয়েছি, মুছিয়েছি, অর্ধচেতন অবস্থায় নিজের দুই হাতের মুঠায় আমার একটা হাত চেপে ধরে এই নারী পরম আশ্বাস লাভ করেছে। আজ নূতন করে মনে হল-একে চিনিও না জানিও না। এই নূতন শাড়ির মধ্যে যে দেহ, সেই দেহের মধ্যে সত্যিকারের যে নারী, তাকে স্পষ্ট দেখতে পেলাম। বিতৃষ্ণায় মনটা তিক্ত হয়ে গেল। নারী চিরকাল পুরুষের নাগালের বাইরে, দূরে বহু দূরে যোজনান্তরে বাস করে। সেখানে পৌঁছানো পুরুষের অসাধ্য। তাকে ধরা বা ছোঁয়ার চেষ্টা করা আর মরীচিৎকার পিছনে দৌড়ানো একই কথা।

গেলাসটা কুন্তীর হাত থেকে নিয়ে বাইরে কুয়োর ধারে উঠে গেলাম। সেখানে সকলে গোল হয়ে বসেছে, বড় কলকেয় আগুন দেওয়া হয়েছে।

আমাকে দেখে ওদের মধ্যে যা আলোচনা চলছিল বন্ধ হয়ে গেল। নক্ষত্রের। আলোয় দেখে নিলাম কে কে আছে। ভাই পোপট আছেন, গুলমহম্মদ রয়েছে, সুখলাল থিরুমল এবং আরও জনাদশেক বসে রয়েছে। পিছনে কুয়োর পাড় ঠেস দিয়ে দিলমহম্মদ দাঁড়িয়ে আছে, বড় ছোট কোনো কলকের ধারই ও ধারে না। গেলাস হাতে পোপটলাল ভাই-এর পাশে গিয়ে বসে পড়লাম।

সবাই চুপচাপ, জ্বলন্ত কলকেটা একজনের হাত থেকে আর একজনের হাতে ফিরেছে। গেলাসের চা শেষ করে একবার কেশে গালটা সাফ করে নিয়ে ডাকলাম, "থিরুমল!"

সবাই একটু চমকে উঠল। থিরুমল উঠে দাঁড়াল, তারপর ঘাড় হেঁট করে উত্তর দিলে, "হাঁ জি মহারাজ!"

বললাম, "এসো এধারে, আমার কাছে বসবে।"

কুণ্ঠিত পদে এগিয়ে এল থিরুমল। হাত ধরে কাছে বসিয়ে তার পিঠে হাত বুলোতে বুলোতে জিজ্ঞাসা করলাম, "এখন কেমন মনে হচ্ছে, মানে শরীর বেশ বল পেয়েছ তো?" একথার উত্তর সে দিলে না, নিজের দুই হাঁটুর ভিতর মুখ গুঁজে ফুলে ফুলে কান্না আরম্ভ করলে। সে কান্নার অব্যক্ত ভাষা বেশ বুঝতে পারলাম কিন্তু কোনো সান্ত্বনার বাণী কারও মুখে জোগাল না।

কেবলমাত্র গুলমহম্মদ বার-দুই "হা আল্লা, হা আল্লা" বলে উঠল। অবশেষে পোপটলাল প্যাটেল মুখ খুললেন। বলতে লাগলেন তিনি দুর্ভাগার জীবনকাহিনী, যা তারা খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে জেরা করে সারা বিকেল বেলাটা ধরে এর কাছ থেকে বার করেছেন। মুক্ত আকাশের তলায় পোপটলালের ধীর শান্ত গভীর চাপা স্বর সমুদ্র থেকে ভেসে আসা গুরু গুরু ধ্বনির সঙ্গে মিশে এমন ভাবেই স্থানটিকে আচ্ছন্ন করে ফেলল যে, সবটুকু শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাতাসও যেন স্তব্ধ হয়ে রইল।

আরম্ভ করলেন পোপটলাল-খুব ছোটোবেলায় থিরুমলের বাপ-মা দু-জনেই হয় মারা যায়, নয় তাকে ফেলে পালিয়ে যায়। যারা তাকে বড় করে তুললে তাদের জাত যে কি এবং পেশা যে কি নয় তা থিরুমল শেষ পর্যন্ত জানতে পারেনি। যে মায়ের। বুকের দুধ পান করে সে বেঁচেছে তার সেই মা রাস্তায় ঘাটে বাজারে নাচত আর গান গাইত; নাচ-গানের সঙ্গে যে লোকটি হারমোনিয়াম বাজাত, বড় হয়ে থিরুমল তাকে বাবা বলে ডাকতে আরম্ভ করে। বছর সাতেক বয়স পর্যন্ত থিরুমল তার গলায় হারমোনিয়াম-ঝোলানো বাপ আর নাচিয়ে মায়ের সঙ্গে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াল।

সেই সময়ে জন্মাল তার সেই মায়ের পেটে এক মেয়ে। এই মেয়ে জন্মেই তার ভাগ্যে চিড় খাওয়ালে। এই সময় তাকে প্রথম জানানো হল যে, তারা তাকে রেল স্টেশনে কুড়িয়ে পেয়ে মানুষ করেছে এবং এখন তার ভিক্ষা করে পেট চালাবার মতো বয়স হয়েছে সুতরাং তাকে বিদায় নিতে হবে। তার সেই মা অবশ্য চেষ্টার কসুর করলে না তাকে কাজে রাখবার জন্যে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত থিরুমলকে পালাতেই হল ওই হারমোনিয়াম-বাজিয়ে বাপের অত্যাচারের তোয়।

পালিয়ে গেল সে আর একজন হারমোনিয়াম-বাজিয়ের সঙ্গে। সে লোকটা তাকে ঘাঘরা পরিয়ে মেয়ে সাজিয়ে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াতে লাগল। নাচটা তার মায়ের সঙ্গে সঙ্গে থাকতে থাকতে একরকম অভ্যাস হয়েই ছিল সুতরাং আটকাল না। এইভাবে বছর তিনেকের মধ্যে কলকাতা বোম্বাই সমস্ত ঘোরা শেষ করে লক্ষ্ণৌ গিয়ে পৌঁছোল। সেখানে থিরুমলের গলায় হারমোনিয়াম ঝুলিয়ে দিয়ে সে লোকটা নাচ গানের মায়া জন্মের শোধ ত্যাগ করল, রোগে পড়ে সে ম'লো। তখন থিরুমলের বয়স তেরো পার হয়েছে। ঘাঘরা আর কাঁচুলি খুলে থিরুমল হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। তখন সে একরকম সাবালক হয়েই পড়েছে, নেশা বলতে সব কটাই শিখেছে, হারমোনিয়ামেও বেশ হাত চলে।

কিন্তু স্বাধীনভাবে নাচ-গানের কারবার চালাতে গেল আর এক জন চাই। তেরো চৌদ্দ বছরের ছেলের আর একজন জুটবে কেন? সুতরাং তাকে অন্য পেশা ধরতে হল। পেশাটি খুবই সহজ এবং সরল; অন্য কিছুই নয়-হাত সাফাই-এর খেল দেখানো। কিন্তু ঝুঁকিটা এ পেশায় অত্যধিক। কয়েকবার ধরা পড়বার পর তাকে তিন বছরের জন্য আটকা পড়তে হল। যে বিদ্যেগুলি তখনও তার শিক্ষা হয়নি এই তিন বছরে সেই সমস্ত বিদ্যেয় একেবারে ওস্তাদ হয়ে যখন ছাড়া পেল তখন সে পূর্ণ যুবক। এতকাল তার নাম ছিল ছুনু, এবার সে হল থিরুমল।

নাড়ির টান ছিল রাজস্থানের সঙ্গে। সেখানকার জাঁকজমক হাতি হাওদা আতর গোলাপ বাদি নাচওয়ালী-এ সমস্তর সঙ্গে ছিল তার রক্তের সম্বন্ধ। উপস্থিত হল থিরুমল রাজস্থানে নিজের ভাগ্যে পরীক্ষা করতে।

ভাগ্য মুখ তুলে চাইতে কসুর করলেন না। পড়ে গেল এক বড়দরের রানা সাহেবের নজরে। তিনি তাঁকে তাঁর খাস বাইজির কাছে বহাল করে দিলেন। ফলে এই দুনিয়ার যেটুকু দেখতে আর জানতে তার বাকি ছিল অল্প দিনেই সে সমস্ত রপ্ত হয়ে গেল। আদব-কায়দা চাল-চলন যেমন নজরও গেল তেমনি পালটে। ছোট কিছুতে আর মন ওঠে না। ঘরওয়ানা ঘরের আস্তাকুঁড়ের কুত্তাটারও মেজাজ আছে।

আমিরি চালে চলছিল দিন ভালই। কিন্তু বড় ঘরের বড় ব্যাপার ঘটে বসল। এক বাগানবাড়িতে বাইজি একদিন খুন হলেন। কে তাকে গুলি করলে। তিনি তো মরে রেহাই পেলেন কিন্তু চাকর-বাকররা অল্পে রেহাই পেল না। বছরখানেক হাজতবাসের পর ছাড়া পেয়ে আবার যখন সে পথের মাঝে এসে দাঁড়াল, তখন এই দুনিয়ার হালচালের উপর তার ধিক্কার জন্মে গেছে।

এইবার সব কিছু ছেড়েছুঁড়ে দিয়ে তিনটে হাড়ের তৈরি চৌকো পাশা আর একখানা হিজিবিজি-কাটা ছক সম্বল করে সে মানুষের ভাগ্যগণনার পেশা অবলম্বন করে ফকিরি নিয়ে বের হল। এর মতো স্বাধীন নিরুপদ্রব পেশা দুনিয়ার দুটি নেই। ঝক্কি নেই, ঝামেলা নেই;

কোনো ফ্যাসাদ নেই। বিষম গরজের পুঁতোয় লোকে এসে স্বেচ্ছায় গলা বাড়িয়ে দেয়, তখন একমাত্র গুণের প্রয়োজন যিনি ভবিষ্যৎ বাতলাবেন তাঁর নিজে নির্লিপ্ত নির্বিকার ভাবটি বজায় রাখা, তারপর ধীরে-সুস্থে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে চাকু চালানো। জন্ম থেকে নানা রকমের অবস্থার ভেতর দিয়ে পার হয়ে এসে নানা ঘাটের লোনা মিঠা পানি গিলে ভিখারি আর আমির সব রকম লোকের সঙ্গে মিশে থিরুমলের একটা উচ্চশ্রেণীর নৈর্ব্যক্তিক ভাব এসেই গিয়েছিল। এখন সেটা চমৎকার কাজ দিলে এই ভাগ্য-গণনার পেশায়। ফলাও কারবার জমে গেল।

কিন্তু এবারে ফ্যাসাদ বাধল অন্য রকমের। থিরুমলের ভিতরের যে ভিতর সে এবার জেগে উঠল। শুধু জেগে উঠল না, একেবারে খেপে উঠল। খেপল ওই কুন্তীকে দেখে। ওই মেয়েকে ঘিরে সে নীড় রচনা করবার স্বপ্ন দেখতে শুরু করলে। শেষ পর্যন্ত এই বদখেয়ালই যত অনর্থের মূল হয়ে দাঁড়াল।

কুন্তী নেহাত যা-তা ঘরের মেয়ে নয়। বাপ তার একজন ছোটোখাটো জায়গীরদার। আর পাঁচজনের মতো মেয়ের দশ বছর বয়সে তিনি বিয়ে দেন উপযুক্ত পাত্রের সঙ্গে। জামাই সরকারি ফৌজের চাকুরে। ফৌজিলোক বছরে দু-চারদিনের জন্য ছুটি পেয়ে বাড়িতে এসে থাকে, আবার চলে যায়। সেই ভাবেই চলছিল। এমন সময় লাগল লড়াই। কুন্তীর ফৌজি স্বামী লড়াই শুরু হবার পর সেই যে চলে গেল-সেই যাওয়াই তার শেষ যাওয়া। লোকটার পাত্তা পর্যন্ত পাওয়া গেল না।

মানুষের ভাগ্য আর ভবিষ্যৎ বাতলাবার বিরাট দায়িত্ব স্কন্ধে নিয়ে যারা বেড়ায় তাদের কাছে যে স্ত্রীলোকদের দীর্ঘদিন স্বামীর খোঁজ মিলছে না সেই স্ত্রীলোকই সর্বগুণান্বিতা মক্কেল। কাঁধে ঝোলা ঝুলিয়ে থিরুমল যেদিন গিয়ে দাঁড়াল কুন্তীর বাপের দরজায় সেদিন সর্বপ্রথম তাকে ছক পেতে হাড়ের পাশা চেলে দেখতে হল কুন্তীর নিখোঁজ স্বামীর কোনো হদিশ মেলে কিনা। সামনে অন্য সকলের সঙ্গে বসে কুন্তীও রুদ্ধনিশ্বাসে গণকারের রায় শোনবার অপেক্ষায় রয়েছে। অনেকক্ষণ ধরে মনের সুখে অনেকবার ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পাশা ফেলে অনেক রকমের শক্ত হিসাব কষে শেষে গণস্কার কুন্তীর হাত দেখতে চাইলে। তারপর তার হাতখানি নিজের হাতের মুঠোয় পেয়ে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে রেখাবিচার করতে লাগল।

কিন্তু সে বিচার কি সহজে শেষ হয়! গণকারের নিজের বুকের ভিতরে তখন ঢিপঢিপ শুরু হয়েছে, কপালে আর কানের পাশে ফুটে উঠেছে বিন্দু বিন্দু ঘাম। যাক- শেষ পর্যন্ত টাকা পয়সা কিছুই না নিয়ে সেদিনের মতো গণৎকার বিদায় নিলে। বলে গেল, আবার সে আসবে, এসে বিচারের ফল জানাবে। তখন টাকাকড়ি যা নেবার নেবে।

এইভাবে যে কয়েকবার এল গেল, প্রতিবারই পাশার খুঁটি বহু চালাচালি করলে আর কুন্তীর হাত ধরে বসে দীর্ঘ সময় অনেক শক্ত বিচার করলে। কুন্তীর হারানো স্বামী অবশ্য শেষ পর্যন্ত হারানোই রয়ে গেল। তবে মাসখানেকের মধ্যে কুন্তীও গেল নিখোঁজ হয়ে। বোধহয় স্বামীর খোঁজেই পা বাড়ালে। গণৎকারকেও আর কখনো সে অঞ্চলে দেখা গেল না।

এই হল আরম্ভ-কুন্তী আর থিরুমলের একসঙ্গে পথচলার শুরু। এমনি করেই বছরখানেক পূর্বে শুরু হয় ওদের জীবনের দ্বৈত সঙ্গীত।

এই পর্যন্ত বলে পোটলাল ভাই একজনের হাত থেকে জ্বলন্ত কলকেটা গ্রহণ করলেন। তারপর সেটা দু-হাতের মুঠোয় বাগিয়ে ধরে তাতে ঠোঁট সংযোগ করলেন।

শোঁ শোঁ করে গোটাকতক টান দেবার পর শেষে একটি অতিদীর্ঘ মোক্ষম টানের সঙ্গে দপ করে কলকেটার মাথায় আগুন জ্বলে উঠল। তখন কলকেটা আর একজনের হাতে দিয়ে পোপটলাল দম বন্ধ করে বসে রইলেন-মহামূল্য ধূমের এক বিন্দুও না নাক-মুখ দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে অপচয় হয়।

সবাই নিস্তব্ধ, থিরুমল একভাবে হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে আছে। কান্না তার অনেকক্ষণ থেমেছে। সেই বিকেল থেকে এদের সকলের জেরার মুখে নিজের সারা জীবনের সমস্ত

খুঁটি-নাটি উজার করে নিয়ে বেচারা একেবারে নিঃস্ব হয়ে পড়েছে। নিজেকে কতদূর অসহায় বোধ করলে তবে মানুষ এভাবে বিগত জীবনটা অপরের সামনে নির্দয়ভাবে খুলে ধরে-সেই কথা চিন্তা করে শিউরে উঠলাম।

অনেকক্ষণ পর জিজ্ঞাসা করলাম থিরুমলকেই, "একটা কথা কিছুতেই বুঝতে পারছি না যে, শেষ পর্যন্ত কি আসায় তোমরা এই ভয়ানক মুলুকে মাথা গলালে! আর চলেছই বা কোথায় এই যমালয়ের মধ্যে? অন্য কোথাও পড়ে যদি মরতে অন্তত জলটুকুও তো পেতে, এখানে সে আশাও যে নেই। সাক্ষাৎ মৃত্যুর মুখে ঢোকবার জন্যে এই দুঃসাহস কেন করতে গেলে তোমরা?"

থিরুমল সেইভাবেই বসে রইল, মুখও তুললে না। উত্তর দিলে রূপলাল। এতক্ষণের এত দীর্ঘ পাষাণের মতো ভারী কাহিনীটিকে হালকা তুলো করে উড়িয়ে দিলে দু কথায়। সে বললে-বাকিটুকু ভয়ানক সোজা-একেবারে জলবৎ তরলং। প্রথমে দুজনে পালিয়ে বেড়াতে লাগল ধরা পড়বার ভয়ে। ফুরিয়ে এল দুজনের কাছে যা কিছু ছিল রেস্ত। মেয়েটার গহনাগুলি পর্যন্ত যখন উদরের টানে উবে গেল তখন আমদানি না হলে চলে কি করে? আরম্ভ হল খিটিমিটি। শেষে জন্ম থেকে রুজি রোজগারের যে উপায় থিরুমলের জানা ছিল সেই সোজা পথে পা বাড়াল। কুন্তী লাগল নাচতে-আর তার পিছু পিছু ওই পিনপিনে বাদ্যযন্ত্রটা গলায় ঝুলিয়ে ঘুরতে লাগল থিরুমল। কিন্তু তাতেও শান্তি নেই। থিরুমলের এত সাধের সম্পত্তি ওই মেয়েই হাতছাড়া হবার ভয়। নাচ দেখে যারা পয়সা দেয় তাদের ভিতর আকার অনেক বেশি পয়সা খরচ করে নাচওয়ালীকে খানিক পেতে চায়। থিরুমল দেখলে দুনিয়াসুদ্ধ সবাই হাঁ করে তেড়ে আসছে-এক গ্রাস নেবেই তাঁর বুকের পাঁজরা থেকে। তখন পালাও, পালাও। ওই মেয়ে নিয়ে এমন স্থান খুঁজে বেড়াতে লাগল যেখানে কামড় দেবার ভয় নেই। এমন সময় করাচী শহরে উপস্থিত হয়ে ওরা শুনলে একদল যাত্রী চলেছে হিংলাজে। এদের সঙ্গ ধরতে পারলে অন্তত মাসখানেক নিশ্চিন্ত। সেই আশা নিয়ে ওরাও করাচী ত্যাগ করে এল, আমরা যেদিন করাচী থেকে রওয়ানা হই তার পরদিন সকালে। প্রাণপণে আসছিল যদি আমাদের নাগাল পায়। ওরা শুনেছিল যাত্রীদলে একজন মাইজিও আছেন। আমাদের ধরতে আর মাত্র কয়েকঘন্টা বাকী, এমন সময় সেদিন নদীর মাঝে পড়ল দুশমনের সামনে। চারদিক থেকে তাড়া খেয়ে এসে শেষ পর্যন্ত বাঘের মুখেই পড়তে হল।

এতক্ষণ পরে দাঁতে দাঁত ঘষে দিলমহম্মদ উচ্চারণ করলে, "আর একবার যদি সেই শয়তান তিনটের দেখা পেতাম!"

চমকে উঠলাম, "কে তারা, তাদের চেন তুমি দিলমহম্মদ?"

হাহাকারের মতো শোনাল জবাবটা। জবাব দিলে গুলমহম্মদ, "হুজুর, সেই রাত্রি শেষে আমরা হারামি বাচ্চাদের কাছেই চা খেয়েছিলাম। তারা পরদেশি, তারা পেশোয়ারের লোক। হয় ফৌজি আদমি নয়তো ডকাত, পালিয়ে বেড়াচ্ছে, তাদের সামনেই এরা এসে পড়ে গিয়েছিল। উল্লুক পাঠারা..."

এই পর্যন্ত বলে বৃদ্ধ বার বার মাথা নাড়তে লাগল-আর তার গলা দিয়ে কিছু বার হল না।

হঠাৎ মনে হল কপালের দু-পাশের রগ দুটো টনটন করে ছিঁড়ে যাচ্ছে। আর একটি কথাও না বলে উঠে গেলাম। দারার ওপাশে নেমে অন্ধকারে বালুর উপর এধার থেকে ওধার পায়চারি করতে লাগলাম। অসহ্য যন্ত্রণায় মাথাটা যেন ছিঁড়ে পড়তে চায়।

কতক্ষণ এমনি ভাবে পায়চারি করেছিলাম খেয়াল ছিল না। ধর্মশালার ভিতর ভৈরবী সুখলালকে পাঠালেন। সংবাদ-রুটি বানানো শেষ হয়েছে; গুড় সহযোগে জলপান সমাপ্ত করে আজ রাতের মতো শুয়ে পড়া প্রয়োজন।

এতক্ষণে স্মরণ হল-আমরা হিংলাজ-যাত্রী, এবং হিংলাজ তখনও বহুদূর। ভোর রাতে স্বপ্ন দেখলাম। দেখলাম এক উৎকট স্বপ্ন। আমাদের মনুকে তিনটে শেয়ালে তাড়া করেছে। জজান আশ্রমে দীঘির পাড়ে ঘটেছে ব্যাপারটা। মনু প্রাণপণে দৌড়ে আসতে আসতে হঠাৎ পিছন ফিরে পিঠের লোম খাড়া করে রুখে দাঁড়াল। শেয়াল তিনটে তিন দিকে ঘিরেছে কিন্তু

ওর ওই ভয়ঙ্কর রূপ দেখে আর এগুতে সাহস করছে না। একটা শেয়াল এক লাফে এল তেড়ে। চক্ষের নিমেষে মনু তার দিকে ফিরে থাবা উঁচিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে আর একটা শেয়াল পিছন দিক থেকে দৌড়ে এসে মনুর ঘাড় কামড়ে ধরলে। কিন্তু রাখতে পারলে না। এক ঝটকায় নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে মনু মরীয়া হয়ে দৌড়ল আশ্রমের দিকে। তার সাদা লোমের উপর দিয়ে লাল রক্ত গড়িয়ে নামছে। ছুটে এসে ভৈরবীর কোলে ঝাঁপিয়ে পড়ল। ওকে বুকে তুলে নিয়ে ভৈরবী হাউমাউ করে কাঁদছেন, রক্তে তাঁর বুক কাপড়চোপড় ভেসে যাচ্ছে। বিড়ালটা আস্তে আস্তে নেতিয়ে পড়ল।

ঘুম ভেঙে গেল।

উঠে বসলাম। সকাল হতে আর বেশি দেরি নেই। উট দুটিকে নিয়ে দিলমহম্মদ রওয়ানা হচ্ছে। তার হাতের টাঙ্গির ছোট্ট ফলাখানির উপর নজর পড়ল। ওদের দুজনের হাতেই ওই রকম চকচকে ফলাওয়ালা দুখানা টাঙ্গি সদাসর্বদা রয়েছে। উট যদি ক্ষেপে যায় তখন ওই টাঙ্গির সাহায্যেই আত্মরক্ষা হবে। এতদিন এতবার ওই টাঙ্গি দু-খানি চোখে পড়েছে অথচ কেন যে ওই দুখানির উপর ভাল করে নজর দেবার অবকাশ পাইনি,আর আজই ওই চকচকে ফলাখানির উপর বিশেষ করে কেন যে বার বার দৃষ্টি গিয়ে পড়তে লাগল-এই কথা ভাবতে ভাবতে চোখে মুখে জল দেবার জন্যে বের হলাম। শোনবেণীতে প্রথম রাত কাটল।

আমরা মনুষ্যজাতি যখন এই পৃথিবীর অন্যান্য প্রাণীদের নাম উল্লেখ করি তখন পর পর এইভাবেই বলে যাই, যেমন-হাতি ঘোড়া উট বাঘ; কখনও বাঘকে আগে বসিয়ে বাঘ হাতি ঘোড়া উট বলি না অথবা উটকে আগে স্থান দিয়ে উট বাঘ ঘোড়া হাতি এরকমও উচ্চারণ করি না। সকল সময়ই সর্বাগ্রে হাতির স্থান, তারপর ঘোড়ার, তৃতীয় স্থান উটের এবং শেষ স্থান বাঘের। হাতির নাম প্রথমে বসায় কারো আপত্তি করার কিছুই থাকতে পারে না। কারণ হাতি হচ্ছে হাতি, এ দুনিয়ার নিয়ম হচ্ছে যা কিছু বিরাট আর দমেভারী তার কদর সবচেয়ে বেশি, চট করে চোখে ধরা যায় কিনা।

আমার বক্তব্য হচ্ছে, ঘোড়ার পরে উটকে না বসিয়ে উটের পরে ঘোড়ার স্থান দিলে কেমন হয়? হাতি উট ঘোড়া বাঘ-এইভাবে বললে যেমন ক্রমে বড় থেকে ছোটতে আসা হয়, শক্তিসামথ্যের দিক থেকে বিচার করতে গেলে তেমনি উটকে দ্বিতীয় স্থানটি দিয়ে ঘোড়াকে তৃতীয় স্থানে নামিয়ে আনলে ন্যায্য বিচারের মর্যাদা থাকে।

এক আপত্তি উঠবে যে, সৌন্দর্যের প্রতিযোগীতায় উটের স্থান কোথায় নিয়ে দাঁড়াবে তা একবার ভেবে দেখেছ কি বাপু?

উত্তরে আমি বলব, সৌন্দর্য বস্তুটা পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উপর যতটা নির্ভর করে ততটা যার সৌন্দর্য বিচার হচ্ছে তার গুণের বা রূপের উপর করে না। গণ্ডারকে আসামের জঙ্গল থেকে ধরে এনে আলিপুরে রাখলে তাকে দেখে তোক নাক সিটকাবেই, কিন্তু আসামের সেই ঘন আঁধার জলা আর জঙ্গলের মধ্যে গণ্ডার ভিন্ন অন্য কিছুই মানাবে না। আমার কথা মানতেই হবে যদি কেউ উটতে তার নিজের ঘর-গৃহস্থালীর মাঝে, তার সেই রসকষশূন্য মরুভূমিতে কাঁটাগাছ আর বাবলাগাছগুলির মধ্যে লম্বা গলা উঁচিয়ে স্বচ্ছন্দে ঘুরে কাঁটা চিবুতে দেখে। কখনো কল্পনাও করা যায় না যে, উটের সেই নিজস্ব জগতে বিশালকায় হাতিকে বা চকচকে ঝকঝকে পালিশ করা রেসের ঘোড়াকে মানাবে। একেবারে বেখাপ্পা বেসুরো বেয়াড়া বলে মনে হবে সেখানে হাতি আর ঘোড়ার উপস্থিতি। সৌন্দর্যের প্রতিযোগিতা এর সঙ্গে ওদের চলেই না। উটেরও একটা বিশেষ সৌন্দর্য আছে, সে সৌন্দর্য শ্যামবাজারে বা ভবানীপুরে মানাবে না, যদিও হাতিবাগানে হাতিকে এবং বাগবাজারে বাঘকে মানালেও হয়তো মানাতে পারে। উটের জন্য বেকবাগানই প্রশস্ত স্থান। সেখানে গিয়ে সৌন্দর্য কেন, যে-কোনো জাতের প্রতিযোগীতায় তাকে পরাস্ত করা সম্পূর্ণ অসম্ভব, তা থাকুক না তার পিঠে আস্ত একটা কুঁজ।

কুঁজ সম্বন্ধেও আমার ঘোরতর আপত্তি আছে। উটের কোনো কুঁজই নেই। আজ পর্যন্ত কোথাও একদল বা অনন্ত চ্যাপটা-পিঠওয়ালা উট কি কেউ দেখেছে? কখনো নয়। উট

মাত্রেরই পিঠটা ওই ধরনের, ওখানে কুঁজ গজাতে যাবে কোন দুঃখে? কোনো দেশের দেশসুদ্ধ লোকের দুটো পা যদি অস্বাভাবিক স্ফীত হয়, তবে কি বলতে হবে যে সে দেশের তামাম লোকের গোদ হয়েছে? তা হতে পারে না বরঞ্চ ওদের মধ্যে যদি দু-চারজনের পা সরু আর স্বাভাবিক থাকে তবে তাদেরই কোনো রোগ হয়েছে বলে ধরে নিতে হবে। সুতরাং কুপৃষ্ঠ নজদেহ ইত্যাদি বদ বিশেষণগুলির জন্যে উটেদের তরফ থেকে আমি তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপন করছি।

যে উট-দুহিতার পিঠে চড়ে ভৈরবী তীর্থযাত্রা করেছেন, আদর করে তার নাম রেখেছেন উর্বশী। শুনেই হয়তো "নহ মাতা নহ কন্যা" পড়ার দল মুখ বাঁকিয়ে বলবেন "এঃ ছি ছি ছি।" বলুন তাঁরা একশ গণ্ডা ছি ছি, বললেও ভৈরবীর বাহনের নাম তিনি বদলাবেন না, কিছুতেই তিনি মানবেন না যে, উর্বশী নাম রাখাটা একটু বেশি বাড়াবাড়ি হয়ে গিয়েছে।

আর খাঁটি কথা বলতে গেলে বলতেই হবে-কেই-বা চর্মচক্ষে দেখেছে উর্বশীকে? যার যতটা প্রাণে চেয়েছে ওই উর্বশী নামটি ঘিরে কল্পনায় রঙিন স্বপ্ন দেখার সাধ মিটিয়েছে। অপ্সরা শ্রেষ্ঠাকে কল্পনা করতে গিয়ে তাঁর বাহনের অপরূপ রূপটাই যদি ভৈরবীর মনে ভেসে ওঠে তাতে ওজর-আপত্তি করবার কি আছে! পেঁচার কথাটা ধরা যাক না। কুশ্রী কাকেও বোঝাতে গেলে বলা হয় 'পেঁচার মতো দেখতে। অথচ এই পেঁচাই মা-লক্ষ্মীর বাহন। মা-লক্ষ্মী নিশ্চয়ই পেঁচাকে পেঁচার মতো দেখেন না।

যাক, কথা হচ্ছিল উর্বশীকে নিয়ে, ভৈরবী বললেন, "ওর জন্যে মোটা করে দুখানা রুটি বানানো হোক রোজ।"

গুলমহম্মদকে কথাটা বুঝিয়ে দিতে সে আকাশ থেকে পড়ল-উট খাবে রুটি-ক্যা তাজ্জব!

কিন্তু তাজ্জবের আরও বাকি ছিল। শুধু রুটিই আছে বাকি। ইতিমধ্যে শ্রীমতী উর্বশী খেজুর কিশমিশ আখরোট বাদাম গুড় সমস্তই চেখে দেখেছেন। দিলমহম্মদের কাছ থেকে এই সংবাদ শুনে বললাম, "তার চেয়ে ওকে সুপুরি দোক্তা চর্ণটা শেখাও। একেবারে মানুষ হয়ে যাক।"

কে কার কথায় কান দেয়, কুন্তীকে হুকুম হয়ে গেল ভালো করে দুখানা রুটি পোড়াবার জন্যে।

আজ দিনের বেলা আমাদের প্রধান কর্ম-সরকারি প্রভুরা কখন উপস্থিত থাকেন, শহরে তার খোঁজ নেওয়া। তারা মেহেরবানি করে আমাদের নামধাম লিখে নিয়ে কর আদায় করে কতক্ষণে ছেড়ে দেবেন এই চেষ্টা করাই আজকের সবচেয়ে বড় প্রয়োজন। বেলা আটটার পরই রূপলাল আর গুলমহম্মদ কাছারির উদ্দেশে বেরিয়ে গেল। ঘণ্টা দেড়েক পরে ফিরল এই সংবাদ নিয়ে যে দুপুরের দিকে আপিস খুলবে, সেই সময় লেখাপড়ার পালা সাঙ্গ হবে।

দুপুর ঠিক দুপুরের সময়ই উপস্থিত হল এবং রুটি চর্বণের কর্তব্য সমাপ্ত করে জনা দশ-বারো একসঙ্গে শহরে চলে গেল। ওরা ফিরে এলে বাকি আমরা সকলে যাব, যাতে সন্ধ্যার পূর্বেই জমা-খরচ শেষ হয় এবং সন্ধ্যার সময় আমরা বেরিয়ে পড়তে পারি।

দুপুর গড়িয়ে গেল, এল বিকেল। হা-পিত্যেশ করে আমরা শহরপানে চেয়ে রইলাম। কেউ আর ফেরে না। শেষে একলা গুলমহম্মদ ফিরে এসে ঘোষণা করলে যে, আজ আর কিছু হবার আশা নেই। হুজুররা আজও অনুপস্থিত। তবে কথা পাওয়া গেছে যে, কাল সকালে অতি অবশ্য তারা উপস্থিত থাকবেন এবং যথাবিহিত সরকারি কর্তব্য সম্পাদন করে আমাদের এ স্থান ত্যাগ করবার অনুমতি দেবেন। সেই সংবাদ শুনে যারা নাম লেখাতে গিয়েছে-তারা এখন শহর দেখে বেড়াচ্ছে।

তা বেশ করেছে। কিন্তু এ তো মহামুশকিলেই পড়া গেল দেখছি! এই অনর্থক আটকা পড়ে থাকার কোনো মানে হয় নাকি? কাল সকালেই যে কর্তাদের দয়া হবে আর আমরা রেহাই পাব তারই বা নিশ্চয়তা কোথায়? এধারে আমাদের দুজনের খাদ্যে আরও দুজন লোক বাড়ল-সুখলাল তো আছেই। মনে মনে ঠিক করলাম আরও কিছু আটা এখান থেকে

জোটাতে হবে, তারপর আর একখানা নূতন শাড়িও চাই। হিংলাজ পৌঁছে নূতন কাপড় পরে তবে দেবীদর্শন করতে হয়, এজন্যে একখানা করে নূতন কাপড় সকলেই সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছে। তা ভৈরবীর খানা তো কুন্তীকেই দিতে হল। আর একখানা না হলে সেখানে পৌঁছে করা যাবে কি?

গুলমহম্মদকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, কিছু আটা শহর থেকে কেনা যায় কিনা। করাচীতে তো র‍্যাশনের দৌরাত্মে এক ছটাক বেশি পাবার উপায় নেই। এখানে র‍্যাশন নেই, কিছু আটা হয়তো মিলতেও পারে।

বুড়ো উত্তর দিলে, "হুজুর, আটা হয়তো পাওয়া যাবে, কিন্তু তা খাওয়া চলে না। গম কিনে সকলে ঘরে ভেঙে নেয়। আটা এখানে বাজারে বিকায় না, যদিও বা কোথাও মেলে তা একেবারে অখাদ্য। তার চেয়ে যদি আপনি এখানকার বানিয়া মহাজনদের জানান, তবে অনেকটা আটা অমনিই মিলবে আর তা খাওয়াও যাবে।"

বললাম, "তা হয়তো মিলবে। কিন্তু করাচী থেকে আমরা যে র‍্যাশন নিয়ে আসছি। এ তো সকলেই জানে, আবার এখানে ভিক্ষা চাইলে লোকে বলবে কি?"

গুলমহম্মদ পাগড়ির মধ্যে হাত ঢুকিয়ে মাথা চুলকাতে লাগল। তারপর বললে, "দেখি কাল সকালে কতদূর কি করতে পারি।"

কিছুই ভালো লাগছিল না। সন্ধ্যা হয়ে এল, সেই সঙ্গে এল শহুরে মশারা। রাতের আহারটা ওরা কাল রাতের মতো আজও ধর্মশালাতেই সারবে; ভিনদেশি মানুষের রক্তের ভিন্ন আস্বাদ-মশারাও মুখ বদলাচ্ছে।

ভৈরবীকে বললাম, "আজ রাতে কিছু খাব না, ছাতে উঠে শুয়ে পড়ব। তোমরা দুজনে কালকের মতো ঘরের দরজা বন্ধ করে ঘুমিও। কোনো চিন্তা নেই।"

তিনি ইশারায় জানালেন যে অতটা নিশ্চিন্ত না হওয়াই উচিত। এখন উপরে গেলে দোষ নেই কিন্তু খানিক পরে সকলে ঘুমোলে আমি যেন নীচে নেমে আসি। কালকের মতো দরজার বাইরে আমার জন্যে একখানা কম্বল তিনি বিছিয়ে রাখবেন।

ছাতের সিঁড়ি নেই। মন্দিরের সিঁড়ির উপর দাঁড়ালে পাঁচিলের মাথা কুত পর্যন্ত উঁচু। হাতে ভর দিয়ে পাঁচিলের উপর উঠলাম। মন্দিরের পূর্ব দিক দিয়ে ঘুরে দক্ষিণ দিকের পাঁচিলের উপর দিয়ে ছাতের আলসে ধরে একটু চেষ্টা করে উপরে উঠে পড়লাম। তারপর চাদর বিছিয়ে আরামে শয়ন। সিঁড়ি না থাকায় মশারা আর কষ্ট করে উপরে এল না, হু হু করে সমুদ্রের হাওয়া আসছে, শরীর জুড়িয়ে গেল; চোখের পাতা জুড়ে এল।

ঘুম ভেঙে গেল একটা বুম বুম আওয়াজে। চোখ চেয়ে দেখলাম আকাশে কে যেন এক পোঁচ আলকাতরা লেপে দিয়ে গেছে, একটি তারাও দেখা যায় না। বুক কাঁপানো আওয়াজটা আসছে বহু দূর থেকে। আসছে সমুদ্র থেকে সমুদ্র গর্জাচ্ছে। কোমরে চাদরখানা জড়িয়ে নিয়ে ছুটলাম ছাতের কিনারায়-এখন যত শীঘ্র নেমে পড়া যায়।

আলসের কাছে পৌঁছে নিচু হয়ে পাঁচিলের মাথা ঠাওর পেলাম না, এত অন্ধকার। কি আপদ, এখন নামা যায় কেমন করে? একবার বিদ্যুৎ চমকাল-পাঁচিলের বাইরে ফটকের পাশে কে ওরা দুজন? আবার আকাশে ঝিলিক খেলে গেল। এবার আর চিনতে কষ্ট হল না-লালপাড় শাড়ি পরে একজন মেয়ের হাত ধরে একজন পুরুষ।

সর্বাঙ্গ জ্বলে উঠল। কি বেহায়া, এত বড় ব্যাপারের পর দুটো রাতও সবুর সইলো না। ওই মেয়েটাই বা কতদূর বেইমান? পই পই করে ওকে বলে দেওয়া হয়েছিল যে, রাতে দরজা খুলে বেরুবার দরকার হলে যেন ভৈরবীকে জাগায়। ঠিক চুপি চুপি উঠে ভৈরবীকে না জাগিয়েই দরজা খুলে বেরিয়ে এসেছে। এখন যদি কেউ ঘরে ঢুকে…।

আর এক মুহূর্ত দেরী না করে আলসে ধরে ঝুলে পড়লাম। পায়ে পাঁচিল ঠেকল। সাবধানে পা ঘষে ঘষে মন্দির পর্যন্ত এলাম, তারপর মন্দির ঘুরে পূর্বদিকের পাঁচিলের উপর দিয়ে মন্দিরের সিঁড়ির উপর পৌঁছতে আর কতটুকু সময় লাগে। এখন সিঁড়ির উপর নেমে পড়লেই হয়।

কড় কড় কড়াৎ-কোথায় একটা বাজ পড়ল। বিকট আওয়াজের ধাক্কা সামলাতে পাঁচিলের উপরেই বসে পড়তে হল। বজ্রাঘাতের তীব্র আলোতে চোখে পড়ল ফটকের পাশে ওরা দুজনে।

বসে রইলাম পাঁচিলের মাথায়। শুনি না ওরা কি বলাবলি করে! এমনও তো হতে পারে যে দুটোই আস্ত ধড়িবাজ, গলায় চাকু চালাবার মতলবে আছে।

কিছুই শোন গেল না। বসে বসে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে পাঁচিলের উপর শুয়ে পড়লাম। এইবার কিছু কিছু শোনা গেল। যা শুনলাম তা যে ভাষাতেই বলা হোক সেই অসহায় কাকুতি

কানে যাওয়ায় বুকের ভেতরটা পর্যন্ত মোচড়াতে লাগল।

"ছুঁয়ো না আমায়।"

"কেন ছোঁব না, কি হয়েছে তোমার? তোমায় ছেড়ে কোথায় যাব আমি? বাঁচব কেমন করে?

"ছুঁয়ো না বলছি, খবরদার!"

"দয়া করো, কুন্তি-দয়া করো। যা হয়েছে সমস্ত ভুলে যাও। চলো এখান থেকে পালিয়ে। যেখানে তোক ঘর বাঁধব-কেন তুমি অবুঝ হচ্ছ?"

"বলছি আর এগিয়ো না-পথ ছাড়ো।"

"তুমি কি পাগল হলে কুন্তি? এরা তোমার কে? কাদের সঙ্গে তুমি যাচ্ছ? চলো কালই আমরা পালাই।"

"সরে দাঁড়াও বলছি বেইমান। মাইজি জাগলে আমার সর্বনাশ হবে। যে চুলোয় ইচ্ছা তুমি যাও, দূর হও।"

অসহায় আর্তনাদ করে উঠল ছোকরা। আবার বজ্রাঘাত হল। থিরুমলকে ঠেলে ফেলে দিয়ে ভিতরে দৌড় দিল কুন্তী।

প্রথমে একটা দমকা হাওয়া পশ্চিম দিক থেকে পূর্বদিকে চলে গেল। এমনই সাংঘাতিক এক ঝাঁপটা যে, পাঁচিলের উপর থেকে আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবার যোগাড়। প্রাণপণে পাঁচিলের মাথা আঁকড়ে পড়ে রইলাম। পরমুহূর্তেই আর একটা সেই রকমের ঝাঁপটা, তারপর একটার পর একটা। মুহূর্ত মাত্র অপেক্ষা না করে পাঁচিলের পূর্বদিকে দেহটা ঝুলিয়ে দিলাম। তারপর দিলাম হাত ছেড়ে। সঙ্গে সঙ্গে পাঁচিলের বাইরে বালির উপর ধপ করে পড়লাম বসে। মাথার উপর প্রলয় কাণ্ড চলতে লাগল, পাঁচিলের আড়ালে বসে থেকে আমি খানিকটা রক্ষা পেলাম।

কিন্তু এরা গেল কোথায়? মেয়েটা তো ভিতরে চলে গেল, থিরুমলের হল কি? সেও ভিতরে গেল নাকি? আর একবার পর পর তিনটে ঝিলিক দিল আকাশে। সেই আলোয় দেখলাম-ঘাড় হেঁট করে সমানে ঝুঁকে ঝড়ের সঙ্গে যুদ্ধ করতে করতে থিরুমল প্রাণপণে এগিয়ে যাবার চেষ্টা করছে সমুদ্রের দিকে।

উল্টোদিক থেকে প্রচণ্ড বিক্রমে হাওয়া ঘুরে এল। আরম্ভ হল মাতামাতি। পূর্বদিক থেকে হাওয়া যে মুহূর্তে ফিরল, পশ্চিমের থেকে পূর্বগামী ঝড়ের সঙ্গে হল তার সংঘর্ষ-একেবারে মহাপ্রলয় শুরু হয়ে গেল। হাওয়ায় হাওয়ায় বালুতে বালুতে ঝাঁপটাঝাঁপটি নিমেষে ঘূর্ণিতে পরিণত হল। একটার সঙ্গে সঙ্গে আর একটা, তারপরেই একটা, এইভাবে একটানা বিদ্যুৎ চমকাতে লাগল। চর্তুদিকে আলোয় আলো। রাশি রাশি বালু পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করে ঘুরতে ঘুরতে মহাশূন্যে উঠে পরস্পর লড়তে লাগল। ফলে যেন ঘন কুয়াশায় চারিদিক ঢেকে গেল। চোখ মেলে কিছু দেখা যায় না। তারই মাঝে আবার দেখলাম ধর্মশালার উত্তরদিকে ঘুরে ওধারে যাবার জন্যে চেষ্টা করছে থিরুমল।

যতদূর গলায় কুলোল চিৎকার করে ডাকলাম, "থিরুমল!" থিরুমল ধর্মশালার উত্তরদিকে অদৃশ্য হল।

চলল কোথায় মরতে হতভাগ্য এ সময়-এখন বাড়িটার পশ্চিমদিকে গিয়ে পড়া মানে সাক্ষাৎ আত্মহত্যা। হামাগুড়ি দিয়ে গেটের ওধারে এগিয়ে গেলাম। পূর্বদিকটা পার হয়ে ধর্মশালার উত্তরপূর্ব কোনায় এসে দেখলাম উন্মাদ মাঠের মাঝে নেমে পড়েছে–তার গতি সমুদ্রের দিকে।

ছুটলাম তার পিছু পিছু।

এইবার আরম্ভ হল লড়াই ঘূর্ণির সঙ্গে আর বালুর সঙ্গে। হাত ত্রিশ-চল্লিশ সামনে থিরুমল। সেও মরীয়া হয়ে সামনে ঝুঁকে সমানে এগিয়ে চলেছে। ঝড়ের চোটে মাটির উপর পা রাখাই দায়, এক পা এগিয়ে যাওয়া তো দূরের কথা। সোজা হয়ে দাঁড়াবার উপায় আছে নাকি! ঝাঁপটায় উল্টে ফেলে দিতে চায়।

চড়বড় চড়বড় শব্দে বড় বড় ফোঁটা তিরের মতো গায়ে বিঁধতে লাগল। তারপর যা আরম্ভ হল তাকে বৃষ্টি বলা চলে না। বিরাট বিরাট বালতি করে রাশি রাশি জল কারা যেন ছুঁড়ে মারছে। জলের তোড়ে দম বন্ধ হবার উপক্রম।

সেই ঠেঙারে জলের ভয়ে বালুরা পুনারায় ধরার বুকে আশ্রয় নিল। হাওয়াও তখন আত্মরক্ষা করতে ঊর্ধ্বশ্বাসে পালিয়ে গেল। কিন্তু পালাবে কোথা? সেই জ্যান্ত জলপ্রপাত হওয়ার পিছু পিছু ধাওয়া করল। চোখের উপর দেখলাম ঝড় আর তার পিছু পিছু জল দুই-ই পূর্বদিকে প্রাণপণে ছুটে বেরিয়ে গেল।...

হঠাৎ একেবারে সমস্ত ফাঁকা-এত বড় কাণ্ডটা যেন ভেল্কিবাজি। কেবলমাত্র মাথার উপর আকাশে এধার-ওধার বার বার তীব্র চোখ ধাঁধানো আলোর ঝলকানি খেলতে লাগল। তখনও সামনে আগে থিরুমল আর পিছনে আমি ছুটছি।

আবার চিৎকার করে উঠলাম : “থিরুমল থামো-দাঁড়াও বলছি- থিরুমল!”

কে কার কথা শোনে। পাখা গজিয়েছে ব্যাটার। এবার নির্ঘাত মরকে। পিছন ফিরেও তাকাল না।

ভয়ানক রাগ চড়ে গেল। শেষ চেষ্টা করলাম তাকে ধরবার। প্রায় কাছাকাছি পৌঁছেছি এমন সময় সে বামদিকে ঘুরে দৌড়াতে লাগল।

মাথায় তখন খুন চেপে গিয়েছে। দাঁতে দাঁত চেপে আরও কয়েক পা ছুটে এক লাফে তার পিঠের উপর গিয়ে পড়লাম। দুজনেই পড়লাম বালির উপর জড়ে। ঠেসে ধরে দমাদম গোটাকতেক কিল তার পিঠে বসিয়ে দিয়ে চুলের মুঠি ধরে তুলে দাঁড় করালাম।

হাঁপাতে হাঁপাতে মাথায় কয়েকটা ঝাঁকি দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম-”কোথায় যাচ্ছিস মরতে হারামজাদা?”

সমুদ্রের উপর আলোর রোশনাই খেলে গেল। থিরুমল ‘হা-হা হা-হা করে একটানা বিকট হাসতে শুরু করলে। সভয়ে হাতের মুঠো থেকে তার চুল ছেড়ে দিলাম। তার মুখের উপর, তার জ্বলন্ত চোখের দিকে চেয়ে দেখি এ যে সম্পূর্ণ উন্মাদের দৃষ্টি!

‘হা-হা হা-হা করে থিরুমল হাসতেই লাগল। তারপর সে নিজের দু-হাতে মুখ ঢাকা দিল। কিন্তু সেই উচ্ছল হাসি থামল না।

হাসছে থিরুমল। সমানে হতভম্বের মতো দাঁড়িয়ে আছি। ওর পিছনে পাহাড়ের মতো ঢেউ তুলে সমুদ্র আমাদের দুজনকে গ্রাস করতে তেড়ে আসছে। আলকাতরার মতো কালো সেই ঢেউ-এর মাথায় সাদা ফেনা অন্ধকারের মাঝে জ্বলজ্বল করছে। যেন বিরাট আকতির দৈত্যেরা মাথায় রূপোর মুকুট পরে সদম্ভে এগিয়ে। এখুনি আমাদের দলে পিষে গুঁড়িয়ে ফেলবে।

সমুদ্রের জল তখনও অনেক দূর। কিন্তু সেই নিবিড় আঁধারের মাঝে সাগরবেলায় দাঁড়িয়ে পশ্চিমদিকে চোখ পড়তেই মনে হল-ওই যে বড় ঢেউটা ছুটে আসছে ওটা নিশ্চয়ই আমাদের উপর এসে ভেঙে পড়বে। আর চেয়ে দেখার সাহস হল না। থিরুমলের একটা কব্জি শক্ত করে ধরে তাকে টানতে টানতে ছুটলাম ধর্মশালার দিকে।

জোরে চলবার কি তখন সামর্থ্য আছে? কোনোরকমে তাকে টেনে নিয়ে চলেছি। আকাশ আবার তারায় তারায় ছেয়ে গিয়েছে। চতুর্দিক শান্ত স্তব্ধ। পিছনে গভীর গর্জনে একটার পর একটা ঢেউ ভেঙে পড়ছে। সেই এবড়ো-খেবড়ো প্রান্তরের বুকে মাত্র আমরা দুটি প্রাণী। চলেছি আন্দাজের উপর নির্ভর করে ধর্মশালার উদ্দেশে। থিরমলও আর হাসছে না। গা ছমছম করতে লাগল।

প্রবল উত্তেজনায় ঝড়ের মধ্যে থিরুমলের পিছু পিছু যখন ছুটছিলাম তখন খেয়ালই হয়নি কতদূর গিয়ে পড়ছি। ফেরবার সময় দেখি পথ ফুরোয় না। একবার মনে হল-ভুল করে অন্যদিকে যাচ্ছি না তো? ডানদিকে ঠাহর করে দেখলাম, দূরে শোনবেণীর ঘরবাড়ি। আরও খানিকটা এগিয়ে দেখতে পেলাম-গোটাতিনেক হ্যারিকেন লন্ঠন নিয়ে কারা যেন এদিকেই আসছে।

চিৎকার করে ডাকলাম-"রূপলাল! গুলমহম্মদ" ওধার থেকে একসঙ্গে বহু গলার স্বর ভেসে এল। আলো আর লোকজন আমাদের দিকেই আসতে লাগল। আরও কাছাকাছি পৌঁছে ওরা আমাদের দেখতে পেলে। দৌড়ে এসে গুলমহম্মদ আমাকে দু হাতে বুকে আঁকড়ে ধরলে।

তার আলিঙ্গন ছাড়তে ছাড়তে সকলে এসে ঘিরে ফেলল। ভৈরবী আমার একখানা হাত চেপে ধরলেন। তাঁর মুখ দেখা গেল না, কিন্তু বেশ বুঝলাম তিনি থরথর করে কাঁপছেন।

জিজ্ঞাসা করলাম, 'কুন্তী-কুন্তী কই?' কুন্তী ভৈরবীর পিছনেই ছিল। সামনে এল। থিরুমলের হাতখানা তার হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললাম-"শক্ত করে ধরে রাখো, ছেড়ে দিলেই পালিয়ে যাবে, একেবারে পাগল হয়ে গেছে।"

হঠাৎ থিরুমল আবার সেই অর্থহীন বিকট হাসি হেসে উঠল 'হা-হা হা-হা'। সভয়ে তার হাত ছেড়ে দিয়ে কুন্তী পিছিয়ে গেল। ব্যাপারটা বুঝতে পেরে পোপটভাই থিরুমলের কাঁধের উপর হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে এগিয়ে নিয়ে চললেন।

পুবের আকাশে যখন ফিকে সাদা রং ধরতে শুরু করেছে। আমরা ফিরলাম। ন-দশ ঘণ্টা পরে জিনিসপত্র বাঁধাছাদা করে 'জয় হিংলাজ মাই-কী' ধ্বনি দিয়ে শোনবেণী ধর্মশালা থেকে আমাদের দুই দিন দুই রাতের গৃহস্থালির ইতি করা হল। কয়েকজন মারোয়াড়ী ভদ্রলোক অনেকটা পথ সঙ্গে এসে আমাদের এগিয়ে দিয়ে গেলেন। গুলমহম্মদ এঁদের কি বোঝাল সেই জানে। আটা আরও আধমণটাক বৃদ্ধি হল। আরও একটি জিনিস বৃদ্ধি হল, সেটি হচ্ছে-ডাকাতের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার ভয়।

নাম লেখাতে গিয়ে যাঁর সঙ্গে দেখা হল তিনি এখানকার উঁচুদরের শাসনকর্তাদের একজন। সাধারণ মানুষের চেয়ে মাথায় তিনি হাতখানেক বেশি উঁচু। চেহারা অনেকটা তার তলোয়ারের মতো দেখতে। ছুঁচলো দাড়ির উপর নাকের নীচেটা কামানো অল্প গোঁফের লম্বা রেখা, তার উপর মানানসই তীক্ষ্ণ নাসিকা। নাকের উপর দিকে, দু-পাশে লম্বা, যাকে বলে পটলচেরা, এই রকম দুই চক্ষু। এই সমস্ত মিলিয়ে তাঁর মুখের, বিশেষ করে তার চোখের দৃষ্টির, একটা ধার আছে। দেখা মাত্রই মনে হবে যে, এই লোকটি আর ওঁর পাশে ঝোলানো দীর্ঘ বাঁকা তলোয়ারটি একই জাতের। কোনো কিছুকে বেমালুম দুআধখানাতে পরিণত করা এঁর আর এর অস্ত্রের কাছে একেবারে ছেলেখেলা।

খাঁ সাহেব বললেন কিছুদিন ধরে শহরের আশেপাশে গুণ্ডামি রাহাজানি চলেছে। আমরা যখন ত্রিশজনেরও বেশি একদলে চলেছি তখন তারা আমাদের কাছে ঘেঁষতে সাহস করবে না, কারণ যতদূর তাঁরা সংবাদ পেয়েছেন তাতে দু-চারজনের বেশি লোক এ কার্য করছে বলে মনে হয় না। লোকগুলো বিদেশি, মরুর বুকে লুকিয়ে বেড়াচ্ছে আর সুযোগ পেলে পথিকের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে।

আমরা থিরুমলের কাহিনী চেপে গেলাম। কি জানি এঁদের জানালে যদি আটকা পড়তে হয়!

খাঁ সাহেব গুলমহম্মদ আর দিলমহম্মদকে উপযুক্ত উপদেশ দিলেন। অতি মোলায়েম উপদেশ, যদি দুশমনদের দেখা মেলে তবে যেন একেবারে তাদের নিকাশ করে দেওয়া হয়।

আভূমি সেলাম বুকে গুলমহম্মদ বললে, "তোবা তোবা, সে কথা কি আর বলতে! কুত্তারা আমাদের মুলুকের সুনাম নষ্ট করছ হুজুর।"

হুজুর প্রত্যেক কুপওয়ালাকে এই সংবাদ জানাতে আদেশ করলেন। কর জমা দিয়ে নাম, বাপের নাম, থানা জেলা ইত্যাদি লিখিয়ে আমরা শোনবেণী ছাড়বার হুকুম পেলাম।

তারপর কি আর সবুর সয়? রান্না-খাওয়ায় মাজা-ধোওয়ায় যেটুকু সময় লাগল। বেলা তিনটে নাগাদ ছড়ি উঠল।

শোনবেণী থেকে বেরিয়ে হিংলাজ ঘুরে পুনরায় শোনবেণী না পৌঁছানো পর্যন্ত আর আমাদের ছাতের তলায় মাথা দিতে হয়নি। এর পর প্রত্যহ বেলা পড়লে যাত্রা আরম্ভ করে প্রায় শেষ রাত্রি পর্যন্ত চলে কুয়োর ধারে পৌঁছে খোলা আকাশের তলায় পড়ে থাকতে

হয়েছে, যতক্ষণ না উটেরা খেয়েদেয়ে ঘুমিয়ে জিরিয়ে আবার চলতে শুরু করেছে। আসল কথা, এ যাত্রায় উটের মর্জিই হচ্ছে একমাত্র জিনিস যার উপরে কোনো আপিল চলে না।

প্রকৃত হিংলাজের পথ এখান থেকেই আরম্ভ। গত বুধবার বৈকালে আমরা করাচী ত্যাগ করি আর আজ সোমবার শোনবেণী ছেড়ে চলেছি। লোকালয়ের সঙ্গে সম্বন্ধ এইবার সত্যসত্যই ঘুচল। সামনে শোনবেণী নামে এক শহর আছে, সেখানে পৌঁছলে লোকের মুখ দেখতে পাওয়া যাবে, করাচী থেকে বিদায় নেবার সময় এটা একটা কত বড় আশার কথা ছিল। এবার সেটুকুর সম্ভাবনা সামনে কোথাও না থাকায় যাত্রাকালে মন বেশ ভারী হয়ে উঠল। একটা বালুর টিলার মাথায় দাঁড়িয়ে সমস্ত দলটাই দেখতে পেলাম। সকলের পিছনে থাকায় টিলার মাথায় দাঁড়িয়ে সমস্ত সকলকেই লম্বা সারি দিয়ে নেমে যেতে দেখলাম। দেখলাম-মুষড়ে পড়েছে, সকলেই বেম মুষড়ে পড়েছে।

মানুষ যেখানে নেই, দেবতার টোনে সেখানে অগ্রসর হওয়া ততটা সহজ নয়। মানুষের কাছে মানুষের না দেবতার কার আকর্ষণে শক্তি অধিক তাই চিন্তা করতে করতে দলের পিছু পিছু অগ্রসর হলাম। ফেলে-আসা পিছনের টান টানতেই লাগল পিছন থেকে। কিন্তু এখন কি আর ফেরবার উপায় আছে?

আমাদের এবারের লক্ষ্য-চন্দ্রকূপ। চন্দ্রকূপ-বাবার হুকুম মিললে তবে হিংলাজ। জয় বাবা চন্দ্রকুপ!

সমুদ্রকে বামে রেখে আমরা চলেছি। কিছুক্ষণ পর-পরই পিছন ফিরে শোনবেণীকে দেখে নিচ্ছি। ক্রমে ধর্মশালার ছাত অদৃশ্য হয়ে গেল। এখন শুধু দেখা যাচ্ছে। রামসীতার মন্দিরের ছোট্ট রক্তপতাকাটিকে। উচ্চ দণ্ডের মাথায় আরও কিছুক্ষণ সেই পতাকাটি দেখা গেল। ভৈরবীকে জিজ্ঞাসা করলাম-ধর্মশালা এখনও দেখা যায় কি না। উটের পিঠে অনেক ঊর্ধ্বে থাকায় আরও কিছুক্ষণ তিনি দেখতে পেলেন। তারপর শোনবেণীর সঙ্গে সম্বন্ধ ছেদ হল।

অনেক আগে থেকেই রূপলালের গীত ভেসে এল। দলের সর্বাগ্রে ছড়ি ঘাড়ে সে চলেছে। তার পিছনে পোপটলাল আছেন, তাঁর হেফাজতে কুন্তী আর থিরুমল। কুন্তী নিজের ছাপানো শাড়িখানি পরেছে আঁচল কোমরে জড়িয়ে। মাথায় তার ঘোমটা নেই। এ তার আর এক রূপ, যেন সে দলের সকলের ছোট বোনটি। কোনো জড়তা নেই, অনাবশ্যক কুণ্ঠার বা লজ্জার লেশমাত্র বালাই নেই। আনন্দের লাবণ্যের প্রাণচঞ্চল কল্যাণময়ী প্রতিমাখানি।

থিরুমলের হাত ধরে চলেছে কুন্তি। মাঝে মাঝে বিকট হাস্য করা ছাড়া আর কোনো বাতিক নেই থিরুমলের। কথাও বলে না, চোখও চায় না। যদি বা কখনো চোখ চায় তবে কি দেখছে তা বোঝা শক্ত। ফ্যালফ্যাল করে নিরর্থক বহুদূরে একভাবে চেয়ে থাকে। কুন্তী যে তার হাত ধরে নিয়ে চলেছে এও সে জানে না। কুন্তীর দৃঢ় বিশ্বাস একবার চন্দ্রকূপ-বাবার কাছে থিরুমলকে নিয়ে যেতে পারলে সব গোলমাল মিটে যাবে। যে জট পাকিয়েছে থিরুমলের জীবনসূত্রে তা খুলে যাবে। অন্তত কুন্তীকে চিনতে পারবে সে।

ওদের পিছনে সকলের খাদ্য পিঠে বাঁধা বড় উটটার দড়ি ধরে গুলমহম্মদ চলেছে, তারপর দলের অন্য সকলে ঘাড়ে-কুঁজো হাতে-লাঠি গল্প করতে করতে অগ্রসর হচ্ছে। সর্বশেষে দিলমহম্মদ আমাদের উর্বশীর নাকের দড়ি নিজের কাঁধে ফেলে যাচ্ছে-উপরে ভৈরবী হেলতে দুলতে সুপুরি দোক্তা চর্বণ করতে করতে টাল সামলাচ্ছেন। পিছনে সুখলালের কাঁধে হাত দিয়ে আমি হাঁটছি।

সমুদ্রের কিনারায় কিনারায় পথ, তা বলে হাত বাড়ালেই জল ছোঁয়া যাবে না। জল এক মাইলের বেশি দূরে এসে আছড়ে পড়ছে। ঘণ্টা দুই চলার পর জঙ্গল আরম্ভ হল। বেশ বড় বড় গাছ। এবার মাথার উপরে ছায়া পাওয়া গেল। বাবলা আর নোনা গাছই বেশি, আবার দু-চারটে তেতুলগাছও আছে। আর এরকম গাছ দেখলাম, অনেকটা ছাতিম গাছের মতো দেখতে। দিলমহম্মদ বললে, তারা এ গাছকে পিপড়ী বলে।

সেই গাছপালার ভিতর দিয়ে ক্রমে আমরা উঁচু দিকে উঠতে লাগলাম। বেশ চড়াই

আরম্ভ হল। নানা জাতের পাখি মহা শোরগোল করে মাথার উপর গাছের ডালে ফিরে আসতে লাগল। পাখিদের আজকের মতো ঘুরে বেড়ানো শেষ হল।

জঙ্গলের জন্যে সমুদ্র আর দেখা যাচ্ছে না কিন্তু তার গর্জন শোনা যাচ্ছে। মাঝে মাঝে উপর থেকে জল গড়িয়ে নেমে আসছে; উপরে কোথাও বোধ হয় জল জমেছে। এটা একটা ছোটখাট পাহাড় না কি ঠিক বুঝতে পারছি না। পাথর একখানাও চোখে পড়ছে না। সমানে চড়াই ভাঙছি। সন্ধ্যা পর্যন্ত সেই ভাবে উঁচুতে ওঠার শেষ হল না, তবে জঙ্গল ধীরে ধীরে ফাঁকা হয়ে এল। আমরা উঠতেই লাগলাম।

অবশেষে সেই চড়াই-এর মাথায় উঠে খানিকটা ফাঁকা জায়গা পাওয়া গেল। সেখানে দাঁড়িয়ে বামে অনেক দূরে অনেক নিচুতে দেখা গেল সমুদ্র। আর দেখা গেল সমুদ্র সেখানে আকাশের সঙ্গে মিশেছে সেখানটায় সমুদ্রের ভিতর থেকে প্রকাণ্ড গোল। রক্তবর্ণ ছটা আকাশের অনেক দূর পর্যন্ত রাঙিয়ে তুলেছে।

আপনা থেকে সকলের হাত জোড় হয়ে কপালে এনে ঠেকল। নেই অনির্বচনীয় ব্যাপারটা যার ইঙ্গিতে ঘটেছিল তাঁকেই বোধ হয় আমরা প্রণাম জানালাম।

শ্রীজয়াশঙ্কর মুরারজী পাণ্ডে মহাশয় ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি। কাথিওয়াড়ের জামনগর থেকে তিনি এসেছেন। এসেছেন তীর্থদর্শনের সবটুকু পুণ্য চেটেপুটে সঙ্গে নিয়ে ফিরবেন এই সৎ বাসনাটুকু সঙ্গোপনে বুকে পুরে নিয়ে। এক তোলা একরত্তি পুণ্য যদি কোনো ফাঁকে কোথাও পড়ে থাকে যা হয়তো তাঁর তীক্ষ্ণদৃষ্টিও এড়িয়ে যাবে এই আশঙ্কায় তিনি সদাসর্বদাই শশব্যস্ত।

এরও পরে আর এক বিপদ আছে, আর সে বিপদের ভয় পদে পদে। কথাটা হচ্ছে একমাত্র তিনিই ব্রাহ্মণ আর বাদবাকি দলসুদ্ধ আমরা কেউ ব্রাহ্মণ নই। কি করলে জাতি রক্ষা হয় এবং কি কি না করলে জাতি রক্ষা হয় না, এ সমস্ত শাস্ত্রীয় অনুশাসন শুধু তাঁর কণ্ঠস্থই নয় একেবারে জিহ্বাগ্রে বিরাজ করছে। এই দলের মধ্যেই জনা ছয়-সাত তাঁর শিষ্য সেবক চলেছেন। সশিষ্য দুর্বাসার মতো সশিষ্য পাণ্ডে মহারাজের শাস্ত্রজ্ঞান এবং সেই জ্ঞানের আলোর তীব্র আঁচ মরুভূমির সূর্যের তেজ আর বালুর উত্তাপকেও সময় সময় ছাড়িয়ে যাচ্ছে।

আমার উপরে তার ধারণা ভাল-মন্দ দুই স্তরই অতিক্রম করে এমন একটা স্থানে নেমে গেছে যে, আমার অতিবড় নিন্দুকও তাঁর সেই অভিমত শুনলে আমার জন্যে হায় হায় করে উঠবে। শ্রীপাণ্ডে মহারাজ শাস্ত্রবাক্য উদ্ধার করে সকলের কাছে সগৌরবে প্রমাণ করে ছেড়েছেন যে, ঘোর কলিকালে আমার মতো পাষণ্ড নাকি দু চারটে জন্মাবে। এ কথা বহুকাল পূর্বে পূজ্যপাদ শাস্ত্রকার মহোদয়গণ লিখে রেখে গেছেন। তাঁদের লিখন পাছে মিথ্যা হয় এই জন্যেই ভগবান আমার মতো মহাপাপীর সৃষ্টি করেছেন। এই যে গুলমহম্মদের হাত থেকে চা নিয়ে পান করছি, জলও প্রায় ওরাই তুলে এনে দিচ্ছে, কুঁজো তো ছুঁচ্ছেই-এ সমস্ত কর্মগুলি শুধু শ্রীভগবানের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্যই করে মরছি। শুনতে শুনতে মনমরা হয়ে আছি-এবং শ্রীভগবানের ইচ্ছা পূর্ণ হোক এই প্রার্থনা করছি।

সকলের ছোঁওয়া-ছুঁয়ির নাগালের বাইরে শ্রীপাণ্ডে নিজের জল নিজে আনেন-নিজের রুটি নিজেই পোড়ান। বাকি সময়টুকু চলতে ফিরতে উঠতে বসতে নিজের শিস্যসেবকদের শাস্ত্রীয় উপদেশ দান করেন। পাছে কোনো রকমে তাঁর সুপবিত্র গণ্ডীর মধ্যে পা দিয়ে ফেলি এই ভয়ে আমরা সদাই সশঙ্কিত। কিন্তু আমরা সাবধানে থাকলে হবে কি- আর এক আপদ সেই গণ্ডী ডিঙিয়ে পাণ্ডে মহারাজকে পাকড়াও করল। দেখি মাঝে মাঝেই আমাদের কিছুক্ষণ করে বিশ্রাম করতে হচ্ছে, মানে, এক-একবারে প্রায় অর্ধঘণ্টার মতো। ব্যাপার কি?

পাণ্ডে মহারাজ গত রাত থেকে বারংবার জঙ্গলে যাচ্ছেন। দূর থেকে দেখতে পেলাম তিনি ফিরে এলেন। যন্ত্রণার রেখা তাঁর মুখে ফুটে উঠেছে। ফিরে এসে পুনরায় কুঁজো ঘাড়ে করে হাঁটতে লাগলেন। আবার আমরা অগ্রসর হলাম।

যথোচিত গাম্ভীর্যের সঙ্গে শ্রীরূপলাল ছড়িওয়ালা ঘোষণা করলেন-আমাদের তীর্থযাত্রার প্রথম দর্শন, স্পর্শন এবং দান-দক্ষিণা করবার স্থান আগতপ্রায়। সামনের পাহাড়টার উপরে পৌঁছলেই আমরা শ্রীশ্রীগুরুশিষ্যের পবিত্র স্থানে উপস্থিত হব। এই যাত্রায় এই প্রথম পুণ্যকর্ম

প্রায় নাগালের মধ্যে এসে গেছে একথা শুনে সকলেই একটু চাঙ্গা হয়ে উঠল।

কেবল পাণ্ডে মহারাজ ঘোরতর অসন্তোষ প্রকাশ করতে লাগলেন। তাঁর শাস্ত্রে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, স্নান করে অভুক্ত অবস্থায় দর্শনাদি পুণ্যকার্যগুলি করা বিধেয়। অথচ খেয়েদেয়ে রাতের প্রথম প্রহার পার করে আমরা গুরুশিষ্যের স্থানে পৌঁছচ্ছি। এটা মহা অন্যায় এবং অশাস্ত্রীয় কাণ্ডকারখানা হতে চলেছে। আমাদের উচিত ছিল-এমন সময় যাত্রা করা যাতে গুরুশিষ্যের দর্শনটা শাস্ত্রের নির্দেশনুযায়ী হয়। অর্বাচীন ছড়িওয়ালাটা যখন জানতই যে সামনে গুরুশিষ্যের দর্শন রয়েছে তখন তার উচিত ছিল-যজমানদের স্নান করিয়ে উপবাস করিয়ে নিয়ে এসে দর্শন করানো। দর্শন হলেও সবটুকু পুণ্যসঞ্চয় হবে না। এজন্য মহা বিরক্ত হয়ে তিনি গজগজ করতে লাগলেন।

তখন পশ্চিম আকাশের শেষ প্রান্তে সেই গেরুয়া রঙের ছটাটা সমুদ্রের মাঝে তলিয়ে যাচ্ছে।

যেখানে দাঁড়িয়ে আমরা সূর্যাস্ত দেখলাম তার ডান দিকে আর একটি বড় পাহাড় মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়ে আছে। সেই পাহাড়ের উপর দিয়ে এক সোজা পথ চলে গিয়েছে পাহাড়ের ওপারে। যদি ওই পথে আরও খানিকটা কঠিন চড়াই ওঠা যায়, তখন পাহাড়ের মাথায় পৌঁছে আরম্ভ হবে সোজা উত্রাই। ওই পথে গেলে পাহাড়টা ডিঙোতে লাগবে বড়জোর দু'ঘণ্টা। গুরুশিষ্যের স্থানে পৌঁছতে সেই পথ সোজা এবং সংক্ষিপ্ত।

কিন্তু লটবহরসুদ্ধ উট ওই পথে উঠতেও পারবে না, নামতেও পারবে না। উট যাবে বাম দিক দিয়ে নেমে সমুদ্রের কিনারায়। নেমে গিয়ে বড় পাহাড়টাকে ঘুরে ওপারে পৌঁছতে চার ঘণ্টার ধাক্কা। রূপলাল প্রস্তাব করলে- সে ডাউনের চড়াই-এর পথ ধরেই যাবে। তাতে ওপারে পৌঁছে ঘণ্টা দুই আরামসে আরাম করা যাবে। পথ ভুল হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। পায়ে চলা সরু পথ একেবারে সোজা পাহাড়ের মাথায় চলে গিয়ে ওপারে নেমে গিয়েছে। আর এ পথে সে কয়েকবার এসেছে-গেছেও। সুতরাং যারা তার সঙ্গে গিয়ে আরামসে আরাম করবার বাসনা রাখে তারা চলে আসতে পারে।

দেখা গেল বাসনা আছে সকলেরই, কিন্তু সবাই গেলে চলে কি করে উট ছেড়ে? ভৈরবী হাঁটতে পারেন না, তার উপর চড়াই ভেঙে ওঠা তাঁর পক্ষে সম্ভবই নয়, সুতরাং আমাকে থাকতে হল উটদের সঙ্গে। পোপটলাল আমাদের দল ছাড়লেন না, কারণ থিরুমলকে নিয়ে চড়াই ভাঙতে তার সাহস হল না-কখন তার কি খেয়াল হবে, কি করে বসবে তার ঠিক কি! গুলমহম্মদ আর দিলমহম্মদের সঙ্গে আমরা চারজন রইলাম- পোপটলাল, থিরুমল, কুন্তী আর আমি। উট দুটি আর তাদের উপর মালপত্র ও ভৈৰবী এগুলি সামলে নিয়ে আমরা ধীরে ধীরে বামে নেমে যেতে লাগলাম।

ওরা হই হই করে রূপলালের পিছন পিছন ডানদিকের সরু পথে অদৃশ্য হল। ঠিক রইল ওপারে পৌঁছে গুরুশিষ্যের স্থানে ওরা অপেক্ষা করবে যতক্ষণ না আমরা গিয়ে পৌঁছই। তারপর দর্শনাদি সমাপন করে আবার একসঙ্গে চলা হবে।

আরও কিছুদূর নামবার পর আমরা একটা গলির মতো সরু রাস্তায় গিয়ে ঢুকলাম। দু-দিকেই পাহাড়। একটি জলের ধারা তার ভিতর দিয়ে বয়ে যাচ্ছে। মনে হয় জলধারাটির জন্যেই এই পথের সৃষ্টি হয়েছে। ঘোর অন্ধকারে সেই পথ দিয়ে অতি সাবধানে পা ফেলে আমরা চলতে লাগলাম, মানে নেমে যেতে লাগলাম।

গলিপথটা শেষ হতে বেশি দেরি হল না, অল্প কিছুদূর গিয়েই বামদিকটা পরিষ্কার হয়ে গেল। আবার সমুদ্র দেখা গেল। আরও এক ঘণ্টার উপর সমানে উত্রাই পাওয়া গেল। অবশেষে সমতলভূমিতে সমুদ্রের চড়ায় আমরা নেমে এলাম। এইবার আমাদের ডানদিকে ঘুরে বড় পাহাড়টার ওধারে যেতে হবে।

ঠিক যেখানে আমাদের ডানদিকে ঘুরতে হবে সেই কোণটায় একখানা বড় পাথর পাহাড়ের গা থেকে বেরিয়ে অনেক উঁচুতে ঝুলে আছে। তার নীচে দিয়ে রাস্তা-অনেকটা গাড়িবারান্দা-ঢাকা ফুটপাতের মতো। গুলমহম্মদ বড় উটটাকে নিয়ে সামনে চলছিল-সে

প্রথমে কোণটা ঘুরে গেল।

পরমুহূর্তেই চেঁচিয়ে উঠল-"কে, কারা ওখানে?" আমরা থমকে দাঁড়িয়ে পড়লাম। আবার শোনা গেল গুলমহম্মদের ওই এক প্রশ্ন?

ঊর্বশীর দড়িগাছা আমার গায়ে ফেলে দিয়ে দিলমহম্মদ ছুটে গেল কোণটা ঘুরে। তাড়াতাড়ি আমরা পা চালালাম।

কোণ ঘুরতেই দেখা গেল রাস্তার উপর বড় উটটার গলার নীচে দাঁড়িয়ে গুলমহম্মদ। আরও খানিকটা সামনে ডানদিকে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে কারা যেন বসে রয়েছে। অন্ধকারে কতজন বোঝা গেল না, ওখান থেকে একটা স্পষ্ট গোঙানি কানে এল। কে যেন মরণ-যন্ত্রণায় আর্তনাদ করছে!

দিলমহম্মদ সেইদিকে এগিয়ে গিয়েছে। একটা ধমক দিয়ে সে জিজ্ঞাসা করলে "উত্তর দাও বলছি, তোমরা কে?"

কোনো উত্তর নেই-কেবল সেই অসহায় আর্তনাদ ছাড়া কোনো সাড়াশব্দ পাওয়া গেল না।

বড় উটের পিছনে গিয়ে ছোট উট থামল। আমাদের আলো ভৈরবীর খাঁটিয়ার পায়ায় বাঁধা ছিল। দেশলাইটা তাকে দিয়ে ওটা জ্বালাতে বললাম। তিনি আলো জ্বেলে ঝুলিয়ে দিলেন-পোপটলাল সেটা ধরে নিয়ে এগিয়ে গেলেন। আমি উটের দড়ি ধরে দাঁড়িয়ে আছি।

বড় উটের পাশ দিয়ে পোপটলাল সামনে গিয়ে পড়তেই গুলমহম্মদ প্রচন্ড ধমক দিলে, "এগিও না, খবরদার!" সেই ধমকের সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকারের ভিতর থেকে একটা লোক ছিটকে উঠে দিলমহম্মদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল; নিমেষ মধ্যে লণ্ঠনের আলোয় গুলমহম্মদের টাঙ্গির ফলাখানা ঝলক দিয়ে উঠল। বুড়ো লাফিয়ে পড়ল সামনে। পরমুহূর্তেই একটা মর্মভেদী চিৎকার পাহাড়ের মধ্যে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল।

আমার ঠিক পিছনেই কুন্তী চিৎকার করে উঠল। এক ঝটকায় তার হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে থিরুমল তীরবেগে ছুটে গেল সেইদিকে। সভয়ে দেখলাম- একখানা প্রকাণ্ড ছোরা হাতে আর এক মূর্তি অন্ধকারের মধ্যে খাড়া দাঁড়িয়ে উঠেছে। সামনে ঝুঁকে সে একটু একটু করে এগুচ্ছে গুলমহম্মদের দিকে। গুলমহম্মদ স্থিরনিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

অন্ধকারের ভিতর থেকে দিলমহম্মদের গলায় আওয়াজ উঠল, "হুশিয়ার!" এবং তার বাক্য শেষ হবার পূর্বেই হিংস্র পশুর মতো লোকটার পিঠের উপর প্রচণ্ড বেগে ঝাঁপিয়ে পড়ল থিরুমল।

আমায় এক ধাক্কায় সরিয়ে দিয়ে ছুটে বেরিয়ে গেল কুন্তী-পোপটলাল একটা অদ্ভুত চিৎকার করে উঠলেন।

রুদ্ধ নিশ্বাসে দেখছি-সেই প্রকাণ্ড জোয়ানটার পিঠের উপর আঁকড়ে ধরে ঝুলছে থিরুমল, আর লোকটা হাত ঘুরিয়ে তাকে ছোরা মারবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টা করছে।

কিন্তু তাদের কাছে কুন্তীর পৌঁছবার পূর্বেই লাফিয়ে উঠল দিলমহম্মদ। সঙ্গে সঙ্গে তার হাতের টাঙ্গির ফলাখানার প্রায় সমস্তটাই সেই লোকটার বড় বড় চুলওয়ালা মাথাটায় বসে গেল।

আর একটা ভয়ঙ্কর আর্তনাদ-সেই আর্তনাদের সঙ্গে থিরুমলকে পিঠে নিয়ে লোকটা মুখ খুঁজড়ে পড়ল, তাদের উপর গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল কুন্তী।

চক্ষের নিমেষে সমস্ত ঘটে গেল। আমি আর পোপটভাই দাঁড়িয়ে কাঠ হয়ে রইলাম। উটের উপর ভৈরবী ডুকরে কেঁদে উঠলেন। "হা-হা হা-হা থিরুমলের বিকট হাসি শোনা যেতে লাগল।

সামনে এসে দাঁড়াল দিলমহম্মদ। মাথার পাগড়ি কোথায় চলে গিয়েছে, সর্বাঙ্গে জামা জোব্বা রক্তে রাঙা। তার হাতের টাঙ্গির ফলাখানাও টকটকে লাল। পোপটলালের হাত থেকে আলোটা নিয়ে এগিয়ে গেল সে, যেখান থেকে তখনও মৃত্যুযাত্রীর অন্তিম কাতরানি উঠছে, সেইদিকে।

ছুটে গেলেন পোপটলাল কুন্তী আর থিরুমলের দিকে। গুলমহম্মদ এসে আমার হাত থেকে উটের দড়িগাছা নিলে। ভৈরবীকে কাঁদতে বারণ করলে। আর ভয় নেই–সব মিটে গেছে। ভৈরবী নামতে চাইলেন। দড়ি ধরে দিলমহম্মদ উটকে বসাতে লাগল।

আমি এগিয়ে গেলাম দিলমহম্মদের কাছে।

পাহাড়ের গা ঘেঁষে একটা লোক উপুড় হয়ে বালুতে মুখ রগড়াচ্ছে, লোকটা একেবারে উলঙ্গ। জামা জোব্বা সমস্ত টুকরো টুকরো করে ছেঁড়া তার পাশে ছড়ানো রয়েছে। আলোটা আরও কাছে নিতে দেখা গেল একটা পা ফুলে নীল হয়ে গেছে।

আমার হাতে আলো দিয়ে দিলমহম্মদ লোকটাকে চিত করে দিল। তার নাক মুখ দিয়ে ফেনা বেরুচ্ছে। আরও দু-একবার কাতর আর্তনাদ করে লোকটা ধুনকের মতো

বেঁকে উঠল। তারপর তার কাতরানি বন্ধ হল, চিরকালের জন্যে সমস্ত যন্ত্রণার অবসান হয়ে গেল তার।

দিলমহম্মদ বললে, “সাপে কেটেছে।”

আলো নিয়ে আমরা উটের কাছে ফিরে এলাম। কুন্তী আর থিরুমলকে ধরে নিয়ে এলেন পোপটলাল।

গুলমহম্মদ তার ছেলের হাত থেকে আলোটা নিয়ে তার সর্বাঙ্গ ভালো করে দেখে নিলে। তারপর আলোটা নামিয়ে রেখে ছেলেকে দু-হাতে বুকে জাপটে ধরে চুমার পর চুমা খেতে লাগল।

কয়েকটা মুহূর্তের মধ্যে কাণ্ডটা ঘটে গেল। পাহাড়ের নীচে অন্ধকারে আত্মগোপন করে মৃত্যু আমাদের অপেক্ষায় হাঁ করে বসে ছিল। নিরুদ্বিগ্ন চিত্তে আমরা আসছি-সোজা সেই হাঁ করা মুখের মধ্যে প্রবেশ করতে। সবই ঠিকমতো ঘটতে চলেছিল, কিন্তু বাদ সাধল এরা দুজন-এই বৃদ্ধ পিতা আর তার নির্ভীক যুবক পুত্র। বিন্দুমাত্র দ্বিধা না করে লাফিয়ে পড়ল সামনে, অকম্পিত কঠোর হস্তে আঘাত হেনে মৃত্যুকে নিরাশ করলে। নিরাশ করলে বলা উচিত নয়, বরং বলা চলে মৃত্যুকে মৃত্যু উপহার দিলে। তা যদি না হত, যদি এরা মনে করত আমরা বিধর্মী, বিদেশী, আমাদের কিছু হলে ওদের কি! বরং মালপত্র আমাদের সঙ্গে যা আছে তার ভাগ কিছু পেলে নিদারুণ অভাবের সামান্য কিছুটা ঘুচতে পারে। আরও কত কি বিবেচনা করতে পারত। ফলে এতক্ষণে আমরা তীর্থযাত্রার পথ থেকে ছিটকে অনেক দূরের অন্য এক পথে যাত্রা করতাম।

একটিমাত্র লণ্ঠনের আলোয় অন্ধকারকে আরও রহস্যময় করে তুলেছে। যেন অন্ধকারে আড়ালে আরও অনেকে লুকিয়ে দাঁড়িয়ে আছে, এইবার দল বেঁধে আমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়বে। অদূরে তিনটে লোক মরে পড়ে আছে। জীবন্ত বিভীষিকার মাঝে সেই সামান্য আলোয় দেখছি আর এক দৃশ্য-এক বৃদ্ধ পিতা পিতৃহৃদয়ের শাশ্বত অমৃতধারায় এক ভাগ্যবান পুত্রকে স্নান করিয়ে দিচ্ছে। কোথায় তলিয়ে গেল এত বড় মর্মান্তিক ঘটনাটা-কোথায় উবে গেল কয়েক মুহূর্ত পূর্বের নিদারুণ উত্তেজনা। একটি স্নিগ্ধ-মধুর অনুভূতিতে শরীরের প্রতি অণু পরমাণু থরথর করে কাঁপতে লাগল। বাৎসল্য রসটি কি জাতের রস, সন্তানের উপর মায়া কি ধরনের ব্যাপার, পিতার হৃদয়ের ব্যাকুলতা কি পদার্থ, তার চাক্ষুষ পরিচয় পেলাম। শুধু পেলাম নয়, আকণ্ঠ সেই রস পান করে নেশায় বুঁদ হয়ে গেলাম-সে নেশা আনন্দের না ব্যথার আজ তা ঠিক করে বলতে পারব না।

বাবা ছেড়ে দিলে পর দিলমহম্মদ কুন্তীর সামনে এসে দাঁড়াল। এই প্রথমবার সে কুন্তীর সঙ্গে কথা বললে। বললে, “বাই, তোমাকে যারা অপমান করেছিল, সেই জানোয়ারদের খুনে আমি গোসল করেছি। এবার তুমি ওই শয়তানদের কথা মন থেকে মুছে ফেলো, ওরা জাহান্নামে যাক।”

পোপটলাল একটা জলের কুঁজো নামিয়ে আনলেন। আমরা সকলে আকণ্ঠ জলপান করলাম, তৃষ্ণায় বুকের ছাতি শুকিয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিল।

বড় উটের উপর থেকে ওদের নিজেদের ঝোলা নামিয়ে আনল দিলমহম্মদ। ঘোয়া

কাপড়-চোপড় বার করে রক্তমাখা জামা-জোব্বা বদলে ফেলল। থিরুমলকেও তার পাজামা শার্ট ছাড়ানো হল। কুন্তী তার শরীর থেকে সমস্ত রক্তের দাগ মুছে দিল; পোপটলালের একখানা ধুতি পরিয়ে কুন্তীর সঙ্গে তাকে উর্বশীর পিঠে তুলে দেওয়া হল। ভৈরবী হেঁটেই চললেন আমার চিমটেখানা বাগিয়ে ধরে।

যাত্রার পূর্বে গুলমহম্মদ আর পোপটলাল ওধারে গিয়ে মৃত লোক তিনটের কাছে জিনিসপত্র কি আছে দেখে এল। গোটাকতক টাকা আর তিনখানা ছোরা ভিন্ন বিশেষ কিছুই পাওয়া গেল না।

আমরা অগ্রসর হলাম। মাথার উপরের পাথরখানার নীচে থেকে খোলা আকাশের তলায় বেরিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচা গেল। গুলমহম্মদ বললে, "রাত কাবার হবার আগেই জন্তু-জানোয়ার ওদের সাবাড় করে ফেলবে।"

"কি জানোয়ার?"

দিলমহম্মদ বললে, "নেকড়ে।"

গুলমহম্মদ সাবধান করে দিল, "ঘুণাক্ষরেও এসব কথা কোথাও যেন বলা যাবে না হয়।"

কুন্তীকে হুঁশিয়ার করলে দিলমহম্মদ-"বহিন, সাবধান, থিরুমল যেন পড়ে না। যায়।"

উপর থেকে কুন্তী জানালে-"ভয় নেই, সে ঘুমিয়ে পড়েছে।" পোপটলাল বিনীতভাবে একটা বিড়ি প্রার্থনা করলেন। অনেকক্ষণ ছিলিম না পাওয়ায় বেচারার কষ্ট হচ্ছিল।

আমরা পাহাড়ের ধার ছাড়লাম। সোজা উত্তর-পূর্ব কোণায় চলতে লাগলাম, ক্রমে আবার জঙ্গল আরম্ভ হল।

অনেকক্ষণ পরে পোপটলাল বললেন, "সেদিনই ওরা আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ত। অনেক লোকজন দেখে সাহস করেনি।"

দিলমহম্মদ বললে, "বাবা তখনই আমাকে বলেছিলেন। এরা ডাকাত।"

পোপটলাল দীর্ঘনিশ্বাস ছেড়ে বললেন, "পাপের শেষ ফল কি মারাত্মক!"

এ কথার কেউ জবাব দিলে না। পৌঁছলাম গুরুশিষ্যের স্থানে। দূর থেকে রূপলালের গলা শোনা গেল, "শ্রীহিংলাজ দেবী-রানী কি-"

আমি আর পোপটলাল উত্তর দিলাম, "জয়।"

গুলমহম্মদও এক বিচিত্র আওয়াজ করলে। এই গাছপালার মধ্যে তাদের সকলকে সটান শুয়ে থাকতে দেখলাম। দু-ঘণ্টা নয়-প্রায় তিন ঘণ্টার মতো সকলের আরামসে আরাম করা হয়েছে।

শ্রীশ্রীগুরুশিষ্যের স্থানে শ্রীশ্রীগুরুদেব আর শিষ্য মহাশয় দুজনে দুখানা কালো পাথরে পরিণত হয়ে পড়ে আছেন। প্রতি পাথরখানা তিন সাড়ে তিন হাত লম্বা আর দেড় কি দু হাত চওড়া। বালির ভিতর কতটা গাড়া আছে জানি না, বালির উপর অন্তত এক হাত করে জেগে আছে পাথর দু-খানা। ধারে-কাছে এই ধরনের পাথর আর একখানাও দেখা গেল না। কেউ কোথাও থেকে বয়ে এনে সেখানে পাথর দু খানা রেখে গেছে সে ধারণা না করে, বরং একদা গুরু আর এক শিষ্য হিংলাজ দর্শন করে ফেরবার সময় এখানে পড়ে কোনো কারণে পাথর হয়ে আছেন এবং যুগযুগান্তর পরে ভগবান শ্রীরামচন্দ্র পুনরায় আবির্ভূত হয়ে যখন হিংলাজ দর্শনে গমন করবেন তখন তাঁর শ্রীচরণস্পর্শে এঁরা উদ্ধার হয়ে উঠে দাঁড়াবেন, একথা বিশ্বাস করা অনেক সহজ, অনেক আরামের। তাই মেনে নিয়ে আমাদের পাণ্ডা শ্রীমান রূপলালের নির্দেশমতো মন্ত্র আউড়ে পাথরের উপর কুঁজোর জল দিলাম, দক্ষিণা দিলাম। তা মন্দ হল না, প্রায় টাকা তিনেকের মতো দর্শনী পড়ল। এই আমাদের প্রথম দর্শন, জানি না পাণ্ডার তৃপ্তি হল কিনা।

তখন পাণ্ডাজি আমাদের শোনালেন এর উপাখ্যান। এই শিষ্য-গুরুর কীর্তিকলাপ। না শুনে উপায় নেই– দর্শন করা আর উপাখ্যান শোনা দুটোই হওয়া চাই। এ সমস্ত হচ্ছে তীর্থধর্মের অঙ্গ, সবটুকুই শেষ করা প্রয়োজন। নয়তো অঙ্গহানি হবে যে।

একদা এক গুরুদেব তাঁর এক শিষ্যকে সঙ্গে নিয়ে হিংলাজ দর্শন করে ফিরছিলেন। দু-জনার কাছেই দু-পাত্র জল ছিল। কি খেয়াল হল গুরুদেবের, তিনি বার বার শিষ্যের কাছ থেকে তার জলটুকু চেয়ে নিয়ে পান করতে আরম্ভ করলেন। গুরু জল চান- শিষ্য না দিয়ে করেন কি! শেষ পর্যন্ত গুরুদেব শিষ্যের পাত্রের শেষ জলটুকু নিঃশেষে পান করে নিশ্চিন্ত হলেন। শিষ্যের তখন তৃষ্ণায় প্রাণ যায়। গুরুদেব কিন্তু এক ফোঁটা জল তাঁর পাত্র থেকে শিষ্যকে দিলেন না। "হা জল হা জল" করতে করতে শিষ্য বালুর উপরে শুয়ে পড়ল। তাতেও না, অন্তিমকালেও শিষ্যের ঠোঁটে এক ফোঁটা জল ছোঁয়ালেন না গুরুদেব। চোখের উপর তিলে তিলে শিষ্যতে মরতে দেখলেন। যতই তিনি এই দৃশ্য দেখতে লাগলেন ততই তাঁর ভয় বাড়তে লাগল। ভয়-তাঁর নিজের জলটুকুর জন্যে। যদি ফুরোয় তবে তাঁরও শিষ্যের অবস্থা হবে। কিন্তু হল একেবারে সাংঘাতিক কাণ্ড। তাঁর পাত্রটি চৌচির হয়ে ফেটে গেল। সমস্ত জলটুকু পড়ল বালুর বুকে, সঙ্গে সঙ্গে চোঁ চোঁ করে সবটুকু শুষে নিল তপ্ত বালু। এইবার গুরুদেব যাবেন কোথা?। তাঁকেও শুয়ে পড়তে হল শিষ্যের পাশেই।

এই হল গুরু আর শিষ্যের উপাখ্যান। সহজ সরল অনাড়ম্বর এই ইতিহাস শুনে পুনরায় সকলে দক্ষিণা দিলাম। উপাখ্যান শোনার দক্ষিণা আলাদা করে দেওয়াই নিয়ম, নয়ত শ্রবণের ফল মিলবে না। তা যা দেবার দিলাম বটে, সঙ্গে সঙ্গে এইটুকুও বুঝলাম যে, এইবার সত্যসত্যই জলীয় ব্যাপারে একান্ত সাবধান হওয়া উচিত। এই নিষ্ঠুর কেচ্ছা শোনাবার আর যে কোনো উদ্দেশ্যেই থাকুক, এর দ্বারা আমাদের যে শেষবারের মতো সাবধান করে দেওয়া হল এটুকু বুঝতে বাকি রইল না। রূপলাল এই বলে তার বক্তব্য সমাপ্ত করল যে, এইজন্যেই এই যাত্রায় কেউ কাকেও জল দেবে না-এই ভীষণ প্রতিজ্ঞা করে তবে আসতে হয়।

জিজ্ঞাসা করলাম, "সামনের কুয়োর ধারে পৌঁছতে পৌঁছতে আর কত দেরি হবে মনে করো?"

উটওয়ালারা এবং রূপলাল তিনজনেই বললে, "দুই ঘণ্টার মধ্যেই পৌঁছাচ্ছি।"

কিন্তু জয়াশঙ্করের জন্য ঘনঘন থামতে হচ্ছে। এক-একবার আধঘণ্টার জন্য বিরতি। কাজে কাজেই গুরু-শিষ্যের স্থান ছেড়ে প্রায় তিন-ঘণ্টা পরে আমরা কুয়োর ধারে পৌঁছলাম। আকাশের পুবদিকের শেষপ্রান্তে তখন সরু একফালি চাঁদ মিনমিন করে চাইছে। আজ কৃষ্ণা ত্রয়োদশী বা চতুর্দশী হবে।

বিরাট এক তেতুঁলগাছের তলায় আমাদের আস্তানা পড়ল।

যে যেখানে পারলে কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ল। ভৈরবী তাঁর কম্বলখানা কাঁধে ফেলে একটা জুতসই জায়গা খুঁজে বেড়াতে লাগলেন। কোথাও তাঁর পছন্দ হচ্ছে না। তেতুঁলগাছটার গুঁড়ি ঘেঁষে প্রথমে তিনি কম্বল বিছিয়েছিলেন; সেখানে উঁচুনিচু, কাজেই উঠিয়ে নিয়ে গেলেন কম্বলখানা। গিয়ে বসলেন যেখানে থিরুমল আর কুন্তী ছিল তার পাশে। সেখানেও কি অসুবিধা হল। গেলেন উর্বশীর কাছে। ওরা মা মেয়ে মোটঘাট নামিয়ে পাশে বসে পড়ে মুখ নেড়ে জাবর কাটছিল। জাবর কাটা আর ঘুম দু কাজই ওরা এক সঙ্গে সারে। কাজেই গুলমহম্মদ ছেলের সঙ্গে শুয়েছে। উর্বশীকে খানিক আদর করে শেষ পর্যন্ত ভৈরবী এসে দাঁড়ালেন আমার কাছে।

দাঁড়িয়ে কি ভাবতে লাগলেন।

বললাম, "এক কাজ করো, আমার মাথার কাছে কম্বল বিছিয়ে শুয়ে পড়ো। রাত আর বেশি বাকি নেই।"

আমি ঘুমোইনি এ তিনি আশা করেননি। কম্বল বিছিয়ে বসলেন সেখানে, শুলেন না।

বললুম, "শোও না, তবু যতটুকু ঘুম হয়।"

উত্তর দিলেন, "ঘুম কি আর চোখে আছে? খুনখারাপি হয়ে গেল! তিন-তিনটে লোক ম'লো। রক্ত দেখে ঘুম দেশ ছেড়ে পালিয়েছে। চোখ বুজলেই আবার সেই সমস্ত দেখব!

ঘুম আমারও আসছিল না। আসবার কথাও নয়। লোকে সংসারের জ্বালায় অস্থির হয়ে শান্তির মুখ দেখবার আশায় তীর্থযাত্রায় পা বাড়ায়। আমরাও চলেছি হিংলাজ; উদ্দেশ্য ওই

শান্তিলাভ। জানি না শান্তিটা কি বস্তু-তবে আজ এ কটা দিনে যে তার ছায়াও দেখতে পাইনি তাতে আর সন্দেহ নেই। শেষ পর্যন্ত পৌঁছে হিংলাজ দর্শনটা ভাগ্যে ঘটবে কি না কে বলতে পারে!

এই তীর্থের পথ যে বিপথ বা কুপথ এইটুকু জেনেই পথে নামা হয়েছে। সুতরাং পথের কষ্টটা কষ্টই নয়। হিংলাজ দর্শনে ও কষ্টটুকু পুষিয়ে যাবে এ বিশ্বাস আছে এবং সেই কারণে বুকে সাহস বেঁধে এগিয়ে চলেছি। কিন্তু হিসাবের মধ্যে ধরা ছিল না এমনই সমস্ত ব্যাপার আমদানি হচ্ছে যে। আর তাতে ইচ্ছায় হোক বা অনিচ্ছায় হোক আমরাই সবচেয়ে বেশি জড়িয়ে পড়ছি।

এই যে ওরা, কুন্তী আর থিরুমল। একজন তো পাগলই হয়ে গেল। কে বলবে আবার কখনো ও হুঁশ ফিরে পাবে কি না। যদি এইভাবেই থাকে তাহলে উপায়? করাচী ফিরে আমরা তো আমাদের পথ দেখব, তখন ওরা যাবে কোথায়? কুন্তী তো সংকল্প করে রেখেছে যে, আমাদের সঙ্গ ছাড়বে না। ভেবে হাসি পেল-ত্রিভুবনে মাথা গোঁজাবার যাদের ঠাঁই নেই, তাদের কাছেই আশ্রয় পেতে চায় ওরা! যে ডুবছে সে একগাছা খড়কুটো ভেসে যেতে দেখলেও তাই ধরে বাঁচতে চেষ্টা করে।

সে না হয় যা হবার হবে যখন করাচী ফিরে যাব। আপাতত সব চেয়ে বড় কথা ভালোয় ভালোয় হিংলাজ পর্যন্ত পৌঁছনো, তারপর আবার এই ভীষণ পথটুকু ফিরে আসা। এখানে বালুর উপরে মরে পড়ে থাকতে যেমন নিজেরাও চাই না, তেমনি যারা সঙ্গে চলেছে তাদের মধ্যে কেউ এখানে থেকে যাবে এও কল্পনা করা অসহ্য। বিশেষত ওরা দুজন। ওদের ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়াই এখন মস্ত গরজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। পাগল হয়ে থিরুমল ষোল দু-গুণে বত্রিশ আনা মুশকিলে ফেলেছে। এখানে নিজেদের প্রাণ বাঁচাতেই প্রাণান্ত, তার উপর দু-দুটো জীবনের দায়িত্ব বয়ে বেড়ানো। এ কর্ম সহজ নয়, আর এতে শান্তি বলতে বিন্দুমাত্র কিছু নেই। সংসারের জ্বালা আর কাকে বলে!

ভৈরবী বললেন, "কুন্তী বসে আছে। ও হতভাগীর চোখের ঘুম একেবারে ঘুচে গেছে। আজ ক'টা দিন ওকে নিমেষের তরেও চোখের পাতা এক করতে দেখিনি।"

মাথা তুলে দেখলাম কুন্তী বসে আছে গালে হাত দিয়ে থিরুমলের দিকে চেয়ে। থিরুমল তার পাশে নিশ্চিন্ত নিদ্রায় মগ্ন। ওকে খাওয়ানো ঘুমপাড়ানো এমনভাবে করছে কুন্তী যেন ও একটি শিশু। সর্বদা কুন্তীর ভয় পাচ্ছে থিরুমল এমন কিছু করে বসে যাতে আমরা কেউ বিরক্ত হই। আমাদের সকলের কাছে কুন্তীর অবনত, সকলের দয়ার উপর নির্ভর করে চলেছে থিরুমলকে নিয়ে। ওর সর্বদা ভয় আমরা যদি কোনো ছুঁতোয় ওদের ত্যাগ করি।

হায় রে–ও বেচারা জানে না এখানে এই মহা বিপত্তির মাঝে কেউ কাকেও তিলমাত্র সহায়তা করতে পারবে না, যদি সে রকমের কোনো পরিস্থিতির উদ্ভব হয়। এখানে একে অপরের মুখ চাওয়া সম্ভবই নয়, সেটা উভয়ের পক্ষে চরম বিড়ম্বনা হয়ে দাঁড়াবে। এ বড় বিষম ঠাঁই….

কুন্তীকে ডাক দিলাম। উঠে এসে সে ভৈরবীর কাছে বসল। একটু গুছিয়ে নিয়ে আরম্ভ করলাম… দেখো–অত ভেবো না তুমি। অত ভাবনার কি আছে? আগে তো হিংলাজ দর্শন হোক। তারপর মায়ের দয়ায় আমাদের সকলেরই ভালো হবে। থিরুমল সেরে উঠবে। আর তোমরা তো যাচ্ছ আমাদের সঙ্গে কলকাতায়। সেখানে ওকে ভালো করে ডাক্তার দেখাতে পারা যাবে। আমাদের তো আপনার বলতে কেউ কোথাও নেই। তোমার মতো একটা মেয়ে পাওয়া গেল এ আমাদের ভাগ্য বলতে হবে। আমরা যখন মরব তখন অন্তত মুখে জল দেবার জন্যে তুমি আমাদের কাছে থাকবে। এটাও মায়ের দয়া।

আরও হয়তো খানিক লম্বা করে বক্তৃতাটা চালিয়ে যেতাম। কিন্তু কথা আর যোগাল না। ভৈরবীর কোলে মুখ গুঁজড়ে কুন্তী কান্নায় ভেঙে পড়ল। বেশ বুঝলাম, ওই দুটি নারী একে অন্যকে যে ভাবে বোঝে, তার সামান্য মাত্রও আমি বুঝি না। সর্বস্ব খুইয়ে কি আশায় কুন্তি থিরুমলকে সম্বল করে পথে নেমেছে তা পুরুষ হয়ে আমি কি জানব! ভৈরবী আমাকে আর

না বকে ঘুমোতে বললেন। তাই করলাম। পাশ ফিরে শুলাম। ওরা বসে রইল।

একদিন সন্ধ্যার কিছু আগে বৌবাজারের এক গির্জার সামনে দাঁড়িয়ে এক বক্তৃতা শুনেছিলাম। একটা উঁচু টুলের উপর দাঁড়িয়ে বক্তা ঈশ্বরের সর্বশক্তিমত্তা প্রমাণ করছিলেন শ্রোতাদের কাছে। তিনি বলছিলেন, "ঈশ্বর বললেন, অন্ধকার হইতে আলোক হউক।" সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বরের সেই আদেশ পালনার্থে আলো হল।

চোখ বুজে শুয়ে শুয়ে ভাবছিলাম —সেই সর্বশক্তিমান ঈশ্বর যদি দয়া করে আমাদের কাছে উপস্থিত হয়ে একটা উল্টো হুকুম জারি করতেন–"আলো না হইয়া আরো কিছুক্ষণ অন্ধকার থাকুক", তাহলে অন্য কোথাও কারও কোনো অসুবিধা হত কিনা বলতে পারি না, তবে আমাদের এই যাত্রীদলটির বিশেষ উপকারই হত।

অনাবৃত আকাশের তলায় পড়ে ঘুমোতে বিশেষ কিছু অসুবিধা হয় না যদি সময়টা রাত্রিকাল হয়। কারণ রাত্রির আঁধারই তখন আচ্ছাদনের কাজ করে। দিনের বেলায় ঘর বাড়ি চালা গুহা এর যা হোক একটা কিছুর তলায় ঢুকে দিনের আলোটা একটু ঠেকাতে পারলে ঘুমোবার কিছু সম্ভাবনা তবু থাকে।

কিন্তু করা যাবে কি? চোখের পাতা বন্ধ করে চাদর চাপা দিয়ে শুয়ে রইলাম। ওধারে যথাকালে সূর্যদেব দেখা দিলেন এবং এগিয়েও আসতে লাগলেন।

রূপলাল এসে ডেকে ওঠাল।

"একটু দাওয়াই দিন।"

"কিসের দাওয়াই? কার আবার কি হল?"

ধরেছে যে একজনকে! দেখছেন না পাণ্ডে বাবা বার বার লোটা হাতে ছুটছে!" ধড়মড় করে উঠে বসলাম-কি হয়েছে? বাড়াবাড়ি নাকি? চলো দেখে আসি আগে।"

"দেখবেন কি ছাই-ও আর পৌঁছিবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত এইভাবে চলে। এই মুল্লুকে একবার ধরলে আর ছাড়ে না। বলেছিলাম তো- দু-একজন কমবেই আমাদের মধ্যে। এবার দেখুন না কি দাঁড়ায়।"

বললুম, "দাওয়াই দেব না দেখে? আগে দেখি গিয়ে রোগটা কি, তারপর তো দাওয়াই!" রূপলাল বললে, "তবেই হয়েছে। আপনার দেওয়া দাওয়াই জানতে পারলে ও খাবে নাকি? আপনার হাতের দাওয়াই খেলে যদি জাত যায়! তারচেয়ে যা দেবেন, আমার হাতে দিন। আমি পাণ্ডা মানুষ, আমার জাত সহজে যায় না। আপনার সমস্ত দাওয়াই তো ওই সাদা গুঁড়ো। খানিকটা নিয়ে গিয়ে খাইয়ে দিই। বলব, এ হচ্ছে হিংলাজের প্রসাদী-খেলে সব অসুখ সারে। বিশ্বাস করে খাবে, আর যদি পরমায়ুর জোর থাকে বেঁচে যাবে।"

বায়োকেমিক ওষুধের গোটাকতক শিশি ছিল আমাদের সঙ্গে রূপলাল তা জানত। এই সরলপ্রাণ ছোকরা যা হোক একটা কিছু করে দেখতে চায় যদি লোকটাকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায়। আর তর্কাতর্কি না করে উঠে গেলাম। আমাদের পোঁটলা পুঁটলির ভিতর থেকে ওষুধের শিশি কটা খুঁজে বার করে পেটের অসুখের ওষুধ একটু দিয়ে দিলাম। খুশি মনে রূপলাল খাওয়াতে চলে গেল।

আর শুয়ে থাকা হল না। কুয়োর ধারে গেলাম–জল চাই, মুখে চোখে দিতে হবে। হা হতোস্মি-এরই নাম কুয়া। বালুর মাঝে কোমর পর্যন্ত নিচু একটা গর্তের জলায় আধ হাত জল। সেই জলে না ভাসছে হেন দ্রব্য নেই, উটের বিষ্ঠা পর্যন্ত তার উপর, আর কি মুশকিল সেই জল তোলা। কিনারায় গিয়ে দাঁড়ালে পাড়ের বালি ধসে যাবে, দড়ি-বাঁধা বালতি বা লোটা ছুঁড়ে ফেললে বালি উঠে আসবে-এখন উপায়? দাঁড়িয়ে ভাবছি, পিছন থেকে কে বললে-"হুজুরের জলের প্রয়োজন নাকি?"

চমকে উঠে পিছনে ফিরে দেখি-হাঁ, দেখবার মতো চেহারাই বটে। সাদা, একেবারে আপাদমস্তক সমস্ত এত সাদা, যেন ধপধপে তুলোয় তৈরি একটি মূর্তি।

মাথায় একমাথা সাদা চুল, বুক ছাড়িয়ে কোমর পর্যন্ত পৌঁছেছে সাদা দাড়ি। আর সে কি অল্প স্বল্প চুল দাড়ি! গোটা দশেক লোকের মাথায় মুখে ভাগ করিয়ে বসিয়ে দিলেও যথেষ্ট

বাকি থেকে যাবে। সেই চুলদাড়ির মাঝখানে সামান্য যে স্থানটুকুতে কপাল চোখ দুটি আর নাকটি রয়েছে তাও সাদা। তবে চুলদাড়ির মতো অত সাদা নয়, সামান্য একটু লালচে আভা আছে। বিশেষ লক্ষ্য করলে দেখা যাবে চোখের তারা দুটি যেন বহুদূর থেকে অন্তর্ভেদী দৃষ্টি ফেলে দুনিয়ার সব কিছু এফোঁড়-ওফোঁড় দেখে নিচ্ছে।

মাথায় পাগড়ি নেই। জামা জোব্বা উট-ওয়ালাদের মতোই। তবে নিখুঁত পরিষ্কার। হাত দুটি পিছনে করে সেই অপরূপ মূর্তি সামান্য সামনে ঝুঁকে পুনরায় সবিনয়ে জিজ্ঞাসা করল-"হুজুরের বোধ হয় জলের প্রয়োজন?"

হতভম্ব হয়ে তার আপাদমস্তক দেখছিলাম। দ্বিতীয়বার প্রশ্ন করায় সংবিৎ ফিরে পেয়ে বললাম-"কিন্তু তুলব কি করে?"

সেই মূর্তি হাসল। হাসল মানে সাদা গোঁফদাড়ির ভিতর থেকে কয়েকটি সাদা দাঁত একবার বেরিয়েই আবার লুকাল।

"আসুন আমার সঙ্গে, জল তোলা আছে।"

চললাম। কুয়োর ধার থেকে উঠে পূর্বদিকের বালুর টিলাটার উপরে তাঁর পিছন পিছন উঠে দেখি, একটু দূরেই রাশীকৃত শুকনো কাঁটার ডালপালা স্তূপাকার করা রয়েছে।

"ওই গরিবের আস্তানা। হুজুর যদি দয়া করে একটু কষ্ট করেন, ওখানেই জল তোলা আছে"-বলে তিনি অগ্রসর হলেন।

তাঁকে অনুসরণ করে নামলাম গিয়ে সেই শুকনো কাঁটার ডালপালার পাহাড়ের কাছে।

হাঁ, ঘরই বটে।

গুহাবাসী মানব কবে কোন যুগে গুহার মায়া পরিত্যাগ করে নিজের হাতে নিজের বাসস্থান বানাতে শুরু করে। সেই থেকে আজ পর্যন্ত মানুষের মাথায় হাজার রকমের ফন্দি-ফিকির গজিয়েছে, ফলে কোথাও দু-শ তলা কংক্রিটের বাড়ি আকাশ ছুঁতে চলেছে, কোথাও বা গাছের ডালে মাচা বেঁধে লতাপাতা দিয়ে নীড় রচনা করে লোকে মনের সুখে সংসারধর্ম করছে। আবার এমন জায়গাও আছে যেখানে বরফের চাঁই এর উপর চাঁই সাজিয়ে বাসস্থান বানিয়ে মানবসন্তান তার মধ্যে ঢুকে আরাম করে কাঁচা সিলমাছ চিবুচ্ছে।

কিন্তু এই যে বাড়ি চোখের সামনে দেখছি এ একেবারে অবাক কাণ্ড, অভিনব ব্যবস্থা। বলা উচিত, গৃহনির্মাণ পরিকল্পনার অচিন্তনীয় আবাসন।

লম্বা লম্বা শুকনো কাঁটার ডাল রাশি রাশি জুটিয়ে এনে সেই ডালপালা বেশ করে গুছিয়ে উপরি উপরি সাজিয়ে দেওয়াল বানানো হয়েছে। চারিদিকের দেওয়ালের মাথা ঘরের ভিতর দিকে ক্রমে ঝুঁকিয়ে নিয়ে এসে পরস্পরের সঙ্গে ঠেকিয়ে উপরের হাতের কাজ সারা হয়েছে। তার ফলে উপরটায় মঠ-মন্দিরের ঢঙ এসে গেছে। যেন আমাদের বক্রেশ্বরের কোনো পুরোনো মন্দির।

তবে কাঁটা—আপাদমস্তক বিলকুল এর কাঁটায় তৈরি। একেবারে নিখুঁত কণ্টকগৃহ, কোনো ভেজাল নেই।

ভিতরে প্রবেশ করবার জন্যে পূর্বদিকে একটি গোলমতো দরজা রয়েছে। দরজার সামনেই গোটাকতেক মোরগ মুরগি কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। উঁকি মেরে ভিতরটা একবার দেখতে বড়ই লোভ হল।

কিন্তু তার পূর্বেই একটি মহিলা হৃষ্টপুষ্ট ছেলে কোলে নিয়ে বেরিয়ে এলেন সেই কাঁটার দূর্গ থেকে। পরনে তাঁর ছিটকাপড়ের সালোয়ার, সাদা কাপড়ের পাঞ্জাবি এবং তার উপর একখানি ছাতার কাপড় দিয়ে মুখ মাথা বুক আবৃত

আমাকে যিনি সঙ্গে করে নিয়ে এলেন, তিনি কি বললেন মহিলাকে নিজের ভাষায়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি তাঁর কণ্টকের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন এবং পরমুহূর্তেই বেরিয়ে এলেন একটি ছোট মুণ্ডুহীন ছাগল হাতে ঝুলিয়ে নিয়ে। সেটি আমার সামনে নামিয়ে দিয়ে ছেলে কোলে নিয়ে পুনরায় তাঁর সেই গৃহের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালেন।

"মেহেরবানি করে এই জল নিয়ে যান। আশা করি এতেই আপনার গোসল হয়ে যাবে।

লোকজন সকলে উঠলে জল তোলার বন্দোবস্ত হবে।”

তাঁর কথায় হুঁশ ফিরে এল। এতক্ষণ থ হয়ে দাঁড়িয়ে হাবা-গঙ্গারামের মতো হাঁ করে সব দেখছিলাম। দেখছিলাম একসঙ্গে অনেক কিছুই। এঁদের ঘর-গৃহস্থালি, ওই টকটকে লাল বেখাপ্পা জামা গায়ে দেওয়া ওই সুন্দর শিশুটিকে আর যাঁর কোলে ওই শিশু রয়েছে তাঁকে। স্বাস্থ্য এবং শ্রী, ঠিক এই পরিবারের সঙ্গে মানানসই শ্রী আর তদুপযুক্ত সাজ-পোশাক, এর একটির সঙ্গে আর একটির কি আশ্চর্যজনক মিল, কোথাও ছন্দপতন হয়নি।

মুখ তাঁর দেখাই গেল না। ছাতার কাপড়ে নাক থেকে গলা বুক সমস্ত ঢাকা। দেখা গেল দুটি চোখ এবং ভ্রূর উপর সামান্য একটু কপাল। আশ্চর্য রং, দুধে আলতায় গোলা বললে অত্যুক্তি হয় না। সেই আশ্চর্য চোখ দুটি যেন টলটল করে ভাসছে। এক লহমার জন্যে সেই চক্ষু দুটি আমার উপরে পড়েছিল। অদ্ভুত, সত্যই অদ্ভুত সে দৃষ্টি। বুঝলাম মরুভূমিরও প্রাণ আছে। সে দৃষ্টিতে মরুভূমির প্রাণের পরশ ছিল। আমার দেহের মধ্যে তড়িৎ খেলে গেল।

তাড়াতাড়ি নিচু হয়ে জলের থলিটা তুলে নিয়ে অন্যদিকে চলে গেলাম।

সেই জলে মুখ ধোয়া থেকে সকল প্রয়োজনই মিটল। মাথা গা হাত সমস্ত মুছে নিলাম। রাত জেগে হাঁটার ক্লান্তি ও জড়তা দূর হল। তখনও সকালের ঠান্ডা হাওয়াটুকু বইছে, ধীরে-সুস্থে সকল কর্ম সমাধা করে ফিরে এলাম আড্ডায় সেই তেতুঁলগাছের তলায়।

তখন টানাটানি করে সকলে বয়ে নিয়ে চলেছে হাত-বিশেক লম্বা একখানা কাঠ। এখানা এতক্ষণ বালির নীচে চাপা পড়ে ছিল। কাঠখানা কুয়োর উপর আড়াআড়িভাবে ফেলে তার উপর দাঁড়িয়ে জল তোলা হবে।

গুলমহম্মদ আমাকে প্রভাতের সেলাম-আলেকুম জানিয়ে তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিল। সেই তুলোয় তৈরি মূর্তিটির নাম শেখ বসিরুদ্দিন, এখানকার কূপওয়ালা।

শেখ সাহেব সামান্য অবনত হয়ে এই আর্জি পেশ করলেন যে তাঁর স্ত্রীও এসেছেন আওরতদের সঙ্গে নিয়ে যেতে। এখানে খোলা জায়গায় ওঁদের তকলিফ আরও বেশি হবে। যদি আমার আপত্তি না থাকে তবে ভৈরবী আর কুন্তী তাঁর গরিবখানায় গিয়ে গোসল-আদি করে সুস্থ হয়ে সেখানেই বিশ্রাম করুন।

পিছন ফিরে দেখি সেই খোকার মা ভৈরবীর সঙ্গে আলাপ করছেন।

গুলমহম্মদের দিকে চাইলাম। সে বললে, “মাইজি ওখানেই যান। অনেক সুবিধা হবে।”

ভৈরবীকে বললাম, “ওর সঙ্গে যেতে পারো, ওই টিলার ওপরেই ওঁদের ঘরবাড়ি। তবে একটু সাবধান, কাঁটা ফুটে না মরো।”

গেলেন ভৈরবী শ্রীমতী বসিরুদ্দিনের পিছু পিছু আর সুখলাল গেল তাঁদের ঝোলা বয়ে নিয়ে। কুন্তী যেতে পারলে না, থিরুমল তখনও ঘুমোচ্ছে; সে উঠলে তাকে নাওয়ানো-খাওয়ানো করবে কে! কুন্তী মুহূর্তের জন্যে থিরুমলকে চোখের আড়াল করে না, আবার যদি কোনো দিকে লাগায় দৌড়-বিশ্বাস কি!

যথারীতি আরম্ভ হল সেদিনের ঘরকন্না করার ধুম। ধুমই বটে। কিছুক্ষণ পরে সারা গাছতলাটা ধোঁয়ায় ছেয়ে গেল। বিশটা চুলো ধরিয়ে বিশ জায়গায় রুটি পোড়ানো আরম্ভ হল।

আমাদের রান্নার জিনিসপত্র চলে যেতে লাগল শেখ বসিরুদ্দিনের আস্তানায়। ওখানে সুবিধামতো স্থান পেয়ে ভৈরবী রান্নার যোগাড় করছেন। তাঁর সুযোগ্য সহকারী শ্রীমান সুখলাল আসা-যাওয়া করছে, জিনিসপত্র বইছে– মহা ব্যস্ত।

এই ফাঁকে রূপলালকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম পাণ্ডে মহারাজের সংবাদটা। শুনলাম তিনি নিদ্রামগ্ন। রূপলালের তো খুবই আশা যে আমার ওষুধ কাজ করছে।

বসিরুদ্দিনের সঙ্গে তাঁদের দেশ-মুল্লুকের গল্প জুড়ে দিলাম। তিনি বললেন-সরকার থেকে তিনি এই কুয়োর ইজারা নিয়েছেন। জমা তাঁকে কিছুই দিতে হয়নি। তাঁর কাজ হচ্ছে কুয়ো পরিষ্কার রাখা এবং চারিদিকের হালচাল সম্বন্ধে মাঝে মাঝে সরকারকে ওয়াকিবহাল করা। অন্তত পঞ্চাশ-ষাটটি পরিবার এই কুয়োর উপর নির্ভর করে বেঁচে আছে। তারা ছাগল

উট নিয়ে কাঁটার ঘর বানিয়ে এই কুয়োর চারিদিকে দশ-বিশ ক্রোশের মধ্যে বাস করছে। যেখানে ছাগল উটের পেট ভাবার মতো গাছপালা পায় সেখানেই ঘর তোলে, আবার গাছপালা ফুরোলে অন্যত্র চলে যায়। কিন্তু এই কুয়ো থেকে বেশি দূরে যায় না।

জিজ্ঞাসা করলাম, “এর পরের কুয়োটা কত দূর?”

শেখ সাহেব মাইল ক্রোশ এ সমস্তের ধার ধারেন না। বললেন, “উটের দশ-বারো ঘণ্টা লাগবে।” এ মুল্লুকে উটের চলার মাপই দূরত্বের পরিমাণ নির্দেশ করে, যেমন ইঞ্জিন মোটর ইত্যাদির শক্তি বোঝাতে ‘এতগুলো অশ্ব-শক্তির সমান’ বলা হয়।

আর একটি কথা জিজ্ঞাসা করা যায় কিনা ভাবছিলাম। হঠাৎ কথায় কথায় সুযোগ এসে গেল। আমার মনের মধ্যে খচ্‌খচ্‌ করছিল একটি প্রশ্ন, সেটি হল, এই বৃদ্ধ বয়সে তাঁর ওই ভার্য্যা লাভ কি করে সম্ভব হল।

শেখ সাহেব বলছিলেন তাঁদের দেশের দুঃখ-দারিদ্র্যের কথা। তাঁর সংসার চলা মুশকিল, সম্বলের মধ্যে একপাল বকরি আর মুরগিগুলো। হিংলাজযাত্রী বছরে আর ক’বার আসে! কিছু কিছু যা আমদানি হয় ওই পঞ্চাশ-ষাটটি গৃহস্থের কাছে, যারা তাঁর কুয়োর জল খায়। তাদেরও অবস্থা তো সমান শোচনীয়। বিয়ে-সাদী করে ছেলেপিলে হওয়ায় আজকাল তাঁর কষ্টের অবধি নেই।

বললাম, “কিছু যদি মনে না করেন তবে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। আপনাদের দেশে দেখছি একটু বেশি বয়সেই বিবাহটা করে। মানে, আপনার বয়স এখন কত হবে?”

এবার হো হো করে প্রাণখোলা হাসি হেসে উঠলেন তিনি। বললেন, “হুজুরের কি ধারণা আমার বিবির বয়স আমার থেকে ঢের কম? সকলেই তাই মনে করে বটে। হুজুর আমার বয়স পয়তাল্লিশ, আমার বিবির বয়স চল্লিশ পার হয়ে গেছে। আমার সঙ্গে ওর সাদী হয়েছে এই বছর পাঁচেক। এর আগে যিনি ওর স্বামী ছিলেন তিনি বেহেস্তে চলে গেছেন-আল্লা তাঁর আত্মার কল্যাণ করুন। আমার বিবির বিশ বছরের এক মেয়েই আছে। তারও ছেলেপিলে হয়েছে। আমার সঙ্গে সাদী হবার পর এই প্রথম ছেলে হল।”

একেবারে চুপ করে বসে থাকতে হল। ওই ভদ্রমহিলার বয়স চল্লিশ পার হয়ে গিয়েছে এবং তারপরেও ওঁর ওই অপরূপ সৌন্দর্য স্বাস্থ্য শ্রী বজায় রয়েছে, এ কি সহজে বিশ্বাস হয়! আর তা বিশ্বাস করতে গেলে আমার দেশের কুড়িতেই বুড়ি গৃহলক্ষ্মীদের ডাক দিয়ে বলতে ইচ্ছে করে যে, তাঁদের উচিত এই মরুভূমির মাঝে চলে এসে এখানেই ঘর সংসার পাতা। আমার সুজলা সুফলা বঙ্গমাতার বুকভরা মধু বঙ্গবধূদের গাল-তোবড়ানো কোলকুঁজো হতশ্রী চেহারার ছবি চোখের উপর ভেসে উঠল। চলে আসুন তাঁরা এখানে, পুঁইশাক আর সজিনা ডাঁটা হয়তো মিলবে না, কিন্তু অম্বল আর সূতিকার সাক্ষাৎও যে পাওয়া যাবে না, এ আমি বুক ঠুকে বলতে পারি।

একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললাম, “তা বহুত খুশি কি বাত। খোদা আপনার আর আপনার বিবির শরীর ভালো রাখুন। তবে আপনার চুলদাড়িটা একটু আগে আগেই ভয়ানক রকমের পেকে গিয়েছে।

এবার শেখ সাহেব মুচকি হেসে উত্তর দিলেন, “আজ্ঞে, মোটেই পাকেনি আমার চুলদাড়ি। চুলদাড়ির সাদা রং আমাদের বংশের বিশেষ গুণ বলতে পারেন। জন্মাবার সময়ই আমার সাদা চুল নিয়ে জন্মাই আর দাড়ি গজাবার সময়ই সাদা হয়ে গজায়। আমার বাচ্চার মাথাতেও সাদা চুল বেরিয়েছে, বোধ হয় অতটা লক্ষ করেননি। এই চুল-দাড়ির জন্যেই আমরা এ মুল্লুকে বিখ্যাত।”

একেবারে তাজ্জব বনে গেলাম।

এখন আমাকে যেতে হবে তপ্ত বালু ভেঙে পেটে কিছু দিতে। খাওয়া মাথায় থাকুক। কুন্তী থিরুমলকে নিয়ে চলেছে খাওয়াতে। তাকেই অনুরোধ করলাম, “যখন থিরুমলকে নিয়ে ফিরবে তখন এনো হাতে করে আমার খাবারটা। এই তপ্ত বালুর উপর দিয়ে আমি আর যাচ্ছি না, তোমরা খেয়ে নাও গিয়ে।

শেখ বসিরুদ্দিন আমার বিশ্রামের আয়োজন করলেন। চার খণ্ড গাছের ডাল জুটিয়ে এনে সেগুলো পুঁতে খাঁটিয়ার পায়া চারটে সেই ডাল চারটের মাথায় বেঁধে দিলেন। একখানা গালিচা এনে বিছিয়ে দিলেন খাঁটিয়ার উপর। ব্যাস, খাঁটিয়ার নীচে চমৎকার ঘর হয়ে গেল। উপর থেকে কাপড় কম্বল ঝুলিয়ে দিয়ে চারদিক বন্ধ করা হল।

একটানা ঘণ্টা দুয়েক ঘুমিয়ে উঠলাম। উঠে দেখি বাঁধা-ছাঁদা সমস্ত শেষ হয়ে গেছে। সুখলাল প্রস্তুত এক গেলাস গরম চা হাতে নিয়ে। ভৈরবীও উপস্থিত, ছেলে কোলে করে তিনিও। কিছু আখরোট মিছরি বাদাম তাঁর খোকার জন্যে আলাদা করে রাখা হয়েছে। আমার চা খাওয়া আর উর্বশীর পিঠে খাঁটিয়া বাঁধা হলেই যাত্রা শুরু হবে!

ভৈরবী উঠলেন উটের উপর। "জয় হিংলাজ' ধ্বনির সঙ্গে ছড়ি উঠল রূপলালের কাঁধে।

শেখ বসিরুদ্দিন আমার দু হাত চেপে ধরলেন। একটু দূরে তাঁর স্ত্রী দাঁড়িয়ে রইলেন ভৈরবীর দিকে চেয়ে।

৩

উট চলল।

আজ অমাবস্যা। সন্ধ্যার পরেই আরম্ভ হল ঘোরতর নিশা। অন্য দিনের মতো ধীর-সুস্থে রয়ে-জিরিয়ে রাত্রি এল না। সন্ধ্যার পিছনেই রাত্রি দাঁড়িয়ে ছিল। সন্ধ্যা ত্রস্ত লঘু পদক্ষেপে পার হয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে মিশকালো চাদরে আপাদমস্তক আবৃত করে রাত্রি দু হাত মেলে সামনে এসে দাঁড়াল। পায়ের নীচে বালু মাথার উপর আকাশ, মাঝখানের সমস্ত ফাঁকটি জুড়ে এক নিরেট নিশ্চিদ্র স্তব্ধতা থম্‌থম্‌ করতে লাগল।

অন্য দিন অসংখ্য প্রদীপ হাতে রাত্রির অনুচারীরা তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে আসে, আজ তারা কোথায় লুকাল কে জানে। বোধ হয় আজ আর রাত্রিতে পথ দেখাবার প্রয়োজন নেই বলেই তারা অনুপস্থিত। রাত্রি আজ চলছেও না, সামনেও এগুচ্ছে না। শুধু মুড়িসুড়ি দিয়ে চুপ করে বসে আছে, আর আমরা কটি প্রাণী উট দুটিকে নিয়ে সেই রূপহীন বর্ণহীন আঁধার সমুদ্রে সাঁতার দিতে লাগলাম।

রাত্রির একটি নিজস্ব ভাষা আছে। তবে তা শোনবার মতো কান থাকা চাই। না-শুধু কান থাকলেই হবে না শোন, সে ভাষা শোনার জন্যে যেতে হবে সেই সমস্ত স্থানে যেখানে রাত্রি কথা বলে। সর্বত্র তো রাত্রি কথা বলে না, আর যদিও বলে অন্য গোলমালে শুনতে পাওয়া যায় না সে কথা, খুবই চুপিচুপি বলে কিনা।

রাত্রির সেই মরমের ভাষা যদি শুনতে চাও, চলে যাও একখানা টাপুরে নৌকোয় চেপে মেঘনায় ভেসে ভেসে ভৈরবের পুল ছাড়িয়ে আরও নীচের দিকে। আপন ইচ্ছায় নৌকো ভেসে যাক–চুপ করে বসে থাকো চোখ বুজে। অনেক পরে শুনতে পাবে রাত্রি কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিসিয়ে তোমায় শোনাচ্ছে তার গোপন কথা। কত বিচিত্র সে কাহিনী, তাতে কত ব্যথা, কত আনন্দ, কত রোমাঞ্চ, কত প্রহেলিকা। শুনতে শুনতে মনের জ্বালা জুড়িয়ে যাবে-কখন ঘুমিয়ে পড়বে জানতেও পারবে না।

কিংবা আর এ কাজ করতে পারো। মাঘ মাস-আকাশে চাঁদ নেই, বেশ কুয়াশা করেছে। এমনি এক রাতে মনে হচ্ছে যেন নিজেকে নিজে ধরতে পারছ, ছুঁতে পারছ। একখানা কম্বল জড়িয়ে নিরিবিলি বেরিয়ে পড়ো নিজেকে নিয়ে। উদ্ধারণপুরের বড় শ্মশানের সামনে এসে বড় সড়কটার এধার ওধার একবার দেখে নাও। কেউ কোথাও আছে কিনা। এমন সময় সেখানে কারও থাকবার কথা নয়। হয়তো দেখা যাবে ওই ওধারে বড় পাকুড় গাছটার ডালে কাপড়-জড়ানো মড়া টাঙিয়ে রেখে গাছের গোড়ায় কয়েকটা ইট দিয়ে চুলো বানিয়ে রান্না চাপিয়েছে। দু একটা বোতলও দেখা যাবে দূর থেকে আগুনের আলোয় চকচক করতে। থাকুক ওরা ওধারে। আজ রাতে ওরা আর শ্মশানে ঢুকছে না। ওরা আসছে হয়তো পাঁচ সাত ক্রোশ দূর থেকে মড়া নিয়ে, সকালে শ্মশানে ঢুকে দাহকর্ম শেষ করে বাড়ি ফিরবে। ওরা জানতেও পারবে না, তুমি নিশ্চিন্তে ঢুকে পড়ো শ্মশানের মধ্যে। সাবধানে পা ফেলে নেমে যাও গঙ্গার কিনারায়।

ডান পাশে যে শেয়ালগুলো মড়া খাচ্ছিল তারা হয়তো খানিক খেঁকা খেঁকি করে উঠবে– কখনো কাছে আসবে না। হামদা কুকুরগুলো হয়তো চেঁচাতে চেঁচাতে পিছু পিছু আসবে। তাদের লাল চোখগুলো অন্ধকারের মধ্যে জ্বলছে দেখা যাবে। কিছুক্ষণ পরে তারা ফিরবে নিজের নিজের কাজে। পাড়ের তালগাছ-কটায় যে শকুনগুলো ঘুমোচ্ছে তাদের মধ্যে হয়তো একটা নাকী সুরে কেঁদে উঠবে। তারপর আবার সমস্ত গোলমাল থিতিয়ে যাবে, আর কোনো অশান্তি নেই। তখন গঙ্গার কিনারায় একটু খুঁজলেই এক-আধখানা চেটাই বা মাদুর মিলবেই। সেখানা জলের ধার ঘেঁষে বিছিয়ে বেশ আরাম করে বসো। আর গঙ্গার দিকে চেয়ে থাকো। কিছু ভেবো না, কোনো চিন্তার প্রয়োজনই নেই। একটু পরেই চুপি চুপি পা টিপে টিপে আসবে রাত্রি। এসে ঠিক তোমার পাশটিতে বসে ঘনিষ্ঠ আলাপ জুড়ে দেবে। এই জন্ম-মৃত্যুর কথা, আসা-যাওয়ার কাহিনী। সে সব কত না-জানা রহস্য। শুনতে শুনতে

তোমার চোখের ঘুম যাবে পালিয়ে। তখন নিজেই নিজেকে হারিয়ে ফেলবে সেই সব না-জানা ব্যাপারগুলোর মধ্যে।

আর যদি সত্যিই জানতে চাও রাত্রির নিজের মনের কথা, তবে যেতে হবে অন্য এক জায়গায়। লামডিং-বদরপুর লাইনে হাফলং হিল নামে একটা স্টেশন আছে। ওখানে নেমে পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ যেদিকে ইচ্ছা চলে যাও পায়ে চলা পাহাড়ে পথ ধরে। পাহাড়ে বাঁশের তলা দিয়ে পথ গেছে এঁকে বেঁকে, একবার ওপরে উঠে একবার নীচে নেমে। চলতে থাকো যতক্ষণ আকাশে আলো থাকে। চলছ তো চলছই। মাঝে মাঝে ওই দূরে পাহাড়ের গায়ে দু-একখানা ঘর দেখা যাবে, দেখা যাবে সেই সব ঘর থেকে ধোয়া বেরুতে তারপর এক সময় এমন এক জায়গায় গিয়ে পৌঁছবে যখন আর এগুবার উপায় থাকবে না। পায়ে চলা পথটা শেষ হয়েছে, সামনেই এক পাতাল প্রমাণ খাদ।

খাদের ওপারেই আর একটি পাহাড়, আকাশে তাঁর মাথা ঠেকেছে। তাঁর সারা শরীরে সে কি বিপুল সাজপোশাক, আর তার কত বিচিত্র বর্ণ। তার মুখ দেখতে পাবে না, মাথা পিছনের দিকে হেলিয়ে মুখ তুলে দেখতে গেলে নিজেরই ঘাড়ে ব্যথা লাগবে তবু দেখা যাবে না তাঁর মুখ। তিনি হয়তো তোমার স্পর্ধা দেখে তখন মুখ টিপে হাসছেন। তা তিনি যা ইচ্ছা করুন খাদের ওপারে দাঁড়িয়ে, ওইখানে একখানা জুতসই পাথর দেখে নিয়ে আরাম করে বসো!

সামনে অনেক নীচে খাদের ভিতর দিয়ে নানা জাতের শব্দ করে ছুটে চলেছে এক নদী, তাকেও যাবে না দেখা। শুনতে পাওয়া যাবে সেই ঝগড়াটে মেয়ের অনর্গল বকবকানি। থাকুক বকতে, কিছুক্ষণ পরে ওটা সহ্য হয়ে যাবে। সন্ধ্যা এগিয়ে আসবে পা টিপে টিপে পাতলা ওড়নাখানি গায়ে জড়িয়ে।

তোমায় এ হেন স্থানে একলা বসে থাকতে দেখে থমকে দাঁড়াবে। বিস্ময়ব্যাকুল চোখ দুটি তুলে ঘোমটার আড়াল থেকে অনেকক্ষণ চেয়ে থাকবে তোমার দিকে-নির্বাক নিস্তব্ধ। তারপর লজ্জায় শরমে লাল হয়ে ধীরে ধীরে চলে যাবে পাহাড়ের আড়ালে।

আর্বিভূতা হবে রাত্রি অনুচরীদের সঙ্গে নিয়ে। প্রদীপ হাতে তারা পথ দেখিয়ে নিয়ে আসবে তাকে।

চুপ করে বসে চেয়ে দেখো চারিদিকে কি ঘটছে। জীবন এতক্ষণ দিনের আলোয় ঘুমিয়ে ছিল, রাত্রির চরণস্পর্শে জেগে উঠল। সবই সজীব, সবই প্রাণচঞ্চল।

কাছাকাছি আসবে রাত্রি, শেষে তোমার পাশটিতে এসে বসে পড়বে নিবিড় হয়ে, তার কালো শাড়ির আঁচল দিয়ে তোমাকে ঢেকে নিয়ে। তখন তাঁর কাঁধে মাথা রেখে শোনো তার মনের কথা, তার অন্তরের বেদনার কাহিনী। তার কেশের নানারকম বনফুলের সুবাসে তোমার নিশ্বাস পূর্ণ হয়ে যাবে, বুক ভরে উঠবে। একান্ত করে রাত্রিকে পেয়ে নিজেকে ধন্য মনে হবে। তার মনের কথায় তোমার মন কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে উঠবে।

আকাশে যখন চাঁদ থাকে তখন রাত্রি কথা কয় না। কইলেও সে বড় গোলমেলে সব আলাপ। সে প্রগলভতা, সে ছলছলানি না শোনাই ভালো। মাথা খারাপ করে দেয়।

কিন্তু সেদিন সেই ঘোর অমাবস্যায় মরুসমুদ্রের মাঝে আলকাতরার মতো ঘন আঁধারে ভাসতে ভাসতে ডুবতে ডুবতে রাত্রির অন্য জাতের আলাপ মর্মে গিয়ে বিঁধল। রাত্রি কাঁদছে, গুমরে গুমরে কাঁদছে। সে কান্নার কোনো মানে নেই, কোনো ভাষা নেই। সে শুধু অন্তহীন হতাশার চরম ব্যাকুলতা ভিন্ন আর কিছু নয়।

সমস্ত দলটি ঘনিষ্ঠ হয়ে উঠেছে। সকলের গায়ের সঙ্গে গা ঠেকছে। উটের উপর থেকে ভৈরবী বললেন, “আমি নেমে হেঁটে যাব। এখানে ভালো লাগছে না।”

দিলমহম্মদ উর্বশীর গলার নীচে, আমি ডানপাশে। অন্য সকলে উটটাকে ঘিরে চলেছে। মাত্র হাত দুই তিন উপরে ভৈরবী, তবু তাঁর একলা একলা মনে হচ্ছে।

থিরুমলের এক হাত কুন্তী, এক হাত পোপটলাল ধরে নিয়ে চলেছেন। মাঝে মাঝে কুন্তী হুমড়ি খেয়ে এসে আমার উপর পড়ছে, ঠিক আমার পেছনেই সে আছে কি না। সুখলালের

হাত ধরে আছি আমি এবং ধরে আছি কিনা এ সংবাদটি মাঝে মাঝে ভৈরবী নিচ্ছেন। ছোট ছেলে সুখলাল, তার মা ছেলেকে এই প্রথম এই পথে বেরুতে দিয়েছেন এবং চুপি চুপি কয়েকটি কথা ভৈরবীকে বলেও দিয়েছেন।

সামনের বড় উটের গলার নীচে গুলমহম্মদ। অনেকক্ষণ তার কোন বাক্যলাপ শোনা যাচ্ছে না, এমনকি রূপলালের কন্ঠও স্তব্ধ। কোনো সাড়াশব্দ নেই, যদি বা কেউ কথা বলছে তা ফিসফিসিয়ে বলছে।

মহা মুশকিল হল তো! চীৎকার করে উঠলাম

"হিংলাজ মাতা-কি-—"

সমবেত কন্ঠে উত্তর হল- "জয়"

কিন্তু সে উত্তর নির্জীব, বড় প্রাণহীন।

সামনে থেকে গুলমহম্মদ অনেক কিছু বলে যেতে লাগল ছেলেকে। দিলমহম্মদ কোনো উত্তর দিলে না, মনে হল একটা গোলমাল নিশ্চয়ই ঘটতে চলেছে। জিজ্ঞাসা করলাম দিলমহম্মদকে, কি বললে তার বাবা।

সে উত্তর দিলে, "ঠিক বোঝা যাচ্ছে না আমরা কোন দিকে চলেছি।"

এতক্ষণ পরে রূপলাল কথা বললে, "তবে এখানেই থামলে হয়, আকাশে তারা উঠলে আবার চলা যাবে।"

গুলমহম্মদ উত্তর দিলে, "না তার দরকার নেই। হয়তো আজও তুফান উঠবে, উটের উপর নির্ভর করে এগিয়ে যাওয়া ঢের ভাল। আল্লা মুশকিল আসান করবেন।

তারপর উটকে আদর দিয়ে সাহস দিয়ে নানান কথা বলতে লাগল।

কয়েকজন একসঙ্গে বলে উঠল, "হ্যারিকেন লন্ঠন যে-কটা সঙ্গে আছে সব জ্বালিয়ে নেওয়া হোক।"

বুড়ো হেসে উত্তর দিলে, "জ্বেলে দেখো, তাতে আঁধার বারবে বই কমবে না। আর তখন লণ্ঠনের আলোয় পথ দেখাবে কে? উট চলে নাকে গন্ধ শুঁকে। আলো জ্বাললে তখন ওই আলোর সঙ্গে ওরা চলবে। তখন পথ দেখাতে হবে আমাদের। যতক্ষণ না আকাশে তারা উঠে, আমরা জানব কি করে কোন দিকে যাচ্ছি।" বুঝলাম রাত্রে আকাশের রাতের তারা দেখে এরা দিক নিরূপণ করে।

বই

না আকাশ না পাতাল-কোনো দিকে কূলকিনারা নেই, তবুও এগিয়ে চলেছি। এতক্ষণে শ্রীজয়াশঙ্কর পাণ্ডে মহাশয়ের গলার আওয়াজ পাওয়া গেল। তিনি প্রাণভরে অপদার্থ ছড়িওয়ালাটার মুণ্ডুপাত করতে লাগলেন। একেবারে ভয়ানক ভয়ানক শাপ-শাপান্ত। মুখ বুজে শুনছে সকলে। কে উত্তর দেবে?

শেষে তিনি কান্না জুড়ে দিলেন। তাঁর আত্মীয়-স্বজনের নাম করে সকরুণ বিলাপ। তার সঙ্গে নিজের মূর্খতার জন্যে মর্মবেদনা। কেন তিনি এই সর্বনাশের পথে পা বাড়ালেন, কেন তিনি সকলের নিষেধ না শুনে এই ভয়ঙ্কর দেশে বেঘোরে প্রাণটা দিতে এলেন, কেন এই অজাত পাণ্ডাদের উপর নির্ভর করতে গেলেন। এখন তাঁর উপায় হবে কি? তাঁর যে ঘরে এই আছে ওই আছে। এই সমস্ত ফিরিস্তি বলে তাঁর কাতর ক্রন্দন একটানা চলতে লাগল।

আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে পাণ্ডের মহাবিপত্তির কথাটি পোপটলাল জানালেন। বছর দুই পূর্বে ওঁর স্ত্রী বিয়োগ হয়। ওঁর বড় ছেলের ছেলেমেয়েতে সংসার ভরতি। তা হলে কি হবে-ওঁর মন বাঁধল না। আবার একটি বিবাহ করেছেন। হিংলাজ-মাতার কৃপাতেই এই বয়সে তা সম্ভব হয়েছে বলে ওঁর বিশ্বাস। সেই জন্যে মায়ের মানত পূজা দিতে চলেছেন। ঘরে নবপরিণীতা বধূ, কাজেই একটু বেশি বেসামাল উনি হবেন বৈকি।

শ্রীপাণ্ডের শিষ্যসেবকরা প্রভুকে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল। তারা থামল, কারণ প্রভুর পুনরায় জঙ্গলে যাবার প্রয়োজন হয়েছে। আমাদের সকলকেই থামতে হল। ভৈরবী ও নেমে এলেন। রূপলাল কলকেতে আগুন দিলে।

গুলমহম্মদকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি বাপু, পথ ঠিক আছে তো?"

উত্তর : "খোদা কা মালুম।"

মাঝখান থেকে কুন্তী হঠাৎ বলে উঠল, "একেবারে চিরদিনের মতো আমরা হারিয়ে যাই তো বেশ হয়। সবসে আচ্ছা হয়। সারা জীবন এইভাবে ঘুরে ঘুরে কাটাই। বাঁচা যায়।"

তার ভাগ্যে ভাল, পাণ্ডে ছিলেন না। কথাটা তাঁর কানে গেল না।

ভৈরবী আর উটের উপর উঠলেন না। উটের উপর শূন্যে খাঁটিয়া থাকাও ভয়ানক নিয়মবিরুদ্ধ। উটওয়ালারা কায়মনোবাক্যে বিশ্বাস করে যে, উঠের পিঠে শূন্য আসন থাকলে তাতে জিন চড়ে বসে। আর মরুভূমির জিনেরা সাঙ্ঘাতিক বদ জাতের। সুবিধা পেলেই লোককে ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে মারে।

সুতরাং কুন্তী আর থিরুমলকে চড়িয়ে দেওয়া হল। পাণ্ডে ফিরে এলে আবার আমরা অগ্রসর হলাম।

এবার আমর চাদরের খুঁট এক হাতে বাগিয়ে ধরে আর এক হাত সুখলালের একখানা হাত ধরে ভৈরবী হাঁটতে লাগলেন। আবার সকলেই নীরব হয়ে পড়ল।

আরও অনেকটা চলার পর পিতা-পুত্রে কি-সমস্ত আলোচনা জুড়ে দিল। সে ভাষার বিন্দু-বিসর্গও বুঝলাম না বটে, তবে এটুকু বুঝতে কারও কষ্ট হল না যে, অমাবস্যার রাত্রে অতলস্পর্শী অন্ধকারের মাঝে আমরা হারিয়ে গিয়েছি!

হারিয়ে যাওয়া ব্যাপারটা অনেক রকমে ঘটে থাকে। এক রকমের হারিয়ে যাওয়া আছে—সে বড় মজার ব্যাপার। কেউ হারিয়ে গেলে তার আত্মীয়স্বজন গাঁটের কড়ি খরচ করে সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন ছাপান : "বাবা গোপাল এবার ফিরে এসো, তোমার ঠানদিদি মৃত্যুশয্যায়, শেষ দেখাটা দেখে যাও। টাকার প্রয়োজন হলে জানাও। ইতি তোমার পিসিমা।" কিংবা এ ধরনের লেখাও বেরোয়, "মানিক আমার, তোমার সমস্ত অপরাধ ক্ষমা করেছি, সবাই ভুলে গেছে, তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হবে, ফিরে এসো।"

সন্ধ্যাবেলা রেডিওতে শোনা যায় : "পাঁচ ফুট পৌনে তিন ইঞ্চি লম্বা আর এক ফুট আড়াই ইঞ্চি বুকের ছাতি, মুখময় ব্রণ, এক চোখ ট্যারা, পরনে হাফ প্যান্ট আর হাওয়াই শার্ট-শ্রীমান নন্তু, বয়স মাত্র একুশ, গত একুশ দিন নিরুদ্দেশ। সংবাদ পেলে অল ইন্ডিয়া রেডিও কলকাতার স্টেশন ডিরেক্টরের কাছে অথবা লালবাজারে ছুটে চলে আসুন।"

এ জাতের হারানোতে মজা আছে। খবরের কাগজে নাম ছাপা হল, রেডিওতে নাম শোনা গেল। তারপর টাকা পেয়ে বাড়ি ফিরে চর্বচষ্য আদর-আপ্যায়ন ত আছেই। দেখা গেল, যে সঙ্কটের জন্য গা ঢাকা দেওয়া প্রয়োজন হয়েছিল তাও বেমালুম মিটেসিটে গেছে।

আবার বড় বড় মেলায় গিয়ে হারিয়ে যাওয়া আছে। বহু লোকজন দোকানপত্রে চারদিক জমজমাট, তার ভিতর মাঝে মাঝে সকলের সকল রকম আওয়াজের ঊর্ধ্বে, ঘোষণা করা হচ্ছে, "কেওড়াতলার শ্রীকামিনীভল্লব আপনি এখনই আমাদের অফিসে চলে আসুন। আপনার স্ত্রী এখানে দাঁড়িয়ে কেঁদে সারা হয়ে যাচ্ছেন।" এও বড় কম কথা নয়। মেলাসুদ্ধ সকলে জানল কেওড়াতলার শ্রীকামিনীভল্লবের নাম এবং তাঁর স্ত্রী যে তাঁর জন্যে চোখের জল ফেলছেন, সে কথাটাও।

আবার আর এক রকমের হারানো আছে, তাতে অনেকের জিভে জল এসে যায়। থানার বা আদালতের দেওয়ালে লটকে দেওয়া হল একখানি ছবি, সেই ছবির নীচে এক ঘোষণা। ঘোষণায় বলা হচ্ছে যে, যাঁর ছবি তিনি হারিয়েছেন এবং তাঁকে পাকড়াও করবার মতো নির্ভরযোগ্য সংবাদ দিতে পারলে সরকার এত হাজার টাকার পুরস্কার দেবেন। ওই টাকার অঙ্কটাই জিভে জল আনবার কারণ।

এ সমস্ত ছাড়াও এক রকমের হারানো আছে, সে একেবারে নির্ভেজাল হারানো। হারাধন বাবু একশ পঞ্চাশ টাকার কেরানি। বয়স হয়েছে। বড় ছেলেটি এবার বি.এ. দেবে। হারাধনবাবু সাহেবকে বলে রেখেছেন, পাস করলেই অফিসে ঢুকিয়ে দেবেন ছেলেকে। ছেলেটি পরীক্ষা দিলে ভালোভাবেই। ফল বেরুবার আগের দিন রাত্রে ছেলেটি ঘুমোতে

ঘুমোতে কাশতে আরম্ভ করলে, কাশতে কাশতে বমি। তাড়াতাড়ি ছেলের মা গেলেন আলো নিয়ে। গিয়ে দেখলেন-শুধু বমি নয়, রক্ত বমি, হুড়হুড় করে কাঁচা রক্ত বমি বেরুচ্ছে, বন্ধই হয় না। যাক রাতে তো কোনও রকমে কাটল।

পরের দিন অফিসে বসে হারাধনবাবু ফাইল কাবার করছেন এমন সময় একটি ছোট্ট সংবাদ কানে গেল। বে অব বেঙ্গল ব্যাঙ্ক হঠাৎ বেলা একটার সময় দরজা বন্ধ করেছে। হারাধনবাবুর আজীবনের সঞ্চয় আর তাঁর পিতার কাছ থেকে পাওয়া যা কিছু ওই ব্যাঙ্কেই জমা ছিল। ব্যাঙ্কটি ছিল শ্রী শ্রী ১০৮ শ্রীঅমুকানন্দ বাবার আশীর্বাদপূত, টাকাটাও হারাধন ওই ব্যাঙ্কে ভরসা করে রেখেছিলেন সেই কারণেই। হারাধনবাবু হারিয়ে গেলেন। নিজের অফিসে নিজের চেয়ারে বসে হারিয়ে গেলেন। এমন উধাও হয়ে হারিয়ে গেলেন যে, ইহলোকে কেউ আর তাঁর পাত্তা পেল না।

এই ভাবের নানা প্রকার হারানো পৃথিবীতে চালু আছে। কিন্তু সেই রাত্রে আমাদের একদল লোকের উট দুটি সহ হারানো হচ্ছে অন্য ব্যাপার। তার সঙ্গে কোনো কিছুর তুলনাই হয় না।

পা ফেলছি, এগিয়েও চলেছি, কিন্তু কোথা? কোন দিকে? কে তার উত্তর দেবে! উত্তর দিতে পারে উট, কিন্তু তারাও মাঝে মাঝে থেমে মাথা উঁচু করে এধার-ওধারে মুখ ঘুরিয়ে নিশ্বাস নিচ্ছে, মানে সন্দেহ জাগছে তাদের মনেও।

চারিদিকে-উপর নীচ সমস্ত লেপে পুঁছে একাকার হয়ে গিয়েছে। দু-হাত দূরেও কিছু দেখা যাচ্ছে না! আরও দূরে কি আছে, সমানে কিসের উপর গিয়ে পড়ব, কিসের ধাক্কা খাব বলতে পারি না। যদি উল্টো দিকেই আমাদের গতি হয় তবে সারারাত এইভাবে চলে কোথায় কত দূরে গিয়ে পড়ব তারই বা ঠিক কি। আবার যখন দিনের আলোয় ভুল বুঝতে পারা যাবে তখন সেই প্রখর তাপে কুয়োর কাছে ফিরে যাবার সামর্থ্য শরীরে থাকবে কিনা, কিংবা সেই পর্যন্ত কুঁজোর জলে চলবে কিনা তাই বা কে বলতে পারে! ওই অন্ধকারের উদরের মধ্যে কি যে আছে আমাদের ভাগ্যে—উল্টে-পাল্টে এই এক প্রশ্ন মনে মনে তোলাপাড়া করতে করতে সত্যিই নিজেকে নিজে হারিয়ে ফেললাম।

মৃত্যু জিনিসটা ভালো না মন্দ, তেতো না মিষ্টি, এ ধরনের প্রশ্নের শানানো জবাব হয়তো দেওয়া যায়। শুনে প্রশ্নকর্তার মুখ বন্ধ হবেই তাতে আর কোনো সন্দেহ নেই। কিন্তু মৃত্যু যে সত্যই কি পদার্থ তা জানবার অতৃপ্ত তৃষ্ণার নিবৃত্তি কিছুতেই হবে না। এই যে অজানা অন্ধকার জগৎটা, যার মধ্যে বাধ্য হয়ে এগিয়ে চলেছি পায়ে পায়ে, এই-ই মৃত্যু। একবার জানা হয়ে গেলে মৃত্যুর সমস্ত মহিমার ইতি হয় সেখানেই। অজানা আর অনাস্বাদিত থাকে বলেই মৃত্যুকে আমাদের এত সমীহ করে চলা, এত পাশ কাটাবার চেষ্টা। জানা হয়ে গেলে ওর মধ্যে আর কিছুই থাকে না।

দুর্নিবার আকর্ষণে আমরা ধীরে ধীরে সেই অজানা অনাস্বাদিতপূর্ব মৃত্যুর জগতে প্রবেশ করতে লাগলাম।

প্রতি পদক্ষেপের সঙ্গে সারা অতীত কালটা তার সবটুকু মাধুর্য নিয়ে পা দুটি জড়িয়ে ধরতে লাগল। হারিয়ে যাওয়া দিনগুলির খুঁটিনাটি তুচ্ছাতিতুচ্ছ লাভ লোকসান প্রত্যেকটি বিরাট আকার ধারণ করে উপরে ভেসে উঠল যা এতকাল তলিয়ে ছিল বিস্মৃতির অতল তলে। যে জীবনটাকে কেবলমাত্র একটা মস্ত বড় ফাঁকি ভিন্ন অন্য কিছুই কোনো দিন মনে করতে পারিনি, সেই জীবন সাতরাজার ধন মানিক হয়ে এমন মহিমায় মহিমান্বিত হয়ে উঠল যে, তাকে আঁকড়ে ধরে পড়ে থাকাটাই চরম শান্তি বলে মনে হতে লাগল। আজ পর্যন্ত পথ চলতে যত ঠোক্কর খেয়েছি, সে সব আঘাত সে সমস্ত জ্বালার কথা বেমালুম ভুলে গেলাম। সারা জীবনভর না পাওয়ার ক্ষুব্ধ আক্রোশ, আর হাতে পেয়ে হারানোর জন্যে বুক চাপড়ে হাহাকার, এ সমস্তই কোথায় তলিয়ে গেল। পদ্মদীঘির হাস্যমুখী ফুলগুলির মতো চোখ জুড়িয়ে ভাসতে লাগল ক্ষণিকের জন্যে পাওয়া মধুময় মণিমুক্তাগুলি। আর সবই পাঁক-পানার মতো চোখের আড়ালে ডুবে রইল। নিজে নিজেকে এ হেন ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখলাম যে,

একে ছেড়ে যেতে বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে উঠল। হায় জীবন!

তবুও অন্ধের মতো এগিয়ে চলেছি নিয়তির করাল গ্রাসের মধ্যে।

অসংখ্য ছোটবড় "যদি" চারিদিক থেকে মনের মধ্যে উঁকিঝুঁকি দিতে লাগল। যদি কোনো রকমে আজ পরিত্রাণ পাওয়া যায়, যদি সামনেই হঠাৎ এমন এক আশ্চর্য ঘটনা ঘটে যার ফলে একটি সুশীতল জলের কুয়া আর মাথা গোঁজবার আশ্রয়স্থান দুই-ই যায় জুটে, যদি কোনো অপার্থিব ইঙ্গিত পাওয়া যায় যার অনুসরণ করে ঠিক পথটি আমরা ধরতে পারি, যদি মা হিংলাজ তাঁর কোনো চর-অনুচরের হাতে একটা মশাল দিয়ে পাঠিয়ে দেন যার আলোয় অন্ধকারের পরদাটি ছিঁড়ে টুকরো টুকরো হয়ে যায়! এই সমস্ত সম্ভাব্য অসম্ভাব্য 'যদি'র পর ভবিষ্যৎ বলতে যদি কিছু থাকে—তবে সেই ভবিষ্যতের গর্ভে আছে মধু-শুধু মধু। মধু নয়, একেবারে অমৃত, অমৃতের নদী বয়ে যাবে সেই ভবিষ্যতে। সেই ভবিষ্যৎটাকে রূপে রসে বর্ণে গন্ধে এমন অপরূপ করে গড়ে তুললাম যে, তার ছটায় নিজেই মোহিত হয়ে গেলাম। আমারই সৃষ্টি আকাশ-কুসুমের সৌন্দর্য আর কারুকার্যের দিকে চেয়ে চেয়ে আমারই নেশা চড়ে যেতে লাগল।

সেই ভবিষ্যতেরঘৃণা নেই, ক্রোধ নেই, দ্বেষ-হিংসা, মারামারি খেয়োখেয়ি এ সমস্ত কোনো খুঁত নেই। হীরা-মাণিক্যের ইঁট দিয়ে গেঁথে সেই সোনার ভবিষ্যৎ সৌধটিকে আকাশচুম্বি করে তুললাম। তারপর অকস্মাৎ জীবন্ত বর্তমানের সঙ্গে লাগল এক বিষম ধাক্কা, নিমেষে আমার এত সাধের সোনার ভবিষ্যৎ ধূলিসাৎ হয়ে গেল।

উটের উপরে কুন্তী চাপা গলায় বলে উঠল-"উঃ, ছাড়ো-লাগে যে, ছিঃ!" উন্মাদ পিরুমল হি হি করে হেসে উঠল-লজ্জাহীন হাসি।

সামান্য ধস্তাধস্তির শব্দ কানে এল।

পুনরায় কুন্তী সামান্য কাতর শব্দ করলে। সঙ্গে সঙ্গে ঠাস করে একটি ছোট্ট চড়ের শব্দ কানে গেল।

আবার সেই হি হি করে হাস্যধ্বনি।

বর্তমানের বুকের চাপে ভবিষ্যতের নিশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম।

হঠাৎ সামনে থেকে ব্যস্ত গুলমহম্মদ তীক্ষ্ণ কণ্ঠে চিৎকার করে উঠল-"হুঁশিয়ার, তুফান!"

নিমেষে সমস্ত দলটার গতি স্তব্ধ হয়ে গেল। কানে এল শোঁ শোঁ গোঁ গোঁ আওয়াজ। যেন একপাল বন্যজন্তু বহুদূর থেকে তেড়ে আসছে। আমরা গায়ে গায়ে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে পড়লাম।

রূপলাল চেঁচাতে লাগল, "বসে পড়ো, বসে পড়ো সবাই, মাটি কামড়ে বসে পড়ো।"

দিলমহম্মদ ঊর্বশীকে বসাতে লাগল, "হা-হৈ-টা-টা!" ঊর্বশী বসতে না বসতে কুন্তী লাফিয়ে পড়ল মাটিতে ভৈরবীর পাশে। নেমেই ভৈরবীকে দু হাতে ঝাঁপটে ধরল।

মাথার উপর দিয়ে প্রচণ্ড বেগে চলে গেল এক বালির পাহাড়।

দিলমহম্মদ একটানে থিরুমলকে নামিয়ে আনল খাঁটিয়া থেকে। পোপটলাল তাকে চেপে ধরে বালির উপর শুয়ে পড়লেন। আমরা উপুর হয়ে পড়ে বালিতে মুখ গুঁজে দিলাম।

মহা হুলস্থুল কাণ্ড বেধে গেল আমাদের উপর। যেন হাজার হাজার মত্ত হস্তী মহাশূন্যে জ্ঞানশূন্য হয়ে লড়ছে। জাপটাজাপটি আছড়া-আছড়ির প্রলয়ঙ্কর শব্দ মুহূর্ত মধ্যে চরমসীমায় পৌঁছল। তার সঙ্গে এক ভয়ঙ্কর দৈত্য কড়-কড়-কড়াৎ শব্দে তার বিরাট থাবার সুতীক্ষ্ণ নখ দিয়ে নিরেট অন্ধকারটাকে চিরতে লাগল। একই সঙ্গে চলতে লাগল সব কিছু। নিশ্বাস বন্ধ করে আমরা পড়ে রইলাম বালিতে মুখ গুঁজে।

ছুটে এল কারা মহাশূন্য থেকে জল ঢালতে ঢালতে, চলেও গেল নিমেষের মধ্যে। আবার আর একদল এল, চলে গেল তৎক্ষণাৎ। দলে দলে বরুণদেবের অনুচরেরা মহাবিক্রমে জল ছুঁড়তে ছুঁড়তে করলে তাড়া, যারা অনর্থক কেলেঙ্কারি করছিল—সেই ঘূর্ণি আর বালুর ঝাঁপটাগুলোকে। ঝেঁটিয়ে তাড়িয়ে নিয়ে চলে গেল তাদের একদিকে।

ধীরে ধীরে সকলে উঠে বসলাম। বসে প্রথমে দম নিলাম। শরীরের উপর রাশিকৃত বালি জমেছিল। তার উপর জল পড়ে সে এক জমাট আস্তরণ দাঁড়িয়ে গিয়েছিল। আর কিছুক্ষণ ধরে এ ব্যাপার চললে একেবারে জীবন্ত সমাধি হয়ে যেত। বালি ঝেড়ে সবাই উঠে দাঁড়ালাম। সব ঠিক আছে, সামান্য যা ভিজেছে তাতে কোনো ক্ষতি হয়নি, বরং প্রাণ জুড়িয়ে গেছে বলা চলে।

দুটো হ্যারিকেন লন্ঠন জ্বালিয়ে মালপত্র পরীক্ষা করে দেখা হল। উটদের দাঁড় করিয়ে গুলমহম্মদ পরম আদরে তাদের গলায় হাত বুলিয়ে দিয়ে সাবাস দিলে। আকাশে দেখা গেল-ঐ ছায়াপথ, ঐ ধ্রুবতারা। আমরা ঠিক পথেই এসেছি। কুয়ো আর বেশি দূরে নয়।

রূপলাল চেঁচিয়ে উঠল-"হিংলাজ মাতা দেবী কি–", প্রাণভরে সবাই মুক্তকণ্ঠে জবাব দিল–"জয়", আবার আমরা অগ্রসর হলাম।

কুন্তী আর কিছুতেই থিরুমলের সঙ্গে চলতে রাজি নয়। সে আবার ভৈরবীর সঙ্গ ধরলে। হিংলাজ মাতাকে দর্শন করতে চলেছে সে, পথে কোনো পাপ কোনো অন্যায় যেন আর তাঁকে স্পর্শ করতে না পারে। কপাল চাপড়ে কাঁদতে লাগল কুন্তী। যথেষ্ট লাঞ্ছনা হয়েছে তার, আর না। এবার তাকে বাঁচতে হবে। মায়ের স্থানে পৌঁছে মায়ের দর্শন পেলে তার সমস্ত কলুষ কালিমা নিঃশেষে ধুয়ে মুছে যাবে। আবার সে ফিরে পাবে আগেকার জীবন, ফিরে পাবে রাজস্থানের সম্মানী জোতদারের শান্ত পবিত্র কন্যার নিজস্ব স্থানটুকু। সম্মান, আশ্রয়, সমাজ-জীবন, সব কিছু আবার ফিরে পাবে সে মায়ের কৃপায়। আর তা যদি না হয় তবে চিরকালের জন্য ভৈরবীর আশ্রয়-ওই গেরুয়া ওই কমণ্ডুলু আর সিন্দুর মাখানো ত্রিশূল। ভৈরবীর পায়ের উপর আছড়ে পড়ল সে–পড়ে মাথা খুঁড়তে লাগল। তাকে বাঁচাতেই হবে। তাকে ওই পাপ থিরুমল আবার যদি স্পর্শ করে, তবে তার হিংলাজ-দর্শন ভাগ্যে ঘটবে না কিছুতেই।

কুন্তীকে নিয়ে ভৈরবী উটের পিঠে চড়লেন। থিরুমলকে নিয়ে পোপটলাল এগিয়ে গেলেন। তখনও সে সমানে ফিক ফিক করে হাসছে। তাকে নিয়ে সকলে যে ক্রুদ্ধ আলোচনা করছে সে সমস্ত তার কানেই ঢুকছে না। হিতাহিত জ্ঞানটুকু হারালে ওই একমাত্র শান্তি, লোকের নিন্দা-কটাক্ষের পরোয়াও থাকে না।

তারপর 'আর বেশি দূর নয়' যে কুয়ো, তার কাছে আমরা পৌঁছলাম আরও ঘণ্টা তিনেক পরে।

সেখানে একটা গাছের তলা পর্যন্ত জুটল না। কুয়োর ধারেই উঁচু জায়গায় ভাগে ভাগে আসন পাতা হল। কুন্তী আর সুখলালকে নিয়ে ভৈরবী একধারে কম্বল বিছালেন, আমার কম্বল তার সামনেই পাতা হল। ওদের মাথার দিকে উট দুটিকে বসিয়ে মালপত্র তার পাশে টাল দিয়ে রাখা হল। উটের ওপরে রূপলাল আর পোপটলাল থিরুমলকে নিয়ে শোবার ব্যবস্থা করলেন। অন্য সকলে কাছাকাছি কম্বল বিছাল।

শ্রীজয়াশঙ্কর তাঁর শিষ্য-সেবকদের নিয়ে কুয়োর ওপারে গুছিয়ে বসলেন। সকলের থেকে আলাদা থাকাই তাঁর প্রয়োজন। একে তাঁর তীক্ষ্ণ ব্রাহ্মণত্ব, তার উপরে শরীরের যা অবস্থা, তাতে বাকি রাতটুকুতে কতবার লোটা হাতে ছুটতে হবে তার ঠিক নেই।

গুলমহম্মদ সমস্ত ঠিকঠাক করে এসে আমার কাছে বসল। বললে, "হুজুর কেন গোসল করে নিলেন না? বালুর ঝড়েতে ভয়ানক তকলিফ হয়েছে নিশ্চয়ই। গোসল করলে আরাম পেতেন।"

বললাম, "তা তো পেতাম। কিন্তু এ সময় জল কোথায় পাব?"

সে বললে, "এখানে কুয়োর ধারে দাঁড়িয়ে জল তোলবার ব্যবস্থা আছে। চলুন জল উঠিয়ে দিচ্ছি।"

বুঝলাম নিশ্চয়ই চায়ের প্রয়োজন হয়েছে বুড়ো মানুষটির। বললাম, "তা চলো, তার আগে বরং দিলমহম্মদকে বলে দাও-একটু চায়ের জল গরম করতে, যদি ও সময় কাঠকুটো কিছু জোটে।"

এই-ই চাইছিল সে। বললে, "বহুত খুব। আগুন জ্বলবে না কেন? কি আফসোসের বাত। আমি আগুন জ্বালাচ্ছি, বাচ্চা আপনার জল তুলে দিক।" হাঁক দিয়ে ছেলেকে বোধ হয় সেই হুকুমই করলে।

ভৈরবীকে বললাম, "মাথা ধুয়ে ফেলতে চাও তো উঠে এসো।" দড়ি বালতি আর হাঁড়ি নিয়ে ভৈরবী এগিয়ে এলেন।

কুন্তী উঠে চলে গেল চা করতে। যত সামান্যই হোক, সকলের সেবায় সে সর্বদা প্রস্তুত। তবে আজ সে বড় গম্ভীর হয়ে পড়েছে। যে লীলাচঞ্চল ভাবটি এই এ কদিন বজায় ছিল, রাস্তার সেই ঘটনার পর থেকে সেটুকু কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে।

ওধারে তখন আগুন জ্বলে উঠেছে, সে আগুন অবশ্য জ্বলছে বড় কলকের মাথায়। এখানে কুয়োর ধারে একখানা বড় কাঠ পড়ে আছে, তার উপর দাঁড়িয়ে জল তোলা গেল। একটা ছোট কাঠের ডোঙাও আছে সেখানে। সেই ডোঙাতে উটে ছাগলে জল খায়। বালতি করে জল তুলে হাঁড়ির মুখে গামছা বেঁধে ছেঁকে নেওয়া হল। জলে বড় দুর্গন্ধ। যাক –তবুও ঠান্ডা জল, একরকম স্নান করেই এলাম আমরা

রূপলালকে ডেকে তার আর থিরুমলের চা নিয়ে যেতে বললাম। থিরুমল ঘুমিয়ে পড়েছে, পোপটলাল তো চা খানই না। আমি গুলমহম্মদ আর রূপলাল আরামসে আরাম করে সেই শেষরাত্রে চা-পান করলাম। তারপর শয়ন।

ঠাণ্ডা হাওয়ায় শীত করতে লাগল। মশারাও সেখানে থাকেন না। চোখ জুড়ে এল। ঘুম ভাঙল স্বপ্ন দেখতে দেখতে। চমৎকার মিঠা হাতের হারমোনিয়াম বাজছে কোথায়। অতি দ্রুত তালের একটি সুর। ঝড়ের বেগে একবার উঠছে চড়া পর্দায়, পরক্ষণেই নেমে যাচ্ছে খাদে। মাঝে মাঝে থেমে থেমে তালে তালে আবার এগিয়ে আসছে। সুরের যেন জাল বুনে চলেছে, সুরের মূর্ছনায় মাদকতা আছে, বেশ ঘোর লেগে গেল। একটু পরে মনে হল, এ কি স্বপ্ন নয় তো, সত্যিই বাজনা শুনছি! চোখ চেয়ে উঠে বসলাম।

হাঁ, সত্যিই হারমোনিয়াম বাজছে, বাজাচ্ছে থিরুমল। সবাই তাকে ঘিরে বসেছে। সে চোখ বুজে হাত চালাচ্ছে সেই হারমোনিয়ামটার উপর।

ভৈরবী তখনও নিদ্রামগ্ন, তাঁর পাশে গালে হাত দিয়ে বসে আছে কুন্তী। একদৃষ্টে সে চেয়ে আছে থিরুমলের দিকে। মাঝখান থেকে উট দুটি উঠে যাওয়ায় আর আড়াল নেই। কুন্তীর দুই চোখ থেকে দুটি জলের ধারা নেমেছে। গাল বেয়ে সেই অশ্রুধারা গড়িয়ে পড়ছে তার বুকে, টেরও পাচ্ছে না কুন্তী।

ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া তখনও বইছে, একটু পরেই সূর্যদেব উঠে আসবেন। তখন সমস্তই তেতে উঠবে। পায়ের তলার বালু, মথার উপরের আকাশ এবং সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মেজাজও। কিন্তু আরও একটু বিলম্ব আছে তার।

গালে হাত দিয়ে বসা অশ্রুমুখী কুন্তীকে লাস্যময়ী এক তরুণীর আবরণে মমতাময়ী মায়ের মূর্তি, করুণার প্রতিমাখানি। চুপ করে বসে রইলাম, হারমোনিয়াম বেজেই চলল।

ওধারে হঠাৎ কি হল এই ভোরবেলায়! একসঙ্গে চিৎকার গালাগালি ঝগড়া সব মিলিয়ে মহা গোলমাল বেঁধে গেল। আমরা যেখানে শুয়ে-বসে রয়েছি সেখান থেকে ব্যাপারটা দেখা যাচ্ছে না। মাঝখানে একটা বালির টিলার আড়াল পড়েছে। অনেক

গলার আওয়াজের সঙ্গে মাঝে মাঝে গুলমহম্মদের গলাও শোনা যেতে লাগল। রূপলাল এবং আরও দু-চারজন উঠে গেল।

আঁচলে চোখের জল মুছে কুন্তী উঠে দাঁড়াল থিরুমলের সামনে। থামল বাজনা। মুখ তুলে কুন্তীর দিকে চেয়ে থিরুমল মধুর হাসি হাসলে। স্পষ্টই দেখতে পেলাম সে হাসি সে দৃষ্টি ইঙ্গিতমুখর, প্রাণময়-উন্মাদের অর্থহীন প্রলাপ নয়।

কুন্তী বললে, "উঠে এসো, মুখ হাত ধুয়ে নাও।"

হারমোনিয়াম ঠেলে রেখে থিরুমল উঠে দাঁড়াল। চারিদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "আমরা কোথায় যাচ্ছি?"

"কেন, তুমি কি ভুলে গেলে নাকি আমরা হিংলাজ-মায়ের দর্শন করতে যাচ্ছি, তোমার মনে পড়ছে না?" এই বলে কুন্তী-বোধ করি মা হিংলাজের উদ্দেশেই-হাত জোড় করে কপালে ঠেকালে।

থিরুমল মাথা হেঁট করে পায়ের দিকে চেয়ে তার রুক্ষ চুলের ভিতর আঙুল চালাতে লাগল। কোথায় যেন খেই হারিয়ে ফেলেছে, খুঁজছে।

কুন্তী এগিয়ে এসে তার হাত ধরলে, "চলো এখন, মুখ হাত ধোবে।"

শান্ত ছেলেটির মতো চলে গেল থিরুমল কুন্তীর সঙ্গে। এক লোটা জল নিয়ে গেল কুন্তী ।

ভৈরবী মুখের উপর থেকে চাদর সরিয়ে বললেন, "যাক, বাঁচা গেল। এবার ছেলেটা হুঁশ ফিরে পাচ্ছে। মা নিশ্চয়ই মুখ তুলে চাইবেন-নয়তো মেয়েটার গতি হবে কি!"

বলেই তিনি উঠে বসলেন।

ওধারে গণ্ডগোলটা বেড়েই চলেছে। কার সঙ্গে কার ঝগড়া হচ্ছে আর কি নিয়েই বা লাগল ঝগড়া? ভাবছি উঠে যাব কিনা।

ভৈরবী বললেন, "কোথাও একগাছা খড়কুটো নেই এখানে। চারিদিকে একেবারে খাঁ খাঁ করছে। কে জানে আজ এখানে কি করে সারাদিন থাকা হবে!"

তাই-ই হল। রোদের তখন এত তেজ যে চোখ চাওয়া যায় না, বালিও তেতে আগুন, সূর্যদেব ঠিক মাথার উপরে এসে রক্তচক্ষু করে চেয়ে আছেন আমাদের দিকে। সেই সময় আমাদের উঠতে হল সেখান থেকে । না উঠে উপায় ছিল না।

বহু চেষ্টা করেও আগুন জ্বালাবার মতো কিছুই জুটলো না, তখন আটা জলে গুলে তার সঙ্গে গুঁড় মিশিয়ে যে যতটা পারলে গিললে। আমাদের বরাতে কাঁচা চিনাবাদাম আর খেজুর। সব চেয়ে বড় দুঃখ, ঊর্বশী আর তার মা স্রেফ জল খেয়ে রইল। জলও তেমনি, যেমন বিস্বাদ আর দুর্গন্ধ তেমনি নোংরা। তাই ছেঁকে ছেঁকে কুঁজো ভর্তি করা হল। প্রত্যেকের কুঁজোয় ভৈরবী সামান্য একটু করে কর্পূর দিয়ে দিলেন। আমি সহযাত্রীদের দুটো করে পেঁয়াজ নিতে অনুরোধ করলাম।

এই জ্বালানীর জন্যেই সকালে হাঙ্গামা বেঁধে গিয়েছিল এখানকার কুয়োওয়ালার সঙ্গে। লোকটিকে প্রেতের মতো দেখতে। লম্বায় সাধারণ একটা মানুষের দেড়গুণ হবে তার শরীর, কিন্তু সেই দীর্ঘ শরীর শুধু একখানা শুকনো কোঁচকানো চামড়া ঢাকা একটা প্রকাণ্ড কঙ্কাল ছাড়া আর কিছু নয়।

সাজপোশাক বলতে যা কিছু ওর গায়ে ঝোলানো আর মাথায় জড়ানো রয়েছে তার কোনও নাম না দেওয়াই ভাল। ফালি ফালি লম্বা ছেঁড়া কতকগুলো ন্যাকড়ার টুকরো যা এককালে হয়তো ওর পায়জামাই ছিল-তাই কোমর থেকে ঝুলছে। এই একই অবস্থার একটা কিছু গলায় ঝোলানো আছে-তাতে সামনে পিছনে কিছুই ঢাকা পড়েনি। আর মাথায় যা জড়ানো আছে তাকে ন্যাকড়াও বলা চলে না। সব চেয়ে ভীষণ ওর কোটরগত চক্ষুর দৃষ্টি। সে দৃষ্টিতে জলজ্যান্ত ক্ষুধা বহুদূর থেকে লম্বা জিহ্বা লক লক করে ছুটে আসছে।

মহাদুর্ভিক্ষের এই জীবন্ত প্রতিমূর্তি কোথা থেকে কতকগুলো কাঁটার ডালপালা জুটিয়ে এনে একখানা কুঁড়ে বানিয়েছে। তার মধ্যে বুকে হেঁটে ঢুকতে বেরতে হয়। সেইভাবেই সেই কাঁটা দিয়ে বানানো গহ্বরের মধ্যে এই লোকটি বাস করে বেঁচে আছে। কোনো গৃহস্থ ওর কুয়োর জল নেয় না। কারণ গৃহস্থরা এই কুয়োর ত্রিসীমানায় বাস করে না। বাস করবে কি করে? তাদের উট ছাগল খাবে কি? কেউ যদি কখনো এই পথে যায় তবে উটকে খানিক জল খাওয়ায়। আর এই মনুষ্যসন্তান এখানে পড়ে আছে তার অন্তহীন ক্ষুধা নিয়ে। একমাত্র ক্ষুধা দিয়ে ক্ষুধাকে নিবৃত্ত করা ভিন্ন এর আর অন্য কোনো উপায় নেই।

আমাদের মধ্যে কে গিয়ে ওর সেই কাঁটার ডালপালা ধরে টান দিয়েছিল। কি করে বুঝবে যে ওটা একটা বাসগৃহ। আর যাবে কোথা, একটা মানুষ নেকড়ে বেরিয়ে এল বুকে হেঁটে সেই কাঁটার স্তূপের নীচে থেকে। বেরিয়ে এসেই সেই লোকটির শরীর থেকে এক

খাবল মাংস ছিঁড়ে নেবার জন্যে দাঁত বার করে তেড়ে এল। ভাগ্যে সেই সময় সেখানে গুলমহম্মদ গিয়ে পড়ে, নয়তো ভয়েই সে বেচারা অক্কা পেত নির্ঘাত।

তারপর শুরু হয় ঝগড়া, যার মীমাংসা কিছুতেই হল না। হবে কি করে মীমাংসা? টাকা-পয়সা দিতে যাওয়া হল, সে ছুঁড়ে ফেলে দিলে। আটা দিতে যাওয়া হল, আটা নিয়ে সে কি করবে? রুটি বানাবে সে কি দিয়ে? আগুন জ্বালাবার সরঞ্জাম কই? একমাত্র সে সন্তুষ্ট হবে রুটি পেলে। হায় রুটি! পোড়া পেটের জ্বালায় পোড়া রুটি ভিন্ন আর সব কিছুই তার কাছে মূল্যহীন আবর্জনা মাত্র।

সেই রুটিই আমরা দিতে পারলাম না তাকে। কেউই তাকে দেয় না। কারণ কেউই কিছু বানায় না এখানে। বানাবার জন্যে আগুন কোথায়? কি বিড়ম্বনা!

ভৈরবী দিলেন তাকে চীনাবাদাম আর খেজুর। হিংস্র জন্তুর ভঙ্গিমায় তৎক্ষণাৎ সে খেতে আরম্ভ করলে। তার দৃষ্টি, তার সর্বেন্দ্রিয়, তার সমস্ত সত্তা হাউ হাউ করে চিবোতে লাগল, গিলতে লাগল। সে ভুলে গেল আমাদের কথা, ভুলে গেলে দুনিয়ার কথা। চুপি চুপি আমরা খানিক আটা রেখে দিয়ে পালিয়ে গেলাম।

পোপটলাল দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বললেন, "ওকেও যদি সঙ্গে নেয়া যেত!"

একটা মানুষকে ওভাবে ওইখানে একলা ফেলে রেখে চলে যেতে কোথায় যেন টনটন করতে লাগল। কিন্তু কি করা যাবে?

বস্তা বস্তা আটা উটের পিঠে চলেছে। আর আমরা সকলে শূন্য উদরে সেই আটার পিছন পিছন হাঁটছি। একেই বলে ভাগ্যের পরিহাস।

নিতান্ত কাবু হয়ে পড়েছেন জয়াশঙ্কর। মেজাজ তাঁর ততোধিক বিগড়ে উঠেছে। গত রাত থেকেই জঙ্গলে গেলে তাঁর শরীর থেকে রক্ত ছাড়া আর কিছুই বেরোয়নি। দুজনের কাঁধে ভর রেখে কোনো প্রকারে তিনি হাঁটছেন। তাঁর দিকে চাওয়াই যায় না। চাইলেই একটা বিশ্রী আশঙ্কায় প্রাণটা কেঁপে ওঠে। মাঝে মাঝে তিনি একটু করে জল খাচ্ছেন। তাঁর কাপড়েও রক্তের দাগ লেগেছে, অবস্থা এতই শোচনীয়।

ভয়ানক গম্ভীর হয়ে পড়েছেন সদাহাস্যমুখ পোপটলাল প্যাটেল। তাঁর দলের একটি জোয়ান ছেলে, নাম তার মণিরাম, তার জ্বর উঠেছে। সে কি সহজ জ্বর-তার মুখের দিকে তাকালে মনে হচ্ছে, এখনই মুখ ফেটে রক্ত ছুটবে চারিদিকে। শরীরের সমস্ত রক্ত যেন মুখে চোখে এসে জমা হয়েছে। হাঁসফাঁস করে হাঁফাচ্ছে সে। এই রোদে তাকে একরকম বয়েই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে।

হাঁটছে থিরুমল, হাঁটছে কুন্তী। থিরুমলকে আজ আর হাত ধরে নিয়ে যেতে হচ্ছে না। ঘাড় গুঁজে একমনে কি চিন্তা করতে করতে সে চলেছে। মাথার উপর আগুন ঢেলে দিচ্ছে, পায়ের তলায় গনগনে আগুন, কিন্তু কোনো ভ্রূক্ষেপ নেই তার, সে আপন চিন্তায় বিভোর।

একখানা গামছা ভিজিয়ে মাথায় মুখে চাপা দিয়েছিলাম। কয়েক পা চলতেই সেটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল। জল-বার বার জল পান করছে সবাই। সেই উত্তপ্ত বিস্বাদ জল ঠোঁট পার হয়ে গলা দিয়ে যতদূর গিয়ে নামছে ততদূর জ্বালা করছে, শীতল হওয়া তো দূরের কথা। নিশ্বাস বেরুচ্ছে, তাও গরম আগুন। মাঝে মাঝে খানিক চোখ বন্ধ করে চলেছি; চোখ খুলে রাখলেও জ্বালা করছে, বন্ধ করে রাখলেও তাই। চতুর্দিকে মা ধরিত্রীর দেহ থেকে উত্তপ্ত বাষ্প উঠেছে, আর আকাশটাও যেন অনেক নীচে নেমে এসেছে। বাতাস বইছে, বেশ বেগেই বইছে বাতাস। সে বাতাস নাক দিয়ে ঢুকে ভিতরে পৌঁছে সেখানটা জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দিচ্ছে!

একটু জল চাইলাম ভৈরবীর কাছে। তিনি স্মরণ করিয়ে দিলেন পেঁয়াজের কথা, "জল আর গিলবেন না, একটা পেঁয়াজ চিবোন।"

আঁচলের মাথা মুখ চোখ ঢেকে কুন্তী হাঁটছিল আমার পিছনেই। এইবার সে টলতে লাগল। ভৈরবী উটের উপর থেকে দেখিয়ে দিলেন তার অবস্থা। কিন্তু ঊর্বশী চলেছে একেবারে উপবাস করে, তার পিঠে আর একজনকে নেবার কথা বলা যায় কি করে?

কুন্তীকে বললাম একটা পেঁয়াজ চিবোতে। আমিও একটায় এক কামড় দিলাম। প্রথম কামড়টা যথানিয়মে উৎকট লাগল। কিন্তু চিবিয়ে রসটা একটু গলা দিয়ে নামতে বেশ স্বস্তি পাওয়া গেল। চর্বণ করতে লাগলাম কাঁচা পেঁয়াজ।

বৃষ্টি বর্ষা বাদল-আরও আদুরে নাম বাদর, আরও কত না সব নাম মনে পড়ছে! সব-কটি কথাতেই এমন একটা ঝরঝর ঝরে-পড়ার আমেজ পাওয়া যায় যাতে শরীর মন প্রাণ সব জুড়িয়ে যায়। শুধু জড়িয়ে যাওয়া নয়, এলিয়ে পড়ে মন প্রাণ যখন ওই কথাগুলি মনে আওড়ানো যায়। তাই করছিলাম চোখ বুজে পেঁয়াজ চিবোতে চিবোতে।

হঠাৎ মনে পড়ে গেল দু-লাইন

"প্রেমের বাদল নামল, তুমি জান না হায় তাও কি,
আজ মেঘের ডাকে তোমার মনের ময়ূরকে নাচাও কি?"

এখানেও বাদল নেমেছে। কিন্তু প্রেমের নয়। এমনকি, সাদাসিধে জলের বাদলও নয়। অনলের বাদল নেমেছে। অগ্নিবৃষ্টি হচ্ছে। মনের ময়ূরের পালক পাখা পুড়েই ছাই হয়ে গেছে অনেক আগে। বেচারা ঝলসে ঝলসে ছটফট করতে করতে মরছে। নাচাব কাকে?

গতরাত্রে এখানেও বাদল নেমেছিল, মেঘও ডেকেছিল, কিন্তু তাকে বাদল নামা বলা চলে না, আর সে মেঘের ডাকে ময়ূর নাচা তো দূরের কথা, প্রাণ খাঁচা ছাড়া হবার যোগাড় হয়। বাংলা দেশের আকাশে বাতাসে, ঘাটে মাঠে, কুঁড়েঘরের চালে, গাছপালার মাথায়-ধীরে-সুস্থে ঘনিয়ে ওঠে যে গা-এলিয়ে-যাওয়া ভাবটি বর্ষা নামার সঙ্গে সঙ্গে, সে এখানে আকাশকুসুম। আকাশের জলের ধারায় মানুষের ভিতর বাহির সমস্ত ভিজে নরম হয়ে গলে গলে পড়ে না এখানে। এখানকার যে বর্ষার সঙ্গে পরিচয় হল তার আবির্ভাব আর অন্তর্ধানের ফাঁকটুকুতে ত্রাহি ত্রাহি ডাক ওঠে। এ বর্ষা মেয়ে নয়, এ এক বুট-পট্টি-সাঁটা জঙ্গি জোয়ান। গটমট করে এসে হুড়মুড় করে আপন কার্য সেরে দুমদাম করে চলে গেলে, এর সঙ্গে কি তুলনা করা চলে বাংলা মায়ের বর্ষণমুখর রূপটিকে! এখানে কোথায় খুঁজে পাব বাংলার বর্ষার সেই বাঁধন-ছেঁড়া রাগিণীটিকে! কোথায় খুঁজে পাব সেই ক্রন্দনমুখী মেয়েটিকে এই মুখপোড়া মুল্লুকে!

হঠাৎ সব ঘুলিয়ে গেল। হঠাৎ কখন বর্ষা নেমে এল, নামল আমার মনে-প্রাণে আমার সমস্ত সত্তায়। মশগুল হয়ে গেলাম

৪

বর্ষা নেমেছে।

বাংলাদেশের আটপৌঢ়ে ঘরোয়া বর্ষা। জন্ম থেকেই যে বর্ষার সঙ্গে আমাদের নাড়ীর যোগ, যে বর্ষার সঙ্গে আমার হাড় মাংস অস্থি মজ্জার একান্ত ঘনিষ্ঠ পরিচয়, সেই বর্ষা-যে বর্ষার অঝোরধারায় মনও গলে পড়ে। একেবারে ছেলেবেলায় ঠাকুরমার কোলে বসে আকাশের পানে চেয়ে যে বর্ষার দিনে ছড়া শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়তাম—"বৃষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর নদেয় এল বান" সেই টাপুর টুপুর গানের বর্ষা নেমেছে আমার প্রাণের মধ্যে।

চোখ বুজে দেখছি-আকাশ জুড়ে একখানি মেঘ ঝুলছে। ঝুলছে একখানি ধোঁয়া রঙের চাঁদোয়া তাল-নারকেলের মাথা ছুঁয়ে, সেই চাঁদোয়ার উপর থেকে কারা হুড় হুড় করে জল ঢালছে। কখনো কম, কখনো বেশি; ঢালছেই জল, পড়ছেই জল।

পড়ছে জল তাল নারকেলের মাথায়,-অত বড় লম্বা দেহ, ওইটুকু ছাতায় জল মানবে কেন? সারা দেহ ভিজে জল গড়িয়ে পড়ছে। চুপ করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজছে ওরা। অপেক্ষা করছে জলটা একটু থামলে হয়, অমনি মাথা দোলাতে শুরু করবে।

পড়ছে জল আমগাছটার ঝাঁকড়া মাথায়। ভিজে একেবারে জবুথবু বেচারা। অত বড় দেহ নিয়ে কাঁহাতক ভেজা যায়! মনমরা হয়ে মুখ কালো করে রয়েছে। লক্ষ লক্ষ পাতা বেয়ে ডাল বেয়ে জল নামছে মাটিতে ওর পায়ের গোড়ায়। আহা পায়ের তলায় মাটিটুকুও ভিজে গেল, মন খারাপ হয় না কার!

কাকপক্ষীর টু শব্দ নেই। কে কোথায় মাথা গুঁজে লুকিয়ে বসে আছে! একবার যদি সামান্য ক্ষণের জন্যে জল থামে অমনি সবাই বেরিয়ে আসবে যে যার আশ্রয় ছেড়ে। তারপর চেঁচামেচি আর পাখা-ঝাড়া আরম্ভ হয়ে যাবে।

দাওয়ায় বসে কাঁথা সেলাই করতে করতে মা একবার হাতের কাজ থামিয়ে মুখ তুলে আকাশের দিকে খানিক চেয়ে রইলেন। তারপর বললেন, "কে যেন ফুটো করে দিয়েছে আজ আকাশটায়।" বলে আবার কাঁথায় ফোঁড় দিতে লাগলেন।

উঠানের ওধারে গোয়ালের গায়ে ছোট চালাটায় দাঁড়িয়ে ধলী আর লক্ষ্মী একেবারে চুপ করে আছে, জাবর কাটছে না, মুখ নাড়ছে না। ওদের চোখেও মেঘের রঙ ধরেছে। আদুরে আবদেরে অভিমানী মেয়ের মতো ওদের চোখের ভাবখানা।

ঘরের চালে পড়ছে জল, চাল বেয়ে নামছে এসে উঠানে। উঠানে স্রোত বইছে। পায়ে-চলা পথটা বেয়ে সেই স্রোত চলেছে খিড়ুকি-পুকুরে। কই-মাছেরা একজন দুজন করে উঠে আসছে সেই পথ ধরে। ওরা শেষ পর্যন্ত এসে একবার দেখবে এত জল কোথা থেকে গিয়ে নামছে ওদের পুকুরে।

জল উঠেছে বাঁশঝাড়ের গোড়ায়। ওখানকার বাসিন্দারা প্রাণপণে ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি জুড়ে দিয়েছে। মোটা গলায় 'গ্যা, গোঁ, গ্যা, গোঁ করছে ভারিক্কী চালের কর্তারা। ছেলেপুলেরা 'করর কট, করর কট' লাগিয়েছে, ওদের গিন্নীদের বউদের আলাদা গলার আওয়াজ, দূর থেকে বেশ বুঝা যায়। মহা শোরগোল হুলস্থুল ব্যাপার, যায় বুঝি ওদের গৃহস্থালি সব ভেসে।

কলাগাছের দফা রফা, একেবারে শোচনীয় অবস্থা। হাঁফিয়ে উঠেছে বেচারারা, অনবরত পড়ছে জল-ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্ ঝিম্, ঝম্ ঝম্ ঝম্ ঝম। একটু ছেদ দিলে ওরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচে।

ওধারে উঠানের কোনায় মাচাটার উপরে দুটো একটা ঝিঙেফুল ইতিমধ্যেই মুখ তুলে চেয়ে চেয়ে দেখছে। বোকারা মনে করছে সন্ধ্যা বুঝি হয়ে এল। সন্ধ্যা হতে এখনো অনেক দেরি। আগে বৃষ্টিটা একটু কমবে, তারপর দেখা যাবে পশ্চিম দিকটা লাল হয়ে উঠেছে। সূর্য অবশ্য তার অনেক আগেই পশ্চিমে নেমে গেছেন।

একবার চোখ চাইলাম। মুখ ফিরিয়ে পশ্চিম দিকটা একবার দেখে নিলাম। আগুনের গোলার মতো প্রকাণ্ড একটা মাথা স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে আছে। সভয়ে তৎক্ষণাৎ চোখ বন্ধ করলাম, যে বর্ষা আমার দেহের প্রতি অণু-পরমাণুতে অঝোরে ঝরছিল তা নিমেষে

কোথায় উবে গেল।

অনেকক্ষণ ধরে ডান কাঁধে আর ডান হাতটায় ভার-ভার ঠেকছিল। এবার খেয়াল হল, কুন্তী আমার কনুই-এর উপর দু-হাত দিয়ে আঁকড়ে ধরে একরকম ঝুলতে ঝুলতে চলেছে। নিজেকে টেনে নিয়ে চলবার ওর শক্তি ফুরিয়েছে।

ঊর্বশীর পিঠের উপর ভৈরবীর দিকে তাকিয়ে দেখলাম, সেখানে তাঁর বদলে কি একটা কালো কম্বল ঢাকা হেলতে দুলতে চলেছে। রোদের তাপ থেকে বাঁচবার উপায় আপাদমস্তক কম্বল মুড়ি দেওয়া।

অনেক আগে বড় উট চলেছে, দলসুদ্ধ সবাই তার সঙ্গে এগিয়ে গেছে। আমি কুন্তী আর দিলমহম্মদ-তিনজনে আছে ঊর্বশীর সঙ্গে।

দিলমহম্মদকে জিজ্ঞাসা করলাম, "আর কতক্ষণ লাগবে সামনের কুয়োর ধারে পৌঁছতে।

ও বললে, "বোধ হয় অর্ধেকটা পথ আমরা এসেছি। এধারে পথের তো কোনো নিশানা নেই। উপের মেজাজ আর মর্জির উপর নির্ভর করে সব। ওদের পেটে ক্ষুধা আছে। ক্ষুধার টানে ওরা সব থেকে সোজা পথে চলে। কিন্তু এবারে এধারের যা অবস্থা দেখছি-তাতে চন্দ্রকূপের ওধারে না পৌঁছানো পর্যন্ত ওদের পেটে দেবার কিছু মিলবে বলে তো মনে হয় না।"

জিজ্ঞাসা করলাম, "তা হলে অন্য বছর এধারের অবস্থাটা অন্য রকম থাকে নাকি?"

দিলমহম্মদ বললে, "গত বছর এ মুল্লুকে একবারে জল পড়েনি। নয়তো এই মরশুমে এ অঞ্চলে দু-চারটে ঝোঁপঝাড় সব জায়গাতেই দেখা যায়। এবারে একেবারে সব কিছু পুড়ে সাফ হয়ে গেছে। এই চন্দ্রকূপ এলাকাটা পোড়া মুল্লুক, এধারে কেউ বাসও করে না, আসা-যাওয়াও নেই কারও। হিংলাজযাত্রীরাই শুধু আসে। চন্দ্রকূপ দর্শন না করে হিংলাজ দর্শন হয় না। এই জন্যই এ পথে আসে। নয়তো লোকে এই সমুদ্রের চড়ায় আসবে কোন কাজে!

সমুদ্রের কথাটা কানে যেতে দু-দিন আগে ছেড়ে আসা চোখ-জুড়ানো নীল সাগরকে মনে পড়ে গেল। বললাম, "ওখানটাও তাহলে সমুদ্রের চড়া। সমুদ্রের জল এখান থেকে কতদূর হবে মনো করো?"

ও উত্তর দিলে, "কমসে কম পনেরো-ষোল ক্রোশ সোজা পশ্চিমে চললে দরিয়ার পানি মিলবে। চন্দ্রকূপও দরিয়ার চড়ায়, তবে ওখান থেকে দরিয়া অনন্ত ত্রিশ ক্রোশ!"

কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বললে, "হিংলাজ থেকে ফেরবার সময় এই পথে আর আমাদের আসতে হবে না। চন্দ্রকূপকে বামে রেখে তিন-চার ক্রোশ দূর দিয়ে সোজা অন্য পথ আছে, যে পথে লোক চলাচল করে। সেই পথে কোনো তকলিফ নেই। এখন খোদার মেহেরবানিতে চন্দ্রকূপ পৌঁছতে পারলে হয়।"

বললাম, "কিন্তু না খেয়ে উটেরা কদিন চলবে?"

দিলমহম্মদ বললে, "শুধু জল খেয়ে দু-তিন দিনও ওরা চলতে পারে। তবে ভয়ানক কমজোর হয়ে পড়বে। এমনও হয়, এই সব জায়গায় উট খেপে ওঠে। তখন তাদের সামলানো যায় না। সওয়ার উট সব একসঙ্গে মারা পড়ে। দেখছেন তো কোনো দিকে কোনও নিশানা নেই। এখানে উট যদি পথ ঠিক করে না চলে তবে আর উপায় নেই। সবই নসিব, সবই নসিব।"

এই বলে সে নিজের কপালটা দুবার চাপড়ালে। নসিবই বটে। নসিবে না থাকলে খামকা আমরা এখানে মরতে আসব কেন? নসিবই যদি না পুড়বে তবে এভাবে উপর-ভিতর পুড়ে অঙ্গার হচ্ছে কেন? নসিবই সব, নসিবই এভাবে নাকে দড়ি বেঁধে ঘুরিয়ে মারছে; আর ঘুরে ঘুরে নসিবের হুকুম যদি পালন না করি তবে আছে নসিবের হাতে চকচকে টাঙ্গি, তখন নসিব সেই টাঙ্গি দিয়ে দু-আধখানা করে ছাড়বে।

সামনের বড় উটটার কাছে কি হল? ওরা সবাই থামল। ওদের কাছে পৌঁছে দেখি মণিরাম তপ্ত বালুর উপর শুয়ে পড়েছে। জ্বরে একেবারে বেহুঁশ।

তার মাথায় একখানা ভিজে গামছা জাড়ানো হল। ভৈরবী নামলেন। উর্বশীর উপর তাকে তুলে দিয়ে খাঁটিয়ার সঙ্গে বেঁধে দেওয়া হল। আমাদের যে এগিয়ে যেতেই হবে।

এগিয়ে যেতেই হবে, এগিয়ে যেতেই হবে। মরুভূমি হোক, পাহাড় হোক, জঙ্গল হোক, সারা জীবনভোর শুধু আগুবাড়ি, চলা। থামবার উপায় নেই। থামা মানে একেবারে চরম থামা, তার মানে শেষ বিরতি।

এগিয়েই চললাম।

রূপলাল বললে, "আজ আর কাল এই দুটো দিন এইভাবে চলবে। তারপর আমরা চন্দ্রকূপ এলাকায় গিয়ে পৌঁছব। সেখানে পাহাড়, পর্বতের আড়ালে-অন্তত দিনের বেলাটা পড়ে থাকা যাবে।"

পোপটলাল জিজ্ঞাসা করলেন, "আজ রাতে যেখানে গিয়ে পৌঁছব সেখানে কি কোনো ছায়া মিলবে না, যেখানে কাল দিনের বেলাটা পড়ে থাকা যায়?"

রূপলাল জবাব দিলে, "শয়তানের ছায়া মিলতে পারে। সহৈ ছায়ায় আরাম করে বালির উপর পড়ে শুকিয়ে মরতে পারা যাবে।"

দিলমহম্মদ বললে, "সবসে আচ্ছা হয় সামনের কুয়োর ধারে পৌঁছে ঘণ্টা দুই আরাম করে আবার এই রাতে চলা। তাহলে কাল রোদ চড়বার আগেই আমরা পাহাড় মুল্লুকে গিয়ে পড়তে পারি। কিন্তু তা কি আর হবে, এতক্ষণ হাঁটতে পারবে কে?"

রূপলাল বললে, "দু-দুটো রুগি সঙ্গে। একটা ছায়া না পেলে কাল দিনের বেলা ওদের রাখা যাবে কোথায়? সামনে এগিয়ে যেতেই হবে আজ রাতে।'

কুন্তী হাঁটছিল ভৈরবীর কাঁধে ভর রেখে, ভৈরবী বললেন, "এ মেয়েটাকেও হারাতে হবে, ওর আর চলবার শক্তি বিন্দুমাত্র নেই।"

আর কোনও কথা কেউ বললে না। আগে তো আজকের মত সন্ধ্যা হোক। ওই চণ্ডাল সূর্যটা বিদায় হোক ওর পোড়ারমুখ নিয়ে। তখন দেখা যাবে কি করা যায়। আসুক একটা এমন রাত্রি যে রাত্রি আর কখনো পোয়াবে না, কখনও পথ ছেড়ে দেবে না প্রভাতকে। তাহলে আর ওই সূর্যটা কখনো আসতে পারবে না আমাদের মাথা খেতে, আমাদের রক্ত শুষতে।

অবশেষে গেলেন তিনি। গেলেন সেই নির্মম রক্তশোষক, রক্তচক্ষু, রক্তাম্বর মার্তণ্ডদেব। আমাদের ঘাড়ের উপরের মাথাগুলি জলশূন্য ঝুনা নারিকেল করে দিয়ে গেলেন তিনি, একেবারে শাঁসশূন্যও করে গেলেন কিনা কে বলতে পারে। তবে গেলেন যে এই যথেষ্ট। আমরা চোখে চেয়ে বাঁচলাম।

নেমে এল সন্ধ্যা। আমাদের এপিঠ ওপিঠ দু-পিঠই ভাজা হয়ে গেছে দেখে তার দয়া হল। নিবিড় মমতায় হাত বুলিয়ে দিলে আমাদের গায়ে মাথায়। বহুকাল পরে মায়ের হাতের পরশ পেলাম। অকারণে পোড়া চোখ দুটি সজল হয়ে উঠল।

ঠান্ডা হয়ে এল বালুর মেজাজ, তবু সহজে কি তার তেজ কমে!

সন্ধ্যার দিদি রাত্রি এসে পৌঁছলেন অবশেষে। বড় বিলম্ব করে এলেন তিনি। আমাদের ধৈর্যের শেষ সীমা পার হয়ে গেছে অনেকক্ষণ তাঁর অপেক্ষায়। সব জ্বালা যন্ত্রণা, সমস্ত দুঃখ তিনি নিমিষে হরণ করে নিলেন তাঁর নিবিড় কালো চোখের করুণার ধারা ঢেলে দিয়ে। কানে কানে বলতে লাগলেন, আর ভয় কি? আমি তো এসে পড়েছি, আমার আঁচলের তলায় লুকিয়ে নিয়ে তোমাদের পার করে দিচ্ছি এই ভয়ঙ্কর মরুভূমি। ভুলে যাও সব জ্বালা-যন্ত্রণা, বুকে সাহস আনো, মুখে হাসি ফোঁটাও। ভেঙে পড়লে চলবে কেন? হিংলাজ যে এখনও বহু দূর।"

ছড়িওয়ালা রূপলাল চিৎকার করে উঠল, "শ্রীহিংলাজ দেবী কি—"

আমাদের সাধ্যে যত দূর কুলোল উচ্চকণ্ঠে সাড়া দিলাম, "জয়!"

জয়াশঙ্করের শিষ্যসেবকেরা আর পারে না তাদের গুরুদেবকে বয়ে নিয়ে যেতে। তাদের কাছ থেকেই প্রথম প্রস্তাব উঠল, "এবার থামতে হবে।" একেবারে নেতিয়ে পড়েছেন

জয়াশঙ্করজি। সমস্ত দেহ থেকে প্রাণের আগুনটা পালিয়ে এসে জমা হয়েছে তাঁর চক্ষু দুটিতে। মুখ দিয়ে কথা সারছে না, কেবলমাত্র জ্বলন্ত চক্ষু দুটি দিয়ে সবাইয়ের মুখের উপর তিনি তাকাচ্ছেন। যেন ইচ্ছা করলে আমরা এমন একটা কিছু করতে পারি যাতে তাঁর যন্ত্রণার লাঘব হয়, তাঁর জীবনটা রক্ষা পায়।

তাঁর চোখের সেই দৃষ্টি আজও যেন দেখতে পাই। মানুষ কি অসহায় হয়ে পড়ে বিদায়ের পূর্ব মুহূর্তে! আর কতদূর শোচনীয় অবস্থায় পড়েছিলাম আমরা সেদিন তাঁর সেই মূক দৃষ্টির দিকে চেয়ে! কিছুই করবার ছিল না আমাদের, কেবল নিজেদের গায়ের মাংস দাঁত দিয়ে ছেঁড়া ছাড়া আর কোনো উপায়ই আমরা খুঁজে পাচ্ছিলাম না। আমাদের প্রত্যেকের বাকরোধ হয়ে গেছে তখন, তাঁর জন্য কিছু একটা না করতে পারলে তীব্র অনুশোচনায় আমরা তিলে তিলে দগ্ধে মরছি। যা হবার তা হবেই এটুকু বুঝতে আর বাকি নেই কারও। এখন সকলেরই একান্ত কামনা-একটা কোথাও পৌঁছে তবে যেন কিছু হয়। এভাবে এখানে তাঁর দেহটাকে যেন ফেলে যেতে না হয় আমাদের। কোনো একটা আশ্রয়স্থানে পৌঁছে তবে যেন সেই চরম ক্ষণটি উপস্থিত হয়।

অনুনয় করে রূপলাল বোঝাতে লাগল সকলকে, এ সময় এ জায়গায় কোনো মতেই থাকা উচিত নয়। এগিয়ে চলো, এগিয়ে চলো সামনের কুয়োর ধারে। যেভাবে হোক সেখানে পৌঁছতেই হবে, নয়তো একবিন্দু জল না পেয়ে মরতে হবে সকলকে। মনে বিশ্বাস রেখে এগিয়ে চলো সবাই। মা হিংলাজের কৃপায় ওখানে পৌঁছে একটা কিছু উপায় হবেই। পুরো একটা দিন আমরা পড়ে থাকব সেই কুয়োর ধারে। তখন পাণ্ডেজি নিশ্চয়ই সামলে উঠবেন, দয়া করে আর একটু কষ্ট করে চল নিয়ে ওঁকে সামনের কুয়োর কাছে।

কে নিয়ে যাবে পাণ্ডেজিকে বয়ে? চব্বিশ ঘণ্টা হতে চলল সকলের পেট খালি, সকলেরই প্রাণ কণ্ঠাগত। সবাই মাথা নিচু করে রইল।

কোথা থেকে থিরুমল উদয় হল। এতক্ষণ তার কথা আমরা ভুলেই গিয়েছিলাম। জয়াশঙ্করের কাছে এসে সে পিঠ পেতে দাঁড়াল। বললে, "দাও ওঁকে আমার পিঠের উপর বসিয়ে একখানা চাদর দিয়ে আমার বুকের সঙ্গে বেঁধে। আমি নিয়ে যাচ্ছি পিঠে করে।"

সকলে স্তম্ভিত। এ বলে কি! জয়াশঙ্কর হাল্কা মানুষ নন, থিরুমলের চেয়ে মাথায় কিছুটা বড়ই হবেন তিনি। থিরুমলও এমন কিছু পালোয়ান নয়। মাথা খারাপ আর কাকে বলে-ও বয়ে নিয়ে যাবে পাণ্ডেজিকে সকলকে ইতস্তত করতে দেখে থিরুমল চটে উঠল। বললে, "আমি ইয়ারকি করছি না। এভাবে মানুষ বয়ে বেড়ানো আমার অভ্যাস আছে। প্রথম মা-বাপ যখন আমাকে তাড়িয়ে দেয় তখন যিনি আমাকে আশ্রয় দেন তাঁর বিমার হলে পর অনেকদিন তাঁকে পিঠে করে বয়ে নিয়ে বেড়িয়েছি। তখন তো আমি খুবই ছেলে মানুষ, আর এখন পারব না এঁকে বয়ে নিয়ে যেতে! বেঁধে দাও তোমরা, আর দেরি কোরো না।"

কুন্তী কি বলতে গেল থিরুমলকে। কোনও ফল হল না। একটা প্রচণ্ড ধমক খেয়ে ফিরে এল।

শেষ পর্যন্ত তাই করা হল। একখানা মোটা চাদর দিয়ে জয়াশঙ্করকে থিরুমলের পিঠে বেঁধে দেওয়া হল। দু হাত দিয়ে পিছন থেকে থিরুমলের গলাটা জড়িয়ে ধরে ওর কোমরের দু-পাশ দিয়ে দুই পা বাড়িয়ে বসে রইলেন জয়াশঙ্কর। একখানা লাঠি একজনের হাত থেকে টেনে নিলে থিরুমল। আবার আমরা অগ্রসর হলাম।

দলের একেবারে সামনে গুলমহম্মদ বিড়বিড় করে যেন কোনো মন্ত্র আওড়াতে আওড়াতে চলেছে। অন্য সকলেই সম্পূর্ণ নির্বাক।

ভৈরবী হাঁটছেন। কুন্তীর একখানা হাত ধরে বেশ ভাল ভাবেই হাঁটছেন তিনি। সন্ধ্যার পর থেকে কুন্তীও আর কারও কাঁধে ভর রেখে হাঁটছে না।

ঊর্বশীর পিঠে খাঁটিয়ার উপর মণিরাম একটু জল চাইলে। ঊর্বশীকে বসিয়ে তাকে জল খাওয়ানো হল। সামনের ওরা আরও এগিয়ে গেল। তা যাক, নয়তো থিরুমলকে থামতে হয়। ঊর্বশী তার মাকে ঠিক ধরবে গিয়ে। মণিরামের জ্বর কমে আসছে, তবে এখনও তার সম্পূর্ণ

হুঁশ আসেনি।

ভৈরবীকে হাঁটতে হচ্ছে মণিরামের জন্য। মণিরাম পোপটলালের লোক, সেজন্যে পোপটলাল মহা আফসোস জুড়ে দিলেন এবং ভৈরবীর কাছ থেকে ধমক খেয়ে তবে থামলেন।

ভৈরবী বললেন, "আপনি থামুন তো বাবা দয়া করে। এখন ভালয় ভালয় সকলে পৌঁছতে পারলে বাঁচি। তা আমি হেঁটেই পারি আর গড়িয়ে গিয়েই পারি তাতে আমার কোনো দুঃখ নেই।"

ঠিক—এখন পৌঁছনোটাই সব চেয়ে বড় কথা। কে হাঁটছে, কে গড়াচ্ছে, পিঠে চড়ে চলেছে কে—এ সমস্তর বিচারের এখন ফুরসত কোথায়? কোনোক্রমে একটা কোথাও পৌঁছে আজকের মতো এই যাত্রার বিরতিই হচ্ছে এখন প্রধান লক্ষ্য।

অনেকক্ষণ স্বস্থানে প্রস্থান করেছেন সূর্যদেব। আমাদের উপরের জ্বালা জুড়িয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে আরম্ভ হয়েছে তার এক তাগিদ। বাইরে আগুন নিভেছে, ভিতরের আগুন জ্বলে উঠেছে। সব চেয়ে চরম সত্য যা এই দুনিয়ায়, সেই আগুন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে সকলের উদরের মধ্যে। ন্যায়-অন্যায় আচার-অনাচার সব একসঙ্গে ভস্মীভূত হয় যে আগুনের টানে সেই আগুন-যা সঙ্গে নিয়েই আমরা পৃথিবীতে ভূমিষ্ঠ হই– সেই আগুন ভিতর থেকে বলছে, "ম্যয় ভুখা হুঁ।" কিছু না কিছু এখন পাঠাতেই হবে ভিতরে, নয়তো নিস্তার নেই। অল্পবিস্তর সকলেই চঞ্চল হয়ে উঠেছে। অনেকে আবার ইতিমধ্যে ডালপালা যা পায়ে ঠেকছে তা কুড়াতে শুরু করেছে, সামনে কুয়োর ধারে পৌঁছে রুটি পোড়ানো হবে।"

শ্রীমান সুখলালের দু-পাশের দুই পকেট খেজুর দিয়ে ভৈরবী বোঝাই করে দিয়েছিলেন। অনেকক্ষণ আগেই সেগুলো নিঃশেষ হয়েছে। ভৈরবীর পাশে চলতে চলতে ছেলেটা চুপিচুপি পরামর্শ জুড়ে দিলে, ওখানে পৌঁছে রাত্রে কি কি রান্না হবে।

রূপলালকে ডেকে জিজ্ঞাসা করলাম, "যেখানে যাচ্ছি সেখানে রান্না করবার কাঠ পাওয়া যাবে তো?"

রূপলাল বিরক্ত হয়ে উত্তর দিলে, "খেপেছেন আপনি? কে আমাদের জন্যে সেখানে কাঠ নিয়ে বসে থাকবে? এই বালুর রাজত্বে কাঠ কোথায়? আজও আটা আর গুড় গুলে খেয়ে কাটাতে হবে।"

দিলমহম্মদ বললে, "সেই জন্যেই তো বলছি, ঘণ্টা দুই ওখানে আরাম করে জলটল ভরে নিয়ে আবার হাঁটাই ভালো। রাতে রাতে যতদূর যাওয়া যায়....

কুন্তী খিঁচিয়ে উঠল, "তাহলে সারারাত একজন একজনকে পিঠে করে চলবে নাকি?"

তা কখনো সম্ভব নয়। মহা অপ্রস্তুত হয়ে দিলমহম্মদ বার বার দুঃখ জানাতে লাগল।

তারার আলো পড়েছে বালির উপর, ফলে আয়নায় আলো পড়লে যা হয় তাই হচ্ছে। অন্ধকার অনেক ফিকে হয়ে গেছে। আকাশের তারার আলোয় সম্পূর্ণ উলঙ্গ চকচকে মরুভূমিতে আঁধার জমে না। আমাদের চারিদিকে একটা রহস্যময় আলোর জগৎ, তার মাঝে আমরা ভাসছি। এখানে ছায়া পড়ে না। যারা কায়াহীন তাদের কোথাও ছায়া পড়ে না। এখানে যদিও সশরীরে আমরা চলেছি তবুও আমাদের একবিন্দু ছায়া পড়ছে না কোথাও। এ এক বিচিত্র আজগুবি দুনিয়া!

আরও অনেকক্ষণ কাটল। চুপচাপ সব চলেছি নিজেদের পেটের ক্ষুধা পেটে নিয়ে। হঠাৎ সামনে থেকে কে উৎকট আর্তনাদ করে উঠল, "আঁ-আঁ-আক!"

কে যেন কার কণ্ঠনালী চেপে ধরে শ্বাসরুদ্ধ করে মারছে।

গুলমহম্মদ হায় হায় করে চেঁচিয়ে উঠল। রূপলালও কি সব বলে চেঁচাচ্ছে ওখান থেকে।

দৌড়লাম ওদের দিকে

কি একটা ঘিরে সবাই হুমড়ি খেয়ে পড়েছে। ওদের কাছে গিয়ে পৌঁছবার পূর্বেই ভিড়ের ভিতর থেকে বেরিয়ে এল থিরুমলকে ধরে নিয়ে রূপলাল আর পোপটলাল।

থিরুমলের পা দুটো শূন্যে ঝুলছে, মাথাটা সামনের দিকে ঝুঁকে রয়েছে, মুখটা এসে ঠেকেছে তার নিজের বুকে।

রূপলাল বলে উঠল, " খুন করেছে- গলা টিপে মেরে ফেলেছে একবারে।"

থিরুমলের অসাড় দেহটা ওরা শুইয়ে দিলে আমার সামনে।

কয়েক মুহূর্ত স্তম্ভিত হয় রইলাম। তারপরই দপ করে মাথার মধ্যে আগুন জ্বলে উঠল। ওদের ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিয়ে একলাফে ঢুকলাম সামনের ভিড়ের মধ্যে। সামনে যারা পড়ল তাদের দু-হাত ঠেলে মাঝখানে গিয়ে পৌঁছলাম। উপুড় হয়ে পড়ে আছে একজন, দৃঢ় মুষ্টিতে তার কাঁধ ধরে চিত করে ফেললাম। আমার সর্বশরীরের ভিতর দিয়ে একটা ঠাণ্ডা হিমপ্রবাহ বয়ে গেল। লোকটা মরে একবারে কাঠ হয়ে গেছে। তার দেহটা বরফের মতো ঠাণ্ডা। শ্রীজয়াশঙ্কর মুরারজি পাণ্ডে মহাশয় আর নেই। তাঁর দিকে চেয়ে আমিও কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

বহুক্ষণ পূর্বেই প্রাণটা তাঁর বেরিয়ে গেছে। শেষ সময়ও থিরুমলের গলা জড়িয়ে ধরে ছিলেন তিনি। ক্রমে তাঁর দেহ শক্ত হতে থাকে, হাতের বাঁধনও থিরুমলের গলা চেপে বসতে থাকে। শেষ পর্যন্ত যখন থিরুমল শ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম হয় তখন সে প্রকৃত ব্যাপারটা বুঝতে পারে। একটা মরা মানুষ পিঠের উপর গলা জড়িয়ে ধরে বসে আছে এটুকু বুঝতে পেরেই সে ভয়ে আর্তনাদ করে ওঠে আর প্রাণপণে নিজের গলাটা ছাড়াবার চেষ্টা করে। কিন্তু মড়ার হাত ছোঁড়ানো অত সহজ নয়। প্রাণহীন জয়াশঙ্করকে পিঠে নিয়ে থিরুমল হুমড়ি খেয়ে পড়ে জ্ঞান হারায়।

টানটানি করে জয়াশঙ্করের কবল থেকে যখন থিরুমলকে ওরা উদ্ধার করলে তখন সেও মৃতপ্রায়।

যাক– যে গেছে সে ত গেছেই, এখন আর একজন না গেলে হয়। থিরুমলের মুখে মাথায় জলের ছিটা দিচ্ছেন ভৈরবী। হাহাকার করে কাঁদছে কুন্তী, নিজের কপাল চাপড়াচ্ছে, চুল ছিঁড়ছে।

কে কাকে সান্ত্বনা দেবে, খুঁজেই বা পাবে কোথায় সান্ত্বনার ভাষা!

উটেদের পিঠ থেকে বোঝা গুলি নামিয়ে তাদের রেহাই দেওয়া হল। একটা মৃত আর একটা অর্ধমৃতকে ঘিরে আমরা সেখানে বসলাম।

হিংলাজ তখনও বহুদূর।

সঙ্গের সব-কটা আলো জ্বালানো হল। হাত দিয়ে বালি সরিয়ে, থালা দিয়ে বালি খুঁড়ে একটা গর্ত করা হল। যে নূতন কাপড়খানি পরে জয়াশঙ্করজি হিংলাজ দর্শন করতেন সেইখানি দিয়ে তাঁর সর্বাঙ্গ ঢেকে দেওয়া হল। তারপর সেই বালির গর্তের মাঝে তাঁকে শুইয়ে দেওয়া হল।

ব্রাহ্মণ জয়াশঙ্করজির অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার উপযুক্ত শাস্ত্রীয় আচার কিছুই পালন হল না। হল না মন্ত্রপাঠ, হল না পিণ্ডদান। তাঁর উপযুক্ত সন্তানেরা কত দূরে, আর তিনি কোথায়! তাঁর নবপরিণীতা স্ত্রী তাঁর পথ চেয়ে বসে আছে, তিনি ঘরে ফিরবেন মা হিংলাজের প্রসাদী নিয়ে, আর্শীবাদী নিয়ে, ফিরে পুনরায় গৃহ-সংসার করবেন পরম শান্তিতে– সব আশা শেষ হয়ে গেল!

খুঁতখুঁতে মন ছিল জয়াশঙ্করজির। যেখানে তিনি গিয়েছেন সেখান থেকে তাঁর অপদার্থ সহযাত্রীদের ক্রিয়াকলাপ দেখে হয়তো আরও বিরক্তই হচ্ছেন। এ সময় যা যা হওয়া উচিত ছিল তার কিছুই করতে পারলাম না। এমনকি তাঁর দেহটা আগুনের বুকে তুলে দেওয়াও আমাদের সামর্থ্যে কুলোল না। কোনো কর্মের লেশমাত্র অঙ্গহানি ছিল তাঁর অসহ্য, আর তাঁর শেষকৃত্যটুকু যেভাবে আমরা করলাম তার আগাগোড়াই অঙ্গহীন ব্যাপার। কিন্তু তখন তাঁকে ওইভাবে সেখানে শুইয়ে রেখে যেতে আমাদের অন্তরের অন্তস্তলে যে তীব্র মোচড় দিতে লাগল তা যদি তিনি সেখান থেকে টের পেয়ে থাকেন তবে নিশ্চয় আমাদের সকল অপরাধ ভুলে, তাঁর হতভাগ্য সহযাত্রীদের ব্যথায় তিনি নিজেই আকুল হয়ে উঠেছিলেন। সেই গভীর

নিশীথে যে মূক মন্ত্র আমাদের হৃদয়ের মধ্যে গুমরে গুমরে উচ্চারিত হয়েছিল হয়তো সেগুলি শাস্ত্রমতে শুদ্ধ ছিল না, কিন্তু তার চেয়ে সজীব মন্ত্র কোনো পাঁজি-পুঁথিতে কোনও কালে লেখা হয়নি।

আপন আপন কুঁজো থেকে সকলে জল দিলে জয়াশঙ্করের সমাধির উপর। তাঁর নিজের কুঁজোটি পরিপূর্ণ করে রেখে দেওয়া হল তাঁর মাথার কাছে। আটা আর গুড় সকলেই কিছু কিছু করে দিলে। ভৈরবী দিলেন তাঁর কিশমিশ আখরোট মিছরি বাদাম। সমস্ত ভোজ্য একখানা নূতন গামছায় বেঁধে রেখে দেওয়া হল তাঁর কুঁজোর পাশে। তারপর হাত দিয়ে ঠেলে ঠেলে বালি ফেলে আমরা জয়াশঙ্করজিকে চাপা দিয়ে দিলাম।

সাক্ষী রইল আকাশ, সাক্ষী রইল বাতাস, সাক্ষী রইল ওই ওপরের তারাগুলি আর নীচের এই দিগন্তবিস্তৃত বালুকা। আমরা আমাদের জ্ঞান বুদ্ধি বিচার মতো যথাসাধ্য করে আমাদের প্রিয়তম সহযাত্রীকে ফেলে রেখে যেতে বাধ্য হচ্ছি। আমাদের আর কীই-বা করবার আছে? কেউ জানে না, কেউ বলতে পারে না, সামনে এগিয়ে যেতে যেতে আমাদের মধ্যে আর কতজনকে এইভাবে চিরবিশ্রাম নিতে হবে, এই বালির বুকে শুয়ে পড়ে।

এবার সেই সময় উপস্থিত হল, যখন পাণ্ডেজিকে ছেড়ে আমাদের চলে যেতে হবে। অনেকেই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল। ছেলেমানুষের মতো হাঁউমাউ করে কেঁদে উঠল গুলমহম্মদ। শেস সময় সে বললে, "দোস্ত, তোমাকে ফিরিয়ে দিয়ে আসতে পারলাম না তোমার মুল্লুকে, খোদা তোমায় নিজের কোলে টেনে নিলেন। তুমি নিশ্চয়ই তাঁর মেহেরবানিতে শান্তি পাবে। কিন্তু এই আফসোস আমার আর ইহজন্মে ঘুচবে না।"

কেবলমাত্র নির্বিকার থিরুমল হা-হা করে হাসতে লাগল। অনেকক্ষণ পরে চোখ চেয়ে উঠে বসল যখন আবার, তখন থিরুমল আর আমাদের চিনতেই পারল না। হতভাগাটার মাথার মধ্যে আবার জট পাকিয়ে গেছে।

মণিরাম বললে, "এবার আমি হাঁটতে পারব।" সে আর উটের উপর কিছুতেই গেল না। আবার ভৈরবী উঠলেন উর্বশীর পিঠে। আমি চললাম থিরুমলকে ধরে নিয়ে। অন্য সকলে, এমনকি কুন্তী পর্যন্ত তাকে ভয় করতে শুরু করেছে।

রাত্রি বিদায় নিচ্ছে। বিষাদিনী রাত্রি কেঁদে বিদায় নিচ্ছে। আমরা কুয়োর ধারে পৌঁছে আর কিছুমাত্র বিলম্ব না করে কোনো কিছু না বিছিয়েই শুয়ে পড়লাম। আমার পাশে শুয়ে অকাতরে ঘুমোতে লাগল থিরুমল। খাওয়া-দাওয়ার কথা আর কারও মনের কোণেও এল না।

ডান হাতখানা চোখের উপর চাপা দিয়ে চিত হয়ে শুয়ে আছি। সহজে কিছুতেই খুলছি না চোখ আজ। চোখ খুললেই তো দেখতে হবে আবার সগৌরবে সমুপস্থিত হয়েছেন সূর্যদেব, কিংবা উঠি-উঠি করছেন পূর্বদিকে। তার চেয়ে চোখ বুজে যতটা সময় পার করে দেওয়া যায়। নিত্য ঠিক সময় ঠিক জায়গায় হাজির দেওয়া কর্মটি থেকে অন্তত একটি দিন কি করে সূর্যদেবকে কামাই করানো যায়—চোখ বুজে শুয়ে তার একটা উপায় ঠাওরাতে লাগলাম।

মনে পড়ে গেল ঋগ্বেদের কয়েকটি শ্লোক। অতি মারাত্মক জাতের সংস্কৃত মন্ত্র। ব্রহ্মা সূর্যদেবকে স্বাগত জানাচ্ছেন—

বিভ্রাড় বৃহৎ সুভৃতং বাজ সাতমং ধর্মান্দিবোধরুণে সত্যমর্পিতং।
অমিত্রহা বৃত্রহা দস্যুহংতমং জ্যোতির্জজ্ঞে অসুরহা সপত্নহা।
—ঋগ্বেদ, ১০ মণ্ডল, ১৭০ সূক্ত

সূর্যদেবের গুণগান করছেন ব্রহ্মা। বলছেন-"সূর্যস্বরূপ আলোকময় পদার্থের উদয় হইতেছে।

ইহা প্রকাণ্ড, অতি দীপ্তিশালী, উত্তমরূপে সংস্থাপিত। ইহার মতো অন্নদান কেহ করে না, ইহা আকাশের অবলম্বনের উপর যথাযোগ্যরূপে সংস্থাপিত হইয়া আকাশকে আশ্রয় করিয়া আছে। ইহা শত্রুনিধন করে, বৃত্রকে বধ করে, দস্যুদিগের প্রধান নিধনকারী, অসুরদিগের

বধকারী, বিপক্ষদিগের সংহারকারী।”

তারপর আরও অনেক কঠোর কঠোর শ্লোকে আবাহনের পালা সাঙ্গ করে ব্রহ্মা স্তব আরম্ভ করলেন সবিতা দেবতার—

বিশ্বানিদের সবিতর্দুরিতানি পরাসুব। যদ্ভদ্রং তন্ন আসুব ৷

—ঋগ্বেদ, ৫ মণ্ডল, ৮২ সূক্ত

—'হে দেব সবিতা, তুমি আমাদিগের সমস্ত দুর্ভাগ্য দূর করো এবং যাহা কল্যাণকর তাহা আমাদিগের অভিমুখে প্রেরণ করো।'

এ সমস্ত ব্যাপার বহুকাল পূর্বে ঘটিয়াছিল। সে যে কতকাল হয়ে গেল তার হিসেব দেওয়াও যায় না। ঋগ্বেদ হালফিল লেখা হয়নি। তারপর কালে কালে সবই গেছে পালটে, এসেছে আমাদের এই কাল। ঋগ্বেদ যাঁরা লিখেছিলেন তাঁদের বদলে এখন জগৎ জুড়ে আমরা রয়েছি, দুনিয়ার সমস্ত কিছু বদলেছে, সঙ্গে সঙ্গে আদিত্যদেবের স্বভাব-চরিত্রেরও যে ঘোরতর পরিবর্তন হয়েছে এ কথা বলাই বাহুল্য। ব্রহ্মা বলেছিলেন- 'তুমি আমাদের দুর্ভাগ্য দূর করো এবং যাহা কল্যাণকর তাহা আমাদিগের অভিমুখে প্রেরণ করো!'

হায়, তখন তিনি কল্পনাও করতে পারেননি যে একমাত্র জ্বলিয়ে পুড়িয়ে খাক করা ভিন্ন ভবিষ্যতে আর কোনো সামর্থ্য থাকবে না সূর্যিঠাকুরের। আর এই সৎকর্মটি সুসম্পন্ন করবার জন্যে তাঁকে আবাহন করে ডেকে আনবারও প্রয়োজন হবে না কারও। যথাসময়ে যথাস্থানে উদয় হয়ে সামনে তিনি অনল উদ্‌গিরণ করতে থাকবেন। আবাহন বিসর্জন এ সব কোনো কিছুরই ধার ধারবেন না তিনি। বিশুদ্ধ বিসর্জনের মন্ত্র আউরে বা অন্য কোনো উপায়েই তাঁকে তাঁর এই প্রাত্যহিক ভয়াবহ কর্তব্য পালন করা থেকে তিলমাত্র নড়ানো যাবে না।

সৃষ্টিকর্তাকে যদি আমাদের সঙ্গে হিংলাজের পথে পড়ে থাকতে হত তাহলে নিশ্চয়ই তিনি আকুল আক্ষেপ জুড়ে দিতেন একদা ওইইনির্দয় মার্তণ্ডদেবকে খোশামুদি করেছিলেন বলে। খোশামুদি করার ফল কি ভীষণ—তাঁর সৃষ্ট এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডখানাকে একেবারে পুড়িয়ে ছাই না করে কিছুতেই ছাড়বে না তপন দেবতা। আদর করে আবাহন করার দাম ষোল আনা দিয়ে তবে ছাড়বে।

হাতের লাঠিগুলো বালির মধ্যে পুঁতে কাপড় কম্বল সব টাঙানো হচ্ছে। হোক—সকলে শেষ চেষ্টা করে দেখুক যদি বাঁচবার কোনো একটা উপায় কেউ বার করতে পারে মাথা থেকে। এইভাবে কাপড় কম্বল খাঁটিয়ে কোনো উপকারই যে হবে না এটুকু বেশ বুঝছি এবং অন্য সকলেও যে না বুঝছে তা নয়। কিছুতেই এখানে রোখা যাবে না ভানুর রোখ। ওই সব টাঙিয়ে হয়তো মাথার ওপর একটু ছায়া মিলবে কিন্তু বালির রোষ থেকে বাঁচবার উপায় কি? একটু পরেই এমন তাতা তাতবে বালি যে, ধান দিলে সঙ্গে সঙ্গে খই হয়ে ফুটে উঠবে চড়বড় করে। তখন? তখন আমরা যাব কোথায়? কিসের উপর পা রাখব? জ্যান্ত কইমাছদের উনুনের উপর ফুটন্ত তেলের কড়াতে ছেড়ে দিয়ে আর তার উপর ছাতা খুলে ধরলে যদি সেই মাছগুলোর দগ্ধানির কিছুটা লাঘব হবার সম্ভাবনা থাকে তবে এভাবে এখানে কাপড় কম্বল টাঙিয়ে আমাদেরও যন্ত্রণার উপশম হতে পারে। সুতরাং ওই কাপড় কম্বল টাঙানোর ব্যাপারে মাতবার প্রবৃত্তি হল না। একধারে চুপ করে বসে চোখ মেলে সমস্ত দেখতে লাগলাম।

সকলেই ব্যস্ত হয়ে উঠেছে। কেউ কাঠ খুঁজছে রুটি পোড়াবার জন্যে, কেউ চারিদিকে ঘুরে দেখছে কাছে-পিঠে কোথাও কোনো রকম ছায়া আছে কি না, কেউ কুয়োর মধ্যে নেমে বালি খুঁড়ছে জলের আশায়। বাকি সকলে টাঙাচ্ছে কাপড় কম্বল।

এখানকার কুয়ো বলে যে গর্তটাকে দেখানো হল তাতে জল দাঁড়ায় না। গর্তটির মধ্যে নেমে থালা দিয়ে বালি সরিয়ে অসীম ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে হবে। একটু একটু করে জল জমবে, সঙ্গে সঙ্গে সেই জলটুকু তুলে নিয়ে কুঁজো ভরতি করা চাই। নয়তো ঝুর ঝুর করে চারিদিকের বালি পড়ে আবার জলটুকু অদৃশ্য হয়ে যাবে। জলওয়ালা বা এই কুয়ের রক্ষক কাকেও খুঁজে পাওয়া গেল না এখানে কোথাও।

সন্ধ্যা পর্যন্ত খালি পেটে এই কুয়োর ধারে পড়ে থাকা আমাদের ললাটের লিখন। দিনের

বেলা হাঁটবার সাহস কারও প্রাণে নেই। যা হয় হোক, এখানে পড়ে থেকেই হোক। অন্তত জলের ধারে কো পড়ে আছি-এইটুকুও কি কম সান্ত্বনা!

সকাল থেকে সকলের কুঁজো ভরতেই আদিত্য ভগবান মাথার উপর এসে পৌঁছে গেলেন। তারপর উটেদের জল খাওয়ানোর পালা। চারবার জন্যে ওদের কোথাও নিয়ে যাওয়া হল না। যাবে কোথায়? বালি বালি বালি, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম-যতদূর দৃষ্টি যায়-ঝকঝকে তকতকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন শুভ্র পবিত্র বালি চকচকে অগুনতি দাঁত বার করে আমাদের দুর্দশা দেখে মহাস্ফূর্তিতে হেসেছে। উট দুটি ঠায় বসে গাল নাড়াতে লাগর, যেন কোনো অদৃশ্য খাদ্য চর্বণ করে চলেছে।

শেষে ওদের জল খাওয়ানো হল। সময় লাগল দু-ঘণ্টার ওপর। গুলমহম্মদ আর তার ছেলে থালায় করে একটু একটু জল তুলে প্রথম ওদের দুটো ছাগলের চামড়ার থলে বোঝাই করলে। শেষে উটের মুখের সামনে বালতি বসিয়ে ধীরে ধীরে জল ঢেলে দিলে। আগে ঊর্বশী, তারপর তার মা বালতিতে মুখ জুবড়ে জল শুষতে লাগল। ব্যস–ওই পর্যন্ত, আর দাঁতে কাটবার কুটোটি জুটল না।

আমরা অবশ্য সকলেই দাঁতে কিছু কাটলাম। আবার সেই চীনাবাদাম আর সেই খেজুরের পিণ্ডি-সঙ্গে লবণ ও কাঁচা পেঁয়াজ। এক বস্তা বাদাম আর এক বস্তা খেজুরের কতটুকুই বা খরচ হয়েছে এ পর্যন্ত। অক্লেশে সবাইকে এক এক মুঠো দিলেন ভৈরবী। কিন্তু কাঁচা চীনাবাদাম চিবুনী কি চাট্টিখানি কথা! ভাজা বা পোড়ানো অনায়াসে চিবোনও যায় আর তা গিলে পেটেও রাখা যায়। তবুও যা হোক কিছু উদরস্থ হল। তারপর জল দিয়ে উদরের বাকি জায়গাটুকু বোঝাই করা গেল। আটা জলে গুলে গুড় মিশিয়ে আজ আর কেউ খেলে না। দু-একজন জলে আটা আর গুড় গুলেও মুখে দিতে পারলে না। উটদের মুখের সামনে নামিয়ে দিয়ে এল। ওরাও মুখ ছোঁয়ালে না। খাবে কি-ওদের চোখেও ত্রাস ফুটে উঠেছে।

ঠিক ত্রাস না হলেও সকলেরই চোখেমুখে একটা কালো ছায়া পড়েছে। জয়াশঙ্কর গেছেন, সঙ্গে নিয়ে গেছেন আমাদের মনের বলটুকু। তীর্থদর্শনের উদ্যম উৎসাহ কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে, মনে দেহে কোথাও তার ছিটেফোঁটাও এখন খুঁজলে মিলবে না। ভালো কথা ভালো ভাবে ভাবাও যাচ্ছে না। বার বার নজর গিয়ে পড়েছে মণিরামের দিকে।

রোদ চড়বার সঙ্গে সঙ্গে মণিরামের জ্বরও চড়তে লাগল। তাকে খাঁটিয়ার উপর শুইয়ে খাঁটিয়ার পায়াগুলোর সঙ্গে চারটি লাঠি বেঁধে উপরে একখানা কম্বল খাটানো হল। অন্তত নীচের তাপ থেকে তো রক্ষা পাক। প্রথম কিছুক্ষণ ছটফট করলে মণিরাম, তারপর নির্জীব হয়ে পড়ে রইল।

কাঁচা বাদাম খেজুর আর পেট ভরে জল খেয়ে দু-তিনজন বমি করতে শুরু করলে। থিরুমলকে এক ফোঁটা জলও গেলানো গেল না। ওর মুখ দেখে মনে হচ্ছে যে, ও ভয়ানক একটা চিন্তায় পড়েছে।

এবার সেই মারাত্মক লগ্নটি উপস্থিত হল। ভগবান ভাস্কর ধীরে-সুস্থে এগিয়ে এসে আমাদের মাথার উপর গ্যাঁট হয়ে বসলেন। বসে মনে মনে বললেন- “দেখি এবার তোরা যাস কোথা!”

সকলের সব রকম আলাপ-আলোচনা বন্ধ হয়ে গেল। কারও মুখে আর টু শব্দটি নেই। কেউ ওঠে কেউ বসে-কেউ আবার ও কম্বলের নীচে গিয়ে দাঁড়ায়। কেউ বা খানিক লাফিয়ে লাফিয়ে হেঁটে বেড়ায়। হু হু করে ঝড় বইতে লাগল। রাশি রাশি তপ্ত বালি সাঁই সাঁই করে উড়ে পশ্চিম থেকে পুবে পালাচ্ছে। সকলকেই মাথা মুখ সর্বাঙ্গ কাপড় কম্বল দিয়ে ঢেকে ফেলতে হল। এখন আর অন্য কোনো ভাবা চিন্তা মাথায় নেই-কেবল এক চিন্তা, পা রাখবার মতো একটু স্থান চাই জননী ধরিত্রীর উপর। নয়ত শূন্যে ভেসে থাকা যায় এমন কিছু একটা উপায় হওয়া এখনই প্রয়োজন।

এখানে এখন শূন্যে ভেসে থাকাও সম্ভব নয়। নীচ থেকে বালির তাপ উঠে পুড়িয়ে মারবে। তা যদি না হত তাহলে অন্তত একটা পাখিকেও এখানকার আকাশে উড়তে দেখা

যেত। সেই সকাল থেকে একটা কাকপক্ষীও চোখে পড়েনি। সমস্ত আকাশখানা জুড়ে একটা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড ভেসে বেড়াচ্ছে, আর কোনো কিছুর স্থান নেই সেখানে।

গ্রীষ্মকালে বাংলা দেশে প্রাণ আইঢাই করে। সেখানে সে রকমের কিছু করে না। প্রাণ মন আত্মা শরীর, এক কথায় সমস্ত সত্তা জ্বলতে থাকে সেখানে। সে জ্বলুনি ভাসায় প্রকাশ করা অসম্ভব। মাথার খুলি থেকে পায়ের তলা পর্যন্ত কোথাও কোনো সাড়াই থাকে না। বাইরেটা জ্বলছে ভিতরটা জ্বলছে–মনে হচ্ছে যেন ভিতরে দাউ দাউ করে চিতার আগুন জ্বলছে। সেই আগুনের শিষ বেরুচ্ছে নাকমুখ দিয়ে, চোখ দিয়েও।

এক একটি মুহূর্ত মনে হতে লাগল আস্ত এক একটি দিন। নাক মুখ চোখ কান সমস্ত কম্বলে ঢাকা, তার মধ্যে গুনে গুনে শ্বাস টানছি। যখন শ্বাস টানছি ফেলছি তখন অনলের হলকা ভিতরে গিয়ে ঢুকছে, ঢুকে ভিতরটা ঝলসে দিচ্ছে। কিছুক্ষণ দম বন্ধ করে থেকে আবার যখন শ্বাস টানছি তখন চোখ ঠেলে প্রাণটা বেরিয়ে আসবার যোগাড় করছে-কিছুতেই স্বস্তি নেই।

আমার মাথার উপরে রূপলাল একখানা কম্বল টাঙিয়ে দিয়ে গেছে, আর যা কিছু কাপড় চাদর ছিল সঙ্গে সব বিছিয়ে তার উপর চেপে বসে আছি, সেগুলো এত তেতে উঠল যে, ভয় হল দপ করে জ্বলে না ওঠে, ডাইনে বায়ে সামনে পিছনে ওপরে নীচে শত শত চিতা দাউ দাউ করে জ্বলছে। পরিত্রাণ কোথায়?

শুনেছি-সতীদাহের সময় মেয়েদিকে চিতার উপর বাঁশ দিয়ে চেপে ধরে থাকা হত। সতীদাহ প্রথাটিকে মন্দ বলতে আমারও কোনো আপত্তি নেই। কিন্তু ওই বাঁশ দিয়ে চেপে ধরা কাজটিকে সমর্থন না করে পারি না। যারা ওই ভাবে চেপে ধরে থাকত মেয়েটিকে, তাদের আমি কোনো মতে নিষ্ঠুর বলতে পারব না। এবং বলব তারা একান্ত দয়ার বশেই ওই কর্মটি করত। তা না হলে স্ব-ইচ্ছায় সুস্থচিত্তে জ্বলন্ত চিতার উপর বসে আগাগোড়া ধীরেসুস্থে পোড়ার সাধ্য হত না কারও, তা স্বামীভক্তি যতই থাকুক না কেন মনে-প্রাণে ঠাসা। একান্ত দয়ার বশেই বউটির আত্মীয়স্বজন তাকে ওইভাবে চিতার উপর বাঁশ দিয়ে চেপে ধরে থাকতেন। সতীর মনের জোরের আর স্বামীভক্তির বহর দেখে ধন্য ধন্য পড়ে যেত। নয়তো শতকরা একশো জন সতীই আগুন জ্বলে উঠলে পর চিতার উপর থেকে লাফিয়ে পড়ে দৌড় মারতেন এ কথা হলফ করেই বলা চলে।

কিন্তু আমাদের জ্বলন্ত বালির বুকে বাঁশ দিয়ে চেপে ধরবে কে দয়া করে? এক উপায়, হাত-পা দড়িদড়া দিয়ে বেঁধে চুপ করে পড়ে থাকা। কিন্তু কে কাকে বাঁধে? শেষে অতিষ্ঠ হয়ে উঠে দাঁড়ালাম। তারপর মুখের উপর থেকে চাদর কম্বল সামান্য সরিয়ে একবার দেখে নিলাম কে কোথায় কি করছে।

আমার বাঁ ধারে ওই ওপাশে গোটাকতক কম্বল দিয়ে একটা গোলমতো নিচু তাঁবু খাড়া করা হয়েছে। তার ভিতর থেকে অনর্গল ধোঁয়া বেরুচ্ছে। এগিয়ে গিয়ে নিচু হয়ে মাথাটা তার ভিতর গলিয়ে দেখি, ওরা সব ঠাসাঠাসি করে গোল হয়ে বসেছে-আর হাতে হাত ফিরছে লম্বা কলকে। জানি না আজ ওদের শেষ দশা কি হবে! হয়তো বা খানিক পরে ঘাড়ের উপর থেকে মাথাগুলো দুমদাম করে ছিটকে বেরিয়ে যাবে সকলের।

তাড়াতাড়ি নিজের মাথাটা বার করে নিয়ে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। বাইরের প্রচণ্ড তাপ আর কম্বলের তাঁবুর ভিতর ওই উৎকট ধোঁয়া। তার মধ্যে আরাম করে বসে টানের পর টান লম্বা কলকেয়। নির্ঘাত বুকের জোর না থাকলে মানুষ ও কাজ পারে কি করে! আর খালি পেটে করবেই বা কি, অন্তত ধোঁয়া দিয়ে তো কিছুটা ভরতি হবে পেটের।

লাফাতে লাফাতে গেলাম মণিরামের কাছে। জন চার-পাঁচ বসে আছে ওর খাঁটিয়া ঘিরে। মণিরামের কপালে জলপটি দিয়ে অনবরত ভিজিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই আগুনের হলকায় জলপটি কতটুকু উপকারে আসবে! হাঁসফাঁস করে হাঁপাচ্ছে ছোকরা। গায়ে হাত না দিয়েই বেশ বোঝা যায় জ্বরের প্রতাপ

ওদের ওখানে খানিক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলাম। কি করা যায় এখন? কিছুই মাথায় এল না।

একটা জুতসই সাহসের কথাও শোনাতে পারলাম না মণিরামকে। রক্তবর্ণ চক্ষু দুটি মেলে সে একবার আমার মুখের দিকে তাকাল। নিজের মনকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম যে, একটা কিছু তাজ্জব কাণ্ড ঘটবেই যাতে এযাত্রা রক্ষা পাবে ছোকরা। আর কি করব?"

সরে পড়লাম ওদের কাছে থেকে। একটু দূরে উট দুটো বসে রয়েছে। কোনো আচ্ছাদন নেই ওদের উপর। পাশেই আটার বস্তায় হেলান দিয়ে গুলমহম্মদ আর তার ছেলে বসে আছে। ওদের আচ্ছাদন হচ্ছে মাথার পাগড়ির ফালতু লম্বা অংশটুকু। তাই দিয়েই ওরা মুখ ঢেকেছে।

ওদের পাশ দিয়ে যাবার সময় কুন্তীর আর ভৈরবীর সংবাদ পেলাম। গুলমহম্মদ আঙুল দিয়ে কুয়োটা দেখিয়ে দিলে।

সেই দিকেই চললাম। দেখেই আসি-কোথায় কি ভাবে আছে তারা। কুয়োর ধারে পৌঁছে দেখি–কই, কোথাও তো কাকে দেখা যায় না! গেল কোথায় তারা? আরও এগিয়ে দেখতে পেলাম-কুয়োর ভিতর লাঠি চাদর কম্বল দিয়ে বেশ একটি চমৎকার ছোট্ট তাঁবু বানানো হয়েছে। তাঁবুর একটা দিক অল্প একটু খোলা। সেখান দিয়ে উঁকি মেরে দেখি, ভৈরবী কুন্তী আর সুখলাল একটি নেহাত প্রয়োজনীয় কর্মে ব্যস্ত। ওদের গায়ে মাথায় কাঁথা কম্বল জড়াতে হয়নি। একরকম শান্তিতেই আছে ওরা। চীনাবাদাম না আখরোট কি একটা জিনিস ভাঙছে আর চিবুচ্ছে

আমাকে দেখতে পেয়ে তাড়াতাড়ি কুয়োয় নেমে তাঁবুতে ঢোকবার জন্যে ভৈরবী চেঁচামেচি শুরু করে দিলেন। কুয়োর তলায় বালির নীচেই জল, সেই জন্যেই ওরা রক্ষা পেয়েছে। কিন্তু আমার তখন সেখানে নামা সম্ভব নয়। পাড়ের বালি তেতে আগুন আর শুকিয়ে ঝুরঝুরে হয়েছে। নামতে গেলে রাশীকৃত বালি আমার সঙ্গেই নেমে যাবে পাড় থেকে। তখন ওদের ওই তাঁবুর দশা হবে কি? তারপর আবার উপরে উঠে আসব কেমন করে? ওই পাড় বেয়ে হড়কে নেমে যাওয়া হয়তো সম্ভব কিন্তু এখন উঠে আসা ওখান থেকে সম্পূর্ণ অসম্ভব...সর্বাগ্রে ফোস্কা পড়ে যাবে। ওদের কাছেই বা এখন থাকি কি করে? দলসুদ্ধ সবাই জ্বলেপুড়ে মরছে আর আমি কোন মুখে এখন মেয়েদের কাছে আরামে বসি থাকি?

হেঁকে বললাম, "ওখানে এখন আমার যাওয়া অসম্ভব, ভয়ঙ্কর জ্বর মণিরামের, সেখানেই এখন যাচ্ছি আমি। যদি ঠাণ্ডা জল থাকে ত দাও এক ঘটি খেয়ে যাই।"

জলটা ঠাণ্ডাই ছিল। নীচ থেকে সুখলাল লোটাটা বাড়িয়ে দিলে। হাত বাড়িয়ে ধরে নিয়ে ঢকঢক করে গলায় ঢেলে চলে এলাম। থাকুক ওরা আরাম করে ওখানে।

খাঁ খাঁ করছে চারিদিক। অগ্নিবৃষ্টি হচ্ছে আকাশ থেকে। হিলহিল করে উত্তাপ উঠছে বালির বুক থেকে। চোখ মেলে থাকলে স্পষ্ট মনে হয় যেন বর্ণহীন আগুন লকলক করে লাফিয়ে উঠছে আকাশপানে। সাধ্য নেই আকাশের দিকে চোখ তুলে চাইবার, প্রয়োজনও নেই তার। চোখ বুজেই বেশ মালুম হচ্ছে যে, মাত্র হাত দুই পশ্চিমে ঢলেছেন সূর্য। ভয় হল-কাপড় কম্বলে দাউ দাউ করে আগুন ধরে যাবে না তো?

মণিরামের কাছে ফিরে এসে তার মাথার দিকে খাঁটিয়ার এক কোনায় বসলাম। ওর নাক মুখ চোখ ফুলে উঠেছে। একজনকে এক কুঁজো জল আনতে বললাম।

এক কুঁজো দু-কুঁজো করে আট কুঁজো জল ঢালা হল। ফলে মণিরামের শ্বাস প্রশ্বাস স্বাভাবিক ভাবে বইতে লাগল। মনে হল মাথায় যে রক্ত উঠেছিল তা এবার নামছে।

খালি কুঁজোগুলো ভরতি করবার জন্যে ভৈরবীর কাছে পাঠিয়ে দিলাম। বসে বসে চর্বণক্রিয়ার সঙ্গে কুঁজোগুলোও ভরতি করুক ওরা। ওদের তাঁবুর মধ্যেই জল-বালি সরালেই মিলবে।

পোপটলাল এলেন, এসে খাঁটিয়ার পাশে বালির উপর বসে পড়লেন। অনেকেই এল এবং চলে গেল। কি করবে, কেউ কোথাও স্থির হয়ে তিষ্ঠতে পারছে না।

রক্তচক্ষু করে পোপটভাই মণিরামের দিকে চেয়ে বসে রইলেন-একেবারে নির্বাক

নিস্পন্দ। সকলেই প্রায় তাই, কারও মুখে রা নেই। কেবল শোনা যাচ্ছে মণিরামের শ্বাসের আওয়াজ। তখনও সমানে জল ঢালছি তার মাথায়।

বেলা গড়িয়ে চলল। রোদ না কমলেও সময় ঠেকে রইল না। দিন শেষ হয়ে এল। তখনও হুঁশ ফিরে পাবার কোনো লক্ষণ দেখা যায় না রুগীর। রূপলালকে ডেকে বললাম, "সকলকে বলো এক কুঁজো জল আনতে আরও জল ঢালব মণিরামের মাথায়।

আবার থালায় করে ছেঁচে ছেঁচে কুয়ো থেকে জল তুলতেও কারও বিন্দুমাত্র আপত্তি নেই, যতই দিকদারি লাগুক না কেন। ছুটল সবাই কুঁজো নিয়ে।

গুলমহম্মদ এসে দাঁড়াল। বেরুবার সময় হয়ে এল আমাদের। কি করবে সে, উটেদের পিঠে মালপত্র বাধঁবে কি?

বললাম, "আরও একটু সবুর করো। রোদ পড়ুক আরও। নয়তো বেরুব কি করে একে নিয়ে? আরও জল ঢালা হোক এর মাথায়। তারপর কুঁজোগুলো ভরতি করে নিয়ে বেরুনো যাবে।

পাগড়ির মধ্যে আঙুল চালিয়ে বুড়ো মাথায় উকুন খুঁজতে লাগল।

লাফাতে লাফাতে শ্রীমান সুখলাল উপস্থিত। জরুরি সংবাদ এনেছে একটি। আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে ফিসফিস করে বললে সেই গুহ্য কথাটি। একটি প্রাণজুড়ানো সংবাদ। কুয়োর মধ্যে বালি সরাতে সরাতে একখানা শুকনো কাঠ মিলে গেছে। বাবাজি তাই জানতে এসেছে যে, এখান থেকে যাবার আগে চায়ের জল গরম করবে কিনা। ওইটুকু কাঠে চায়ের জলই শুধু গরম হতে পারে।

শ্রীমানকে সম্মতি দিয়ে ফেরত পাঠালাম। বললাম, "বেশ অনেকটা জল চড়াওগে। অনেকেই চা খাবে। আর মণিরামের জন্যে এক লোটা জলে মিছরি দিয়ে নিয়ে এসো।"

চা খাবার কথাটি গুলমহম্মদকে জানিয়ে বললাম, "দেখো গিয়ে ওখানে, আগুন জ্বালাতে গিয়ে সর্বস্ব না পুড়িয়ে ফেলে ওরা।"

বুড়ো মহাখুশি। চা হচ্ছে-এটি তার কাছে সবচেয়ে বড় সুসংবাদ।

আবার জল ঢালা শুরু হল মণিরামের মাথায়। অনেকক্ষণ পরে সে চোখ মেলে চাইলে। ধরাধরি করে তাকে উঠিয়ে বসিয়ে দিলাম। উঠে বসে মণিরাম ধীরে ধীরে মিছরির শরবত গিলতে লাগল।

খাঁটিয়া ছেড়ে নেমে এলাম। পোপটলাল প্যাটেল উঠে এলেন, এসে আমারই সামনে দাঁড়িয়ে আমার দু-হাত জাপটে ধরলেন। কোনো কথা নেই তাঁর মুখে—

বেশ বুঝলাম কি তাঁর মনের কথা, কি তিনি বোঝাতে চান।

হাত টেনে নিয়ে বেরিয়ে গেলাম। কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সময় নয় এখন। কোনো রকমে পৈতৃক প্রাণটুকু ধরে থাকতে থাকতেই সবাইকে নিয়ে ফিরতে পারলে বাঁচি এই সাক্ষাৎ যমালয় থেকে। তখন বোঝা যাবে ওই সব কৃতজ্ঞতা ধন্যবাদ ইত্যাদি ভাল ভাল জিনিসের মাহাত্ম্য। এ সময় সব কিছুই বিষতুল্য বোধ হচ্ছে।

কাপড়-কম্বলগুলো খুলে মোটঘাট উঠের পিঠে বাঁধা আরম্ভ হল। কুঁজোগুলি আবার ভরতি করতে করতেই চা হয়ে গেল। ভাত রাঁধবার ডেকচিতে করে দু-ডেকচি চা বানিয়েছে কুন্তী। পোপটলালও একটু চা পান করলেন। হাতে হাতে প্রমাণ হয়ে গেল, "দারুণ গ্রীষ্মে চা একমাত্র শীতল পানীয়।"

খাঁটিয়ার উপর মণিরাম যাবে। ভৈরবীর জন্যে এক অভিনব ব্যবস্থা। তিনি যাবেন ঊর্বশীর মায়ের পিঠে মালপত্রের উপর চড়ে। গুলমহম্মদ তাঁকে বুঝিয়েছে-এতে কোনো মুশকিল নেই। মুশকিল আর কি-তাদের দেশের আওরতরা ত ওই ভাবে উটে চড়ে হামেশা ঘোরাফেরা করে। ভৈরবীও তৈরি। কিন্তু সামান্য একটু বাড়তি মুশকিল দেখা গেছে তখন। তা হচ্ছে, টাল সামলাবার জন্যে দু-হাত দিয়ে ধরবেন কি?

সে মুশকিলের আসান হয়ে গেল। উটের পিঠে আটার বস্তাগুলো তো একগাছা মোটা কাছি দিয়ে কষে বাঁধা হয়ই, সেই কাছি দু-হাতে ধরে থাকলেই হল। কিছু না ধরেই তো বেশ

স্বচ্ছন্দে ও-দেশের মেয়েরা একরকম ঘুমোতে ঘুমোতেই উটের উপর বসে চলে যায়। সুতরাং ভাবাবার কিছু নেই।

বুদ্ধি খাঁটিয়ে গুলমহম্মদ বড় উটটার পিঠের মাঝখানে একটু সমতল স্থান বানাল। আটার বস্তাগুলো দু-ভাগ করে উটের দু-পাশে সাজিয়ে বেঁধে ভৈরবীর জন্যে আরামের স্থান বানাতে সে কিছুমাত্র কসুর করলে না। তার উপর কম্বল বিছানো হল। এইবার চড়বার পালা। একবার চড়ে বসতে পারলে তখন আর পায় কে ভৈরবীকে বালির উপর দিয়ে যে হাঁটতে হবে না এইটিই সবচেয়ে বড় কথা।

উর্বশীর মা বসে আছে। তারপাশে গিয়ে দাঁড়ালেন ভৈরবী। দাঁড়িয়ে মুখ তুলে দেখলেন কতটা উঁচুতে চড়তে হবে। ঊর্বশী বসে থাকলে তার পিঠে বাঁধা খাঁটিয়ার পাড় নাগাল পাওয়া যায়। তাই ধরে কোনো রকমে ঝুলতে ঝুলতে উঠে পড়েন তিনি খাঁটিয়ার ওপর। কিন্তু এখন– উর্বশীর মা'র পিঠের উপর চড়া সহজ কথা নয়। ঊর্ধ্বমুখ করে ওপর দিকে তাকিয়ে ভৈরবী মতলব ঠাওরাতে লাগলেন।

বুড়ো গুলমহম্মদ নিজের হাঁটুতে দু-হাত দিয়ে পিঠ পেতে দাঁড়াল। ওর পিঠে দাঁড়িয়ে উটের ঘাড়ে চড়তে হবে।

ভৈরবী নারাজ।

কুন্তী এগিয়ে এল। বললে, "উঠে দাঁড়ান আমার কাঁধে, তারপর উপরে উঠে পড়ুন।" কুন্তি

চিঁড়ে-চ্যাপটা হয়ে যাবে-ভৈরবী ঘাড় নাড়লেন।

শেষে কি করি-সবাই অপেক্ষা করছে তাঁর উটের চড়ার জন্যে-এগিয়ে গেলাম।

"ধরো দড়ি বাগিয়ে– ঠেলে তুলে দিচ্ছি।"

তাই হল। দড়ি ধরতেই পেছন থেকে ঠেলে তুলে দিলাম। হাঁচোড় পাঁচোড় করে কোনো রকমে তিনি চড়ে বসলেন নিজের আসনে। এইবার ঊর্বশীর মা উঠে দাঁড়াবে।

"হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার!"

ওরা বাপ-বেটা দুজনে উটের দু-পাশে সাবধান হয়ে দাঁড়াল।

"হ-হট্-হৈ-হট্-হট্!" সামনের পেছনের চারখানা পায়ের আটখানা ভাঁজ খুলে খুলে উট উঠে দাঁড়াচ্ছে। উপরে ভৈরবী দড়ি ধরে একবার এ কোণে একবার ও কোণে হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে টাল সামলাচ্ছেন। নীচে দাঁড়িয়ে দেখতে পাচ্ছি তাঁর শরীরের সমস্ত রক্ত মুখে এসে জমছে। যাক্-এইবার চলা শুরু হবে।

"জয় শ্রীহিংলাজ মাতা কি–"

"জয়!"

কিন্তু ও কি! পেছন ফিরে কে আবার বসে রইল ওখানে? কে ও?

থিরুমল ৷

কি আবার হল ওর? কাছে গিয়ে ডাকলাম, "থিরুমল!"

কোনো সাড়াশব্দ নেই। চোখ বুজে বসে আছে। এইমাত্র তো চা খেয়ে এল। এর মধ্যে আবার কি হল?

একটা হাত ধরে টান দিলাম–"থিরুমল, ওঠো-আমরা যাচ্ছি যে।"

কোনো উত্তর দিলো না থিরুমল। হাতখানা ছাড়িয়ে নেবার জন্যে টানাটানি করতে লাগল। পোপটলাল এসে তার আর একটা হাত ধরলেন

"কি হয়েছে তোমার? ওঠো।"

থিরুমল বললে, সে আর যাবে না। এখান থেকেই ফিরবে করাচী। উত্তর শুনে একেবারে হতভম্ব। ওর দু-হাত ধরে আমরা দুজনে দাঁড়িয়ে আছি। কি বলব? এখন কি করা উচিত ভেবে পাচ্ছি না। এ অবস্থায় পড়তে হবে বলে কেউই তৈরি ছিলাম না। তখন কুন্তী এগিয়ে এল কাছে। থিরুমলের সামনে দাঁড়িয়ে একান্ত মিনতি করে বললে, "ওঠো আমরা যাচ্ছি যে।"

কয়েক মুহূর্ত থিরুমল কুন্তীর মুখের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইল। তারপর আমাদের হাত থেকে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে উঠে দাঁড়াল।

চক্ষের নিমেষে ঘটে গেল এক তাজ্জব কাণ্ড। থিরুমল খপ করে কুন্তীর একখানা হাত ধরে ফেললে এবং পরমুহূর্তেই কুন্তীকে টানতে টানতে নিয়ে ছুটল। কি যে হল বা হচ্ছে এসব আমাদের মাথায় ঢোকাবার আগেই অনেকটা দূরে টেনে নিয়ে গেল কুন্তীকে। তার হাত ছাড়াবার জন্যে প্রাণপণে চেষ্টা করতে পরিত্রাহি চেঁচাতে লাগল কুন্তী।

সবাই আমরা থ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। উটের উপর থেকে ভৈরবী চিৎকার করে উঠলেন, "ধরো-ধরো ধরো ওদের। নিয়ে গেল যে।"

দৌড়ে গেল অনেকে, ঘিরে ধরলে ওদের। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে গেলাম সেখানে। কুন্তীকে থিরুমল কিছুতেই ছাড়বে না। এখনই তাকে নিয়ে ফিরে যাবে করাচী। আমরা আপত্তি করবার কে?

কাছে গিয়ে থিরুমলকে বোঝাবার চেষ্টা করলাম, "বেশ তো আমরাও তো ফিরে যাবো করাচী-একলা তুমি ফিরবে কেমন করে-মানে, তুমি-"

আর এগোল না আমার কথা। কাকে বোঝাবার চেষ্টা করছি আর কেই বা শুনছে আমার কথা! কারও কোনও কথা ও শুনবে না। চোখ পাকিয়ে বললে, এখনই ফিরে যাবে সে তার কুন্তীকে নিয়ে। তখনও কুন্তী চেষ্টা করছে হাতখানা ওর মুঠো থেকে ছাড়াবার জন্যে। কিন্তু সে মুঠো কি সহজে ছাড়ানো যায়?

এ তো এক মহা বিপদ ঘটল দেখছি! এই পাগলকে এখন রাজি করানো যায় কি করে? অকূল সমুদ্রে পড়লাম।

রূপলাল সামনে এসে দাঁড়াল। থিরুমলের দুই কাঁধের উপর দুই হাত রেখে সে বললে, "ঠিক বন্ধু, ঠিক। চলো আমরা ফিরে যাই করাচী। আর কিছুতেই সামনে এগোনো নয়। এখনই আমরা করাচী ফিরে যাব।"

সামান্য একটু সময়-রূপলালের চোখের উপর নিজের চোখের দৃষ্টি স্থিরভাবে রেখে থিরুমল কুন্তীর হাত ছেড়ে দিলে। তারপর দু-হাত দিয়ে জাপটে ধরলে রূপলালকে। এখন সে মহাসুখী-তার চোখে-মুখে আনন্দ উথলে উঠেছে। বন্ধু রূপলালও ফিরে যাবে তাদের সঙ্গে, এর চেয়ে বড় কথা আর কি আছে।

ছাড়া পেয়ে কুন্তী পিছনে ফিরে দৌড়। দৌড়ে গিয়ে লুকাল ভৈরবীর উটের পাশে। থিরুমলের কাঁধে হাত রেখে রূপলাল ওকে ঘুরিয়ে নিয়ে এসে আমাদের সকলের অনেকটা আগে চলল। গুলমহম্মদ পেছনে থেকে হেঁকে হেঁকে ডাইনে বাঁয়ে বলে রূপলালকে চালাতে লাগল। আমরা দলসুদ্ধ সবাই উট দুটিকে নিয়ে ওদের পেছন পেছন চললাম।

চন্দ্রকূপ। চন্দ্রকূপ পৌঁছতে আর মাত্র দু-দিন বাকি।

নেমে গেলেন পশ্চিমদিকে সূর্যদেব। আমাদের শেষবারের মতো শাসিয়ে গেলেন, "দাঁড়া, কাল আবার ঘুরে আসি। তখন তোদের ভালো করে দেখে নেব।" মনে হল একান্ত অনিচ্ছায় তাঁকে বিদায় নিতে হচ্ছে। যেতে হচ্ছে কারণ তাঁর চেয়ে বহুগুণে শক্তিশালী কার অদৃশ্য হস্ত তাঁকে জোর করে টেনে নামিয়ে নিয়ে গেল আমাদের দৃষ্টির আড়ালে। জানি না আজ ঠাকুরের বরাতে কি ঘটবে সেই অতি-শক্তিশালীর হাতে-যাক্ গে—

আপাতত আমাদের নিষ্কৃতি মিলল তো ওঁর হাত থেকে। এই-ই যথেষ্ট। পরম কৃতজ্ঞ অন্তরে দু-হাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে সেই অদৃশ্য হস্তের মালিককে প্রণাম জানালাম। একান্ত তুচ্ছ-একান্ত অসহায় এই কজন মনুষ্য-সন্তানের-অন্তরের অন্তস্থল থেকে কৃতজ্ঞতার যে শ্রদ্ধার্ঘ্য সেই সর্বনিয়ন্তার উদ্দেশে নিবেদিত হল তা যথাস্থানে পৌঁছল কিনা কে জানে! আমরা কিন্তু শান্তি পেলাম।

কিন্তু সে কতক্ষণের জন্যে?

শান্তি বস্তুটি ঠিক কি জাতের পদার্থ তার হদ্দ হদিস কি কেউ কখনো দিতে পেরেছে! কি হলে বা কি করলে, শান্তিলাভ হয় এইজন্যে সকলে ব্যতিব্যস্ত। এইটি যদি ঠিক এই রকমের

না হয়ে ওই রকমের হত, হাতে না পাওয়া বস্তুটি যদি ষোল আনা দখলে এসে যেত, কিংবা দুনিয়ার তামাম ঘটনাগুলি যদি হুবহু আমার মনের মতো করে ঘটত, তবেই না নির্জলা শান্তিভোগ করা যেত। এই জাতের উচ্চাশা বুকে নিয়ে শান্তি বস্তুটিকে হাতের মুঠোয় পাবার জন্যে দুনিয়াসুদ্ধ সকলে এতই উৎকট উদগ্রীব যে, তার ফলে ঠিক বিপরীতটি ঘটে বসেছে। শান্তি লাভার্থে বা স্থাপনার্থে হানাহানি কামড়া-কামড়ি এমন চরম সীমায় পৌঁছে গেছে যে, প্রকৃত শান্তি কি জিনিস এবং তার স্থায়িত্বই বা কতটুকু এ সমস্ত চিন্তা-ভাবনা আমার মন থেকে ঝেঁটিয়ে বিদেয় করেছি।

বর্তমানে যে অবস্থায় পড়ে আছি এটি থেকে উদ্ধার পেলেই সুনিশ্চিত শান্তি লাভ-এই ধরনের চিন্তায় অষ্টপ্রহর সবাই হাঁকুপাঁকু করে মরছি। যে মুহূর্তে পরের দশাটিতে পৌঁছনো গেল অমনি আবার আরম্ভ হল হাঁসফাঁসানি-কি করে এটি থেকেও অচিরাৎ উদ্ধার পাওয়া যায়। অবিরত এই ই চলেছে। বর্তমান নিয়ে কেউ তুষ্ট নয়, ভবিষ্যৎ নিয়ে যত মাথাব্যথা। এই দুরারোগ্য ব্যাধিটির হাত থেকে মুক্তি পাওয়াকেই শান্তি বলা চলে কিনা কে জানে।

কিন্তু এই ব্যাধি থেকে মুক্তি পাওয়া কি সহজ কথা? আশা করারই যদি কিছু না রইল বেঁচে থাকার সুখটা কোথায়? মন নামক পদার্থটি যতক্ষণ আছে ততক্ষণ ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা-কল্পনা করা যাবে কোথায়? আশা-আকাঙ্ক্ষাকে মারতে হলে মনকেও পুড়িয়ে ছাই করে ফেলতে হবে। কোনো উপায়ে যদি এই কর্মটিকে একবার সমাধা করে ফেলা যায়-তাহলের শুধু শান্তি কেন—যাকে বলে আপদের শান্তি-তাই হয়ে যাবে।

কিন্তু সেই মনের নাগাল পেলে তো! সে কাজটি আরও ভয়ানক শক্ত ব্যাপার।

এধারে খালি পেটে আর কতক্ষণ আমরা মনকে বুঝিয়ে-সুঝিয়ে রাখি? যে কোনো রকমের একটা পেটে পোরার মতো জিনিস দিয়ে পেটটা যদি বোঝাই থাকে, তখন ধমক দিয়ে চোখ রাঙিয়ে মনকে দাবিয়ে রাখা হয়তো সম্ভব-"ছি, হ্যাংলার মত এদিক-ওদিক তাকাতে নেই!"

কিন্তু এ যে একেবারে পেটের মধ্যে ঘটছে কিনা ব্যাপারটা বাইরের কোনো কাণ্ড তো নয় যে, মনকে চোখ বুজে থাকতে বলব। এ যে একান্ত ঘরোয়া ব্যাপার। নিজের ঘরের ভিতর যদি অবিরাম কান্নাকাটি চলতে থাকে—"ওগো দাও, আমায় কিছু দাও গো", তখন সব কিছু গোলমাল হয়ে যাবে যে। তখন কে কাকে দাবায়, আর কি বলেই দাবায়?

গ্রাসাচ্ছাদনের আচ্ছাদনটুকু না হয় বাদই দিলাম, কিন্তু গ্রাসটুকু পর্যন্ত বাদ পড়লে নিজেরই গ্রাসের মধ্যে ঢোকবার যোগাড় হয়ে দাঁড়ায়।

যা হোক একটা গ্রাসের ব্যবস্থাটুকুও যদি কায়েম থাকে, তখন চোখরাঙানো সবাই সহ্য করে-তা ভিতরের মনই হোক আর ঘরের পরিবারই হোক। যেখানে সেটুকুও জোটে না সেখানে মুখের উপর জবাব শুনতে হয়, "ভাত দেবার কেউ নয়, কিল মারবার গোসাঁই!" এই মোটা কথাটা তলিয়ে না বুঝে মনকে চোখ ঠারলে হবে কি! ক্ষুধাকে কি গোঁজামিল খাইয়ে তুষ্ট করা যায়?

এক উপায় হচ্ছে ক্ষুৎপিপাসা জয় করা। শোনা যায় এজন্যে নাকি নানা রকমের যৌগিক পন্থাও বাতলানো আছে। জানি না সেই সব পন্থাগুলিও অব্যর্থ কিনা। তা যদি হয় তবে জেলায় জেলায় গ্রামে গ্রামে স্কুল-কলেজ খুলে সকলকে ওই বিদ্যায় পোক্ত করে ছেড়ে দেওয়া উচিত। তা হলে পৃথিবীর পনেরো আনা গণ্ডগোল যায় চুকে। যাদের পেটের দায় নেই তাদের শান্তির কথা বোঝানো সহজ, আর তা হৃদয়ঙ্গম করে তারা নির্দিষ্ট নিরাসক্ত চিত্তে জগতে শান্তি স্থাপনের কাজে আত্মনিয়োগও করতে পারে। কিন্তু যতক্ষণ তা না হচ্ছে ততক্ষণ শান্তির মেয়াদ একান্তই এতটুকু মাত্র।

কিছুক্ষণ আগে সূর্য অস্ত যাওয়ার দরুন হাঁফ ছেড়ে-বাঁচা বহু-দুঃখে-পাওয়া শান্তি ক্রমে ক্রমে মিইয়ে এল। তখন সর্বত্র যা হয়ে থাকে তাই শুরু হল। খালি পেটে একে অন্যের ছুতো খুঁজবেই। লেগে গেল ঝগড়াঝাঁটি।

এই নিয়ম। দুনিয়ার সর্বত্র ছোট বড় যত ঝগড়া-বিবাদ বেধেছে বা বাধব বাধব করছে,

তলিয়ে খুঁজলে দেখা যাবে সকলটির মূলেই ঐ একটি হেতু। ক্ষুধা-শাশ্বত সর্বজনীন সার্বত্রিক ক্ষুধা। ছোট্ট দুটি অক্ষরের তুচ্ছ কথাটি কিন্তু কি অপরিসীম শক্তি যে লুকিয়ে আছে ওর মধ্যে! ন্যায়নীতি ধর্মাধর্ম সব কিছু ওটির মধ্যে পড়ে নিমেষে ছাই হয়ে যায়। মানুষের মনগড়া আইন কোন ছার-পেটের ক্ষুধা বিধাতার বিধানকেও হার মানায়। ঐ একটি মাত্র জিনিস সঙ্গে নিয়ে জীব ধরিত্রীর বুকে পদার্পণ করে। যে কদিন এখানে টিকে থাকে, ওই ভয়ঙ্কর রোগটি সঙ্গে নিয়েই চলে ফিরে বেড়ায়।

মস্ত বড় তীর্থদর্শন করে মস্ত বড় পুণ্যের বিরাট বোঝাটা ঘাড়ে করে ফিরব এখান থেকে, এই আশায় চলেছি মনের জোরে। কিন্তু পেটের ক্ষুধা পেটের মধ্যে ধস্তাধস্তি শুরু করে দিল মনের সঙ্গে। মন হার মানল-সেই ভিতরের ধস্তাধস্তিটাই বাইরে এসে দাঁড়াল-যাকে সামনে পাবে তাকেই ছোবল মারবে। আরম্ভ হল খিটিমিটি।

গোকুলদাস ভাট-ঝাড়া সাড়ে পাঁচ হাত লম্বা মানুষ। আমাদের দলে সে-ই সকলের চেয়ে মাথায় উঁচু। আগাগোড়ায়ই লক্ষ করা গেছে যে, চিরঞ্জীলাল নামে একটি বেঁটে জোয়ান ছোকরা গোকুলদাসের কুঁজো আর ঝোলাটা বয়ে নিয়ে চলেছে, আর দু পাশে লম্বা দু-হাত দুলিয়ে নির্ঝঞ্ঝাট গোকুলদাস মাথা উঁচু করে সকলের আগে আগে এগিয়ে চলেছে। আমরা সবাই মনে করতাম যে, ওই ছোকরা গোকুলদাসের একান্ত অনুগত আপনার লোক। সেই গোকুলদাসে আর চিরঞ্জীলালে লেগে গেল তুমুল কাণ্ড।

চিরঞ্জীলাল তার বেঁটে বেঁটে হাত-পা ছুঁড়ে বলছে-"আমি কি তোমার কেনা চাকর নাকি যে, আগাগোড়া তোমার কুঁজো আর ঝোলা বয়ে নিয়ে যেতে হবে আমাকে?"

গোকুলদাসের মুখ অনেক উঁচুতে। সেখান থেকে এল এক বিরাট দাবড়ি—"চুপ করে থাক বেইমান। না নিবি আমার কুঁজো তো বড় বয়েই গেল। কিন্তু আমার সেই জিনিসটা কোথায় তাই বল, নয়তো টুটি টিপে একেবারে শেষ করে দেব।" বলে বোধ হয় সত্যি সত্যিই টুটি টিপে শেষ করবার জন্যে তেড়ে এল। অন্য সকলে মাঝে পড়ে অতটা আর হতে দিলে না।

কিন্তু কি সেই জিনিসটি, যার জন্যে টুটি টিপতে যাওয়া? কি এমন ভয়ঙ্কর মূল্যবান পদার্থ সেটি, যার জন্যে খুনোখুনি হবার উপক্রম? ওদের দুজনের কেউ কিছুতেই বলবে না সেই মহামূল্যবান বস্তুটির নাম। শেষে রাগের মাথায় চিরঞ্জীলাল ফাঁস করে দিলে ভিতরের কথাটি। বললে-"ওই লম্বা বদমাশটা সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছিল একটা বালিস। সেটার ভিতর ছিল তুলোর বদলে চূর্ণা বোঝাই করা। সকলকে লুকিয়ে ও মাঝে মাঝে চূর্ণা খেত। নিজে খেয়ে কবে সবটা সাবাড় করেছে। এখন বলে যে, আমি নাকি খেয়ে ফেলেছি সমস্ত।"

চূর্ণা আবার কি জিনিস রে বাবা-যার জন্যে এই মহামারী কাণ্ড!

পোপটলাল বুঝিয়ে দিলেন- আটায় জল না দিয়ে বেশি করে ঘি দিয়ে ভাজা যায়-তারপর সঙ্গে চিনি মিশিয়ে নেওয়া হল, তাহলে যে পদার্থ তৈরি হয় তার নামই চূর্ণা। সেই উপাদেয় খাদ্যে বহুদিন নষ্ট হয় না।

হিসেবি গোকুলদাস বাড়ি থেকেই আন্দাজ করতে পেরেছিল যে, পথে খাওয়া জুটবে না। তাই ওই জিনিস সুদূর কাথিওয়াড় থেকে সঙ্গে করে এনেছিল। সেই মহামূল্য খাদ্যদ্রব্য তার সঙ্গে আছে এ কথা সকলে না জানতে পারে এই ছিল তার অভিপ্রায়। জানাজানি হলে তেমন-তেমন অবস্থায় ভাগ না দিয়ে উপায় থাকবে না এই কারণেই এত সাবধানতা। বিশ্বাস করে বলেছিল সে একমাত্র চিরঞ্জীকে। একজনকে অনন্ত না বলে উপায় নেই। বলতে হবে, সামলাতে হবে। শুধু বলা নয়, ভাগও দিচ্ছিল সমানে চিরঞ্জীলালকে। হঠাৎ সেটার সবটুকু উধাও হয়ে যাওয়ায় এই গণ্ডগোল।

বিষম চটে গিয়ে শেষটা গুম হয়ে গেল গোকুলদাস। সবটুকু চেটেপুটে শেষ করেছে চিরঞ্জী এ শোকও বরং সহ্য করা যায় কিন্তু কথাটা সকলের কাছে ফাঁস করে দিয়ে কি লজ্জাতেই ফেলে দিলে সে বেচারাকে। ভাটের উঁচু মাথা হেঁট হয়ে গেল।

এত দুঃখকষ্টের মধ্যেও এই ব্যাপারে সবাই বেশ মজা উপভোগ করলে। কিছুক্ষণ

অন্যমনস্ক হয়ে হাঁটা গেল। এধারে রাতও যত বাড়ে ক্ষুধাও তত বাড়ে-পথ যেন আর ফুরোয় না। বার বার গুলমহম্মদকে সবাই বিরক্ত করছে, "কতটা পথ আর বাকি আছে?" উত্তর দিতে দিতে বুড়োর মেজাজ গেল বিগড়ে। একে ওই বয়স, তার উপর খালি পেট–কতক্ষণ মেজাজ ঠিক থাকে।

কয়েকটা চড়া চড়া কথার আদান-প্রদান হয়ে গেল।

সর্বাগ্রে চলেছে রূপলাল আর থিরুমল, তারপর বড় উট, যার উপরে ভৈরবী, সামনে গুলমহম্মদ। অন্য সকলে সেই সঙ্গে চলেছে। তারপর ছোট উটের উপর মণিরাম, সঙ্গে পোপটলাল আর দিলমহম্মদ। কুন্তী আর আমি বড় উটের সঙ্গে হাঁটছিলাম। ক্রমেই কুন্তী পিছিয়ে পড়তে লাগল। তার শরীরে সামর্থ্য ফুরিয়ে এসেছে। অন্তিম চেষ্টায় নিজের শরীরটাকে কোনো মতে টেনে নিয়ে চলেছে সে। উপর থেকে তার অবস্থা দেখে ভৈরবী আমাকে সাবধান করলেন, "মেয়েটার উপর নজর রাখুন–ওর অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠেছে- এইবার পড়বে।"

তাই করলাম, তার ফলে ক্রমে আমিও পিছিয়ে পড়তে লাগলাম। যতই উৎসাহ দিই কুন্তী ততই পিছিয়ে পড়ে। ছোট উটটাও আমাদের ছাড়িয়ে এগিয়ে গেল। অনেক আগে বড় উটের পিঠে একটা কালো পদার্থ দুলতে দুলতে চলেছে। অন্ধকারের মধ্যে সেদিকে নজর রাখছি। মাঝে মাঝে তাড়া দিচ্ছি কুন্তীকে। শেষে নিরুপায় হয়ে হাত বাড়িয়ে দিলাম।

"ধরো আমার হাত, তাহলে জোরে চলতে পারবে।"

কুন্তী দু হাত দিয়ে আমার হাতটা চেপে ধরলে। তার জ্বলন্ত চক্ষু দুটি অন্ধকারে আমার চোখের উপর স্থির ভাবে রেখে কি দেখল, তারপর কান্নায় ভেঙে পড়ল।

কি ব্যাপার! এর আবার হল কি? দাঁড়াতে হল বাধ্য হয়ে। কান্না আর থামতেই চায় না। আমার হাতখানা ওর নিজের মুখের ওপর চেপে ধরে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল কুন্তী। যেন কান্না চাপতে গিয়ে নিজেই এবার ফেটে পড়বে। যত জিজ্ঞাসা করি "কি হল কি?" তত কান্না বাড়ে। এ ত মহা মুশকিলে পড়া গেল দেখছি।

ওধারে ওরা সব আরও এগিয়ে যাচ্ছে। চেঁচিয়ে ওদের থামতে বলব নাকি! শেষে নিজেকে একটু সামলে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রুদ্ধকণ্ঠে কুন্তী জিজ্ঞাসা করলে-"কি হবে আমার?"

এ আবার কোন ধরনের প্রশ্ন? সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করলাম-"তার মানে?" কুন্তী কিছুক্ষণ আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল। তারপর আবার তার কান্না উথলে উঠল। সেই সঙ্গে সে একগাদা প্রশ্ন করে বসল।

"কি হবে আমার? কি হবে আমার বেঁচে থেকে? আমি আর পারি না- আর আমি কোথাও যাব না। আমাকে এখানেই ফেলে রেখে যাও তোমরা। আমি... আমি... আমি..."

বলতে বলতে সত্যিই যে সেইখানে শুয়ে পড়তে গেল। যেন আর খাড়া থাকার শক্তিটুকু পর্যন্ত নেই। বসে পড়ার আগেই তার হাত ধরে টেনে খাড়া করে দিলাম। কুন্তী একটু সামলে নিলে। নিয়ে আমার হাত থেকে ওর নিজের হাতখানা ছাড়াবার জন্যে মোচড়াতে লাগল। কান্না মিশিয়ে আবার একরাশ প্রশ্ন

"কেন তুমি বাঁচাতে এলে? কেন তখন আমায় মরতে দাওনি? কে তোমায় বলেছিল আমায় বাঁচাতে? আমি ম'লে কি ক্ষতি হত তোমার? কেন? কেন? কেন? কেন? কেন?"

তার একখানা হাত জোর করে ধরে আছি-সেই ধরা হাতখানার উপর সে কপাল ঠুকতে লাগল সজোরে।

"এখন তুমি কিছুই জানো না, কিছুই বুঝতে চাও না তুমি। তোমাকে কিছু বলা আর পাথরে মাথা খোঁড়া দুই-ই সমান। কেন তুমি আমায় টেনে নিয়ে চলেছ? ছেড়ে দাও–ছেড়ে দাও-আমায়-শান্তিতে মরতে দাও এখানে।'

একটা যে কিছু বলব তারই বা ফুরসত দিচ্ছে কই? কি করি? এটাও খেপে উঠল নাকি? সামনে চেয়ে দেখলাম। অনেক দূরে সবাই চলে গেছে। মনে হল যেন ওরা থেমেছে। ভৈরবী

রয়েছেন খোলা উটের পিঠে। নজর করে দেখবার চেষ্টা করলাম। এতদূর থেকে অন্ধকারে স্পষ্ট কিছুই বোঝা গেল না। কিন্তু মনে হল বড় উটটা বসে পড়েছে।

কি হল আবার ওদের? একটা সন্দেহ আর আশঙ্কায় মনটা ভরে উঠল। পড়ল নাকি উটের উপর থেকে? কুন্তীর হাতে একটা ঝাঁকানি দিয়ে তাকে ধমক দিলাম।

"পাগলামি কোরো না-চলে এসো পা চালিয়ে।"

জোর করে সে হাত ছাড়িয়ে নেবেই।-"না, কিছুতেই আর যাব না আমি যাব না তোমার সঙ্গে আর। তুমি আমাকে ফের ওর হাতেই দিয়ে দেবে। তোমার কাছে আমি কিছু নই-এক কানাকড়ি আমার দাম নেই তোমার কাছে। যেদিকে খুশি আমি এখান থেকেই চলে যাব। আমায় তুমি ছেড়ে দাও- আমি...'।

আর ওর কথায় কান দিলাম না। হিড় হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে ছুটলাম।

উট থেকে নেমে পড়েছে ভৈরবী। বাধ্য হয়ে তাকে নামতে হয়েছে। মোটা কাছি প্রাণপণে ধরে টাল সামলাতে তাঁর দু হাতের চেটোয় ফোঁসকা পড়েছে। উট থেকে নেমে আমাদের না দেখতে পেয়ে তাঁর চক্ষু চড়কগাছ। এমন সময় খাড়া করে দিলাম, কুন্তীকে তাঁর সামনে।

"ধরো তোমার কুন্তীকে। ওর মাথাটাও বোধ হয় বেগড়াল এবার।"

"মাথায় কি হবে? শরীর আর বাছার বইছে না।" বলে পরম স্নেহে ভৈরবী তাকে জড়িয়ে ধরলেন।

ঊর্বশীকে বসিয়ে মণিরামকেও নামানো হল। তার জ্বর ছেড়ে গেছে। ভৈরবী শ্রীমান সুখলালকে বললেন, সেই ঝোলাটাও নামিয়ে আনতে। সবাই উদগ্রীব হয়ে উঠলাম কোন ঝোলা- কি আছে সেই ঝোলায়?

ঝোলা এলে তার ভিতর থেকে বেরুতে লাগল-পোড়ানো চীনাবাদাম, ছড়ানো পেঁয়াজ, খেজুর কিশমিশ মিছরি। অফুরন্ত ভাণ্ডার। আজ সারা দুপুর সেই কুয়োর মধ্যে বসে এই সব গোছানো হয়েছে। আমরা গোল হয়ে বসে পড়লাম। ভৈরবী সকলের কোলে মুঠো মুঠো দিয়ে গেলেন ভাগ করে। জয় জয় করে উঠল সবাই। রূপলালের পাশে বসে থিরুমল পরমানন্দে চর্বণ করতে লাগল। কোনো গোলমাল নেই। গোকুলদাস প্রথমে কিছুই নেবে না, পোপটলালের ধমক খেয়ে শেষে নিলে। শুধু কিশমিশ আর মিছরি পেলে মণিরাম, বাদাম তাকে দেওয়া হল না। জল খেয়ে সে আর খাঁটিয়ায় চড়তে রাজি হল না। সে এবার সকলের সঙ্গে আস্তে আস্তে হেঁটে যেতে পারবে। ভৈরবী কিছুতেই শুনলেন না-অগত্যা আবার মণিরামকেই খাঁটিয়ার উপর উঠতে হল।

কুন্তীর কাঁধে হাত রেখে ভৈরবী হাঁটতে লাগলেন। সকলেরই মেজাজ একটু ঠাণ্ডা হল। বুড়ো গুলমহম্মদের মুখের ভাবটাও যেন একটু নরম হল।

সুযোগ বুঝে বিনীতভাবে এবার আমিই বুড়োকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি শেখ সাহেব, আমরা কি এখনও অর্ধেক পথও পার হইনি?"

মুখ তুলে দূরের আকাশের দিকে তাকিয়ে একটু দাড়িতে হাত বুলিয়ে বার দুই মাথা নেড়ে শেখ সাহেব আন্দাজ করে উত্তর দিলেন-"খোদা মেহেরবান-আর ঘণ্টা তিনেকের মধ্যেই আমরা সামনের কুয়োর ধারে পৌঁছব।" বলে ঊর্বশীর মায়ের সঙ্গে আলাপ জুড়ে দিলেন।

আমরা অগ্রসর হলাম।

মেহেরবান খোদার অপার মেহেরবানিতে বেশ মশগুল হয়ে হাঁটছি আর ভাবছি।

ভাবছি অনেক কিছু। তলিয়ে দেখছি-তাঁর মেহেরবানির আর মর্জির দৌড় কতখানি।

কথায় কথায় আমরা বলে ফেলি, "প্রভু, তোমারই ইচ্ছা, সবই তোমার কৃপা।" এই কৃপাময়ের কৃপার বেড়ে কতটুকু কুলোয় তাই ভাবছি।

সব দিকে সব বেশ সচল অবস্থা, যেটি যেমন হওয়া উচিত তেমনই হচ্ছে, যেটি হওয়া বাঞ্ছনীয় নয় তা কখনো ভুলেও হচ্ছে না। যে কাজে হাত দেওয়া যাক তা এমন স্বচ্ছন্দে

অক্লেশে সমাধা হয়ে যাচ্ছে যেন আগে থেকে কার্যটি সমাপ্ত করা ছিল। কোথাও কিছু আটকাচ্ছে না। কাম্যবস্তুটি চট করে হাতের মুঠোয় এসে ঢুকছে, আর যেগুলি হাত ফসকে গেলে বুক চড়চড় করে ওঠে সেগুলি কিছুতেই হাত ফসকাচ্ছে না। ঠিক এইরকম যদি চালু থাকে আগাগোড়া, তবেই না পরম তৃপ্তিভরে বলা যায়, "সবই তাঁর দয়া, সবই তাঁর ইচ্ছা।"

আর তা যদি না হয়—তখন?

যদি একটার পর একটা গড়বড় শুরু হয়ে যায়, সবই যদি বেসুরো বাজতে থাকে—কোনো দিকে হাত বাড়ালেই হাতে ফোঁসকা পড়বার উপক্রম হয়, হেসে কথা কইতে গেলে সবাই দাঁত বার করে ভেংচায়, পদে পদে ঠোকর খেতে খেতে পা হয় ক্ষত বিক্ষত-তখন?

তখন আর মেহেরবানির কথা, দয়া কৃপা করুণা এই সমস্ত মিষ্টি বয়েগুলি মনের কোণেও আসে না। নিজের পোড়া নসিবের দোহাই পাড়া ছাড়া আর কিছুতেই সান্ত্বনা পাবার কোনো উপায় থাকে না তখন। লম্বা লম্বা নিশ্বাস জোরে জোরে বেরিয়ে আসে তখন কলিজা খালি করে। নিজের কপালে করাঘাত করে 'নিয়তি-সবই নিয়তির খেলা' বলা ভিন্ন আর কিছুই বেরোয় না তখন মুখ দিয়ে।

তাই ভাবছি আর হাঁটছি।

কোনটির ক্ষমতা বেশি-করুণাময়ের করুণা, না নিয়তির কুটিল পরিহাস? বরাতের ফের, না ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা? বিধির বিধান, না ভাগ্যের বিড়ম্বনা? কোনটি সত্য? কার উপর নির্ভর করে সমস্ত ভার ছেড়ে দিয়ে হাত-পা ঝেড়ে চুপ করে বসে থাকা যায়?

একটা কিছু অবলম্বন চাই তো। নয়তো এই যে অবিরাম ডুবছি আর ভাসছি, ভাসছি আর ডুবছি, এর থেকে পরিত্রাণ পাব কি করে? কি সে অবলম্বন যাকে আঁকড়ে ধরে থাকলে ডুবতে হবে না, ভাসতে হবে না-ভাগ্য, বরাত, বিধির বিধান, করুণাময়ের করুণা, খোদার মেহেরবানি-এর একটিকেও পরোয়া না করে স্বচ্ছন্দে বুক ফুলিয়ে চলাফেরা করা যাবে; বুক দুরদুর করবে না, হাত থরথর করে কাঁপবে না, চোখ ছলছল, পা টলটল, মন ধুকপুক এ-সমস্ত কিছুই ধার ধারতে হবে না?

সেই আঁকড়ে ধরার মতো অবলম্বনটির তল্লাসেই তো ছুটে মরছি। এই যে চলেছি এগিয়ে আরও সামনে, এরও ওই এক উদ্দেশ্য। ওই অবলম্বটিকে তল্লাস করে বার করা, পাকড়াও করা, তারপর বুকের মধ্যে সেটিকে পুরে নিয়ে ফিরে আসা-ব্যস, তা হলেই মোক্ষম লাভ, যাকে বলে একেবারে কেল্লা ফতে।

কেল্লা ফতে করতে চলেছি। ডাইনে বাঁয়ে কোনো দিকে নজর দেবার এখন ফুরসত কই! আর এখনই জুটছে যত সব আপদ বালাই, পা জড়িয়ে ধরে কাঁদছে।

কান্না আর সেই চিরকালের পুরনো প্রশ্ন, "আমার কি হবে?"

কি হবে তা আমি জানব কেমন করে? জানতে যাবই বা কেন? আর জানলেই বা বলতে যাব কোন্ দুঃখে? কি এমন গরজ আমার?

তোমার হবে কি? এর চেয়ে ঢের বড় প্রশ্ন-আমার নিজের কি হবে? সে প্রশ্নের মীমাংসা কে করে? আজ পর্যন্ত কত দরজায় কতবার মাথা খুঁড়লাম, কত পায়ে চোখের জল ঢালোম, কত আঁস্তাকুড় ঘাঁটলাম, কত ছোটা ছুটলাম, ফল কি পেয়েছি? কোথাও উত্তর মিলল না ওই প্রশ্নের যে, 'আমার কি হবে?' কেউ ওর উত্তর দিলে না, সবাই মুখ ফিরিয়ে নিলে। মুখের উপর কপাট বন্ধ করে দিলে বা মুখ টিপে হাসতে লাগল।

আমাকে প্রশ্ন করতে এসেছে, 'আমার হবে কি?' যা খুশি যেমন হোক—তাতে আমার কি? আমার কতটুকু ক্ষতিবৃদ্ধি। যত সব উড়ো আপদ! যেতে দাও, যেতে দাও—যত সব বাজে ফ্যাসাদ!

পাশ থেকে ভৈরবী একটি ধাক্কা দিলেন, চমকে উঠলাম।-"কি বকছেন গোঁ গোঁ করে, হাঁটতে হাঁটতে স্বপ্ন দেখছেন নাকি?"

"নাঃ কিছু নয়", বলে একটি বিড়ি ধরালাম।

বিড়িটি ধরিয়ে মুখ তুলে চেয়ে দেখি দিগন্তে আকাশচুম্বী এক নিকষকালো প্রাচীর

চোখের দৃষ্টি আড়াল করে দাঁড়িয়ে আছে। যেন ওইখানেই পৃথিবীর শেষ হয়ে গেছে।

পায়ের তলায় বালি কখন যে বড় বড় পাথরের চাঙড়ে পরিণত হয়েছে, খেয়াল করিনি। পদে পদে মুখ থুবড়ে পড়তে পড়তে সামলে নিচ্ছি। মাথার উপর বহু উঁচুতে তারাগুলি এখনও দপ্ দপ্ করে জ্বলছে, কিন্তু নীচে তকতকে ঝকঝকে বালি না থাকায় ওদের আলো আর কোনো কাজেই লাগছে না। কিসের উপর প্রতিফলিত হয়ে তারার আলো অন্ধকার ঘোচাবে এখানে। ক্রমেই ঘুটঘুঁটে আঁধারের মধ্যে আমরা প্রবেশ করতে লাগলাম।

উঁচুনিচু সরু অসমান পথে সাবধানে পা ফেলে আমরা এগোচ্ছি সামনের উট দুটির উপর নজর রেখে। ছোট-বড় ধারালো ভোঁতা নানা আকারের পাথর সর্বত্র ছড়ানো। তাও চোখে কিছু ঠাওর হচ্ছে না। হোঁচট খেয়ে বার বার হুমড়ি খেয়ে পড়তে পড়তে হাতে পায়ে যা সব ঠেকছে তাতেই মালুম হচ্ছে যে, যেখান দিয়ে আমরা চলেছি তাকে পথ বা বিপথ কিছুই বলে চলে না।

মাথার উপরের আকাশ ক্রমশ ছোট হয়ে আসতে লাগল। সামনের কালো দৈত্যটা ক্রমেই আরও বিরাট আকার ধারণ করল। আমাদের ডাইনে বাঁয়ে তার প্রকাণ্ড ডানা দুটো ক্রমেই ছড়িয়ে পড়তে লাগল। তখন একটা মজার খেলা আরম্ভ হল। আমরা যত এগোই সেই দৈত্যটাও তত পিছায়। এইভাবে পিছু হটতে হটতে সে তার অন্ধকার রহস্যময় গর্তের মধ্যে আমাদের টেনে নিয়ে যেতে লাগল। যেন এক জাদুমন্ত্রের প্রভাবে একান্ত অনিচ্ছা সত্ত্বেও আমরা এগিয়ে যেতে বাধ্য হচ্ছি।

সামনে থেকে গুলমহম্মদ বলে উঠল, "লা ইলাহা ইল্লালাহ্!" সেই সঙ্গে পুত্র দিলমহম্মদ গলা মিশিয়ে দিলে, "মহম্মদুর রসুলুল্লাহ।" আমরা থামলাম।

উট দুটিকে ঘিরে দাঁড়িয়ে চারিদিকের নিবিড় অন্ধকারের দিকে চেয়ে, ভয় বা ভরসা এর কোনোটিরই বোধ হল না। শুধু দেহে আর মনে একটা থমথমে অস্বিস্ত বোধ পাথরের মতো চেপে বসল।

এই ভাবটা কাটাবার জন্যেই বোধ হয় চিৎকার করে উঠল, "জয় হিংলাজ মাতাকি-"

"জয়!"

আরম্ভ হয়ে গেল, "জয় জয় জয় জয়।" চতুর্দিকের আঁধারের মধ্যে গা ঢাকা দিয়ে দাঁড়িয়ে শত শত অশরীরী "জয় জয়" করতে লাগল। ক্রমে ক্রমে সেই ধ্বনি উপরের দিকে উঠতে উঠতে পাহাড়ের মাথায় উঠে তবে থামল। আমরা আরও স্তম্ভিত হয়ে গেলাম।

তখন সকলেই ব্যস্ত হয়ে উঠল আলো জ্বালাতে, কাঠ খুঁজতে, জল আনতে। কুয়ো কই? জল কোথায়?

উট দুটিকে বসিয়ে মালপত্র নামানো হচ্ছে। মণিরাম নেমে এসে সামনে দাঁড়াল। গায়ে হাত দিয়ে দেখলাম জ্বর তার সত্যিই ছেড়ে গেছে।

রূপলাল পণ্ডিত থিরুমলকে সঙ্গে করে সামনে এসে দাঁড়ালেন। তারপর সাড়ম্বরে ঘোষণা করলেন পণ্ডিতজি যে, আগামী কাল শেষ রাত পর্যন্ত আমাদের ছুটি। এখান থেকে কাল রাত্রিশেষে রওয়ানা হয়ে পরশু বিকালের দিকে আমরা পৌঁছব চন্দ্রকূপ। সেখান পরশু রাতটা কাটিয়ে ভোরবেলা চন্দ্রকূপ-বাবার দর্শন করে তবে আবার রওয়ানা, তখন আর পথে কোথাও কোনো তকলিফ নেই।

শুনে সেইখানেই বসে পড়লাম। শুধু বসে পড়া নয়, একেবারে গা এলিয়ে দিলাম। যাক এতক্ষণে নিষ্কৃতি মিলল পুরো চব্বিশ ঘণ্টার মতো। নিশ্চিন্ত।

কিন্তু নিশ্চিন্ত হবার কি জো আছে! ভৈরবী উপস্থিত-পিছনে কম্বল ঘাড়ে কুন্তী।

কোথায় পাতব কম্বল?"

মুখে এল, "যে চুলোয় খুশি!" কিন্তু তা তো আর বলা চলে না। সুতরাং ঢোক গিলে কথাটিকে আবার পেটের মধ্যে চালান করে দিয়ে বেশ মোলায়েম করে বললাম, "দেখো না কোথায় সুবিধা হয়।" হাত বাড়িয়ে একখানা পাথর টেনে নিয়ে মাথার নীচে দিয়ে ওপাশ ফিরে শুলাম।

জানি এই পাহাড়ের গর্ভে এই আঁধারের অন্য কোথাও সুবিধা হবে না তাঁর। খোলামেলা জায়গায় তারার আলোতে আলাদা জায়গা পছন্দ করতে বাধত না। কিন্তু আজ আর অন্য কোনো চুলোয় যাবার সাহস নেই।

সেইখানে দাঁড়িয়েই একবার চারিদিকে দেখে নিলেন ভৈরবী। কম্বলগুলো ঘাড়ে করে কুন্তী পিছনে দাঁড়িয়ে আছে। শেষে তাকে হুকুম হল সেইখানেই কম্বল পাততে। তাই হল এবং সঙ্গে সঙ্গে সটান শুয়ে পড়ে একটা লম্বা "আ-।" উচ্চারণ করলেন তিনি।

কুন্তীকেও তাঁর পাশে শুয়ে পড়বার আদেশ হল। "কাজ নেই আর এই শেষরাতে রান্নাবান্নার হাঙ্গামা করে। ঘণ্টা দুই আর রাত আছে বড় জোর। এইটুকু সময় গড়িয়ে নিয়ে কাল সকালে রান্নার ব্যবস্থা করা যাবে। কি বলেন?"

কি আর বলব। কিছু না বলাই বুদ্ধিমানের কাজ, চোখ বুজে শুয়ে রইলাম।

ওধারে পটাপট শুকনো ডালপালা পুড়ছে। চটাচট শব্দ উঠছে হাতে করে আটা চাপড়ানোর। পোড়া রুটির গন্ধ ভেসে আসছে।

এলেন পোপটভাই। একান্ত কুণ্ঠিতভাবে নিবেদন করলেন যে, তিনি স্বহস্তে এই শেষরাতে রুটি বানাচ্ছেন আমাদের জন্যে। সেগুলি ভোজন করে তবে আমাদের ঘুমোতে হবে। এইটুকু কষ্ট আজ আমাদের করতে হবে নয়তো তিনি ছাড়বেন না।

তাঁর ঠিক পিছনেই দাঁড়িয়ে ছিল অফুরন্ত উৎসাহের আধার আমাদের শ্রীমান সুখলাল, তারও একটু সংবাদ আছে। সে চায়ের জল চড়িয়ে দিয়েছে। চা আনল বলে।

ওদের দুজনের পিছনে উপস্থিত শেখ সাহেব। ওরা চলে গেলে বুড়ো মাথার পাগড়িটা খুলে পাশে ফেলে থপ্ করে তার উপরে বসে পড়ল। বুড়োমানুষ, শরীর আর কত বয়!

তারও একটু জরুরি আরজি আছে, নয়তো এ সময় সে বিরক্ত করতে আসত না।

বললাম, "তবে আর একটু কষ্ট করে আরজিটা পেশ করে ফেলো।"

যৎসামান্য ব্যাপার। গুলমহম্মদের বক্তব্যে হচ্ছে এই-দু-দুটো দিন উট দুটো দাঁতে কুটো কাটতে পায়নি। এখনই তার ছেলে চলেছে উট নিয়ে চরাতে। সন্ধ্যার আগে সে ফিরবে না। সকলেই আগুন জ্বেলে রুটি পোড়াচ্ছে। তার অবশ্য আর রুটি চাইবার হক নেই। কারণ সে তো আগেই তাদের প্রাপ্য সমস্ত আটাটা নিয়ে নিয়েছে। তবু যদি প্রত্যেকে একখানা করে রুটি তাকে খয়রাত করে তবে বড়ই উপকার হয়, এখনই দিলমহম্মদ উট নিয়ে রওয়ানা হতে পারে। নয়তো রুটি বানিয়ে বেরুতে গেলে অনকে দেরি হয়ে যাবে। এ কয়দিন তো আর ওদের রুটি বানিয়ে হয়নি, তার বেটি কুন্তী-মায়ীর কৃপাতেই কাজ চলে গেছে।

বুঝলাম যে আমাদের শুয়ে পড়তে দেখে অন্য কোনো উপায় না করতে পেরে বুড়ো শেষে আমাদের কাছেই আসতে বাধ্য হয়েছে।

"বললাম, "বেশ তো, নাও গিয়ে সকলের কাছ থেকে একখানা করে রুটি চেয়ে।"

একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বুড়ো উত্তর দিলে, সে চেষ্টা সে ইতিমধ্যেই করেছে। ফলে সকলেই বিরক্ত হয়েছে। কেউ কেউ তাকে আইন দেখিয়েছে। একখানা রুটি পাওয়াই আইন। আর স্ব-ইচ্ছায় তামাম আটা হিসাব করে নিয়ে নিয়েছে তারা। এখন আবার রুটি চাইতে আসে কোন মুখে?

শুনে কুন্তী ধড়ফড়িয়ে উঠে পড়ল। দু-দিন উপবাসের পর না খেয়ে একটা লোক চলে যাচ্ছে আর সে আরাম করে শুয়ে থাকবে! কাঠ কই? চারটি লাকড়ি এনে দাও তাকে। পাঁচ মিনিটের মধ্যে খানা বানিয়ে দেবে সে।

গোলমাল শুনে পোপটভাই আবার ছুটে এলেন। তাঁর দু-হাতে আটা মাখা। সমস্ত শুনে কুন্তীকে উঠতে বারণ করলেন, "কই, গুলমহম্মদ ত আমার কাছে যায়নি, ওদের দুজনের রুটি তো ওখানেই বানানো হচ্ছে, "হল বলে, আর পাঁচ মিনিট—"

বুড়ো বললে, "তোবা তোবা! সে কি একেবারে বেশরম, ওখানে মহান্ত মহারাজের খানা বানানো হচ্ছে, ওখানে আগে থেকে সে যায় কি করে! তার চেয়ে চারটি বাদাম আর খেজুর যদি তাকে খয়রাত করি আমরা তাহলেই হাঙ্গামা চুকে যায়।"

রূপলাল এসে দাঁড়াল। হাতে একগাঁদা রুটি- ধোঁয়া বেরুচ্ছে। বললে, "আনলাম সকলের কাছ থেকে একখানা করে রুটি করে কেড়ে নিয়ে, এতেই আমার দোস্তের সন্ধ্যা পর্যন্ত চলে যাবে। এখন তোফা হয় খানিকটা গুড় পেলে।

গুড়, লঙ্কার চাটনি, পেঁয়াজ বার করে দেওয়া হল। দুটো লোটার গলায় গামছা দিয়ে দু-হাতে ধরে সুখলাল উপস্থিত। গেল ঢুকে গণ্ডগোল। চা-রুটি খেয়ে আর সারাদিনের রুটি বেঁধে নিয়ে দিলমহম্মদ উটসহ বেরিয়ে গেল। তখনও শুকতারা বিদায় নেয়নি।

আমরা খেতে বসলাম। পোপটভাই-এর বাড়ি থেকে আনা খাঁটি ঘি মাখানো পাতলা পাতলা গরম রুটি-রসুনের চাটনি সহযোগে আকণ্ঠ বোঝাই করে হিংলাজের জয়ধ্বনি দিয়ে যখন আমরা আবার শয়ন করলাম, তখন পাহাড়ের মাথার উপরের আঁধার পাতলা হয়ে আসছে, তবে নীচে তখনও বেশ জমাট অন্ধকার।

কিছুক্ষণ পরেই পাহাড়ের চূড়া থেকে একটা প্রকাণ্ড পাখি তার বিরাট দুই ডানা মেলে নেমে এল। সেই ডানার তলায় আমরা সকলে ঢাকা পড়লাম। সে পাখিটির নাম নিদ্রা, অপর নাম সর্বসন্তাপহারিণী, যার বুকের তলায় আশ্রয় পেয়ে সদ্য-পুত্রহারা জননী পুত্রশোকের জ্বালা ভুলে নাক ডাকায়।

নাক আমাদের ডেকেছিল কিনা তা সঠিক বলব কি করে? কেউই তো কারুর নাক ডাকার সাক্ষী থাকবার দরুন জেগে ছিলাম না!

নাক ডাকা বন্ধ হবার পর আবার যখন চক্ষু মেলে চাইলাম, তখন—

'চক্ষে আমার তৃষ্ণা, ওগো তৃষ্ণা আমার বক্ষ জুড়ে' গান জুড়ে দেবার বাসনা থাকলেও সামর্থ্যে কুলোল না। শেষরাতে আকণ্ঠ রুটি গেলার ফলে গলা শুকিয়ে এমনই কাঠ হয়ে গিয়েছিল যে, "ভৈরবী, একটু জল!' এটুকুও গলা দিয়ে বার হল না। বহুকষ্টে উঠে বসে ভৈরবীকে ডাকতে গিয়ে হঠাৎ যে দৃশ্য চোখে পড়ল তাতে চক্ষের নিমেষে চক্ষের তৃষ্ণা দুই-ই উধাও হয়ে উবে গেল।

হাঁ করে চেয়ে রইলাম।

কালো পাথরের পাহাড়, গাছপালা ঝোঁপ-জঙ্গল কিছুই নেই। পাথরের পর পাথর দিয়ে উঁচু করতে করতে সেটার মাথাটা আকাশের গায়ে ঠেকানো হয়েছে। কোনো ছাঁদ নেই ছিরি নেই। যুগ যুগ ধরে কারা যেন এই রাশীকৃত পাথর অন্য কোথাও থেকে বয়ে এনে এনে এখানে জমা করেছে। আর যারা এই কর্ম করেছে সেই অমিতবলশালী মহাবীরদেরই এক উপযুক্ত বংশধর ওই পাথরের স্তূপের মধ্যে থেকে বেরিয়ে এসে উপরে দাঁড়িয়ে নীচের সমস্ত সুপ্তিময় দলটিকে নিরীক্ষণ করছে।

ওই পাহাড়ের পটভূমিকায় মানুষটিকে, এমন চমৎকার মানিয়েছে যে, একটির থেকে আর-একটিকে আলাদা করে চিন্তা করা যায় না।

সাধারণ মানুষ তাকে কিছুতেই বলা চলে না। বলা উচিত একটি নরপর্বত।

লোকটির দৈর্ঘ্য যদি হয় সাড়ে পাঁচ ফুট, প্রস্থ হবে অন্তত সাড়ে চার ফুট। এমন চার চৌকো মানুষ জীবনে আর কখনো সামনে পড়েনি। চৌকস কথাটি যদি কারও নামের আগে জুড়ে দিতে হয়, তবে এই-ই হচ্ছে একমাত্র উপযুক্ত পাত্র।

লোকটির শরীরে মেদ নেই, ভুঁড়িও নেই। ঘাড় গর্দান কিছু নেই। হাড়মাংসে গড়া সেই নিরেট পিণ্ডের দু-পাশে অত্যধিক খাটো যে দুটি জিনিস আটকানো রয়েছে, ওই ওর হাত। অন্তত দশ-পনেরো জনের ভাত রেঁধে যাওয়া চলে এমনি মাপের একটা পোড়া তিজেল হাঁড়ি ওর দেহের উপর বসানো আর সেই তিজেলের গায়ে আটকানো রয়েছে এক থ্যাবড়া নাক। নাকের দু পাশে দুই চক্ষু যা দিয়ে আমাদের উপর নজর নিক্ষেপ করছে। চক্ষু দুটির দিকে চেয়ে চট করে দ্বারিকের দোকানের চার আনা দামের পানতুয়ার কথা মনে পড়ে গেল। সবচেয়ে বেখাপ্পা হচ্ছে তার মাথার উপরের টুপিটি। সেই বিশাল মস্তকের ঠিক মাঝখানটিতে উপুড় করে বসানো রয়েছে-ইঞ্চি দেড়েক উঁচু চারিদিকে জাফরি কাটা একটি কাপড়ের বাটি। কি উপায়ে যে সেটি ওখানে আটকে রয়েছে কে জানে!

সেই নরপর্বত অল্প কিছুক্ষণ অচল রইলেন। তাঁর পানতুয়া-প্রতিম চোখ দুটি থেকে নীচে শোয়া ঘুমন্ত মানুষগুলির উপর দুটি অদৃশ্য ঘোলাটে জ্যোতি গড়িয়ে গড়িয়ে ঘুরতে লাগল। শেষে তিনি সচল হলেন। তারপর সেই সচল বপুখানি তরতর করে নেমে আসতে লাগল, একটা পাথর থেকে আর একটি পাথরের উপর টপাটপ লাফাতে লাফাতে অক্লেশে, অনায়াসে, অবলীলাক্রমে-যাকে বলে লঘু পদক্ষেপ। অত বড় একটা বস্তুকে অমন হালকা ভাবে চালিয়ে নিয়ে আসতে কি প্রচণ্ড শক্তির প্রয়োজন তাই চিন্তা করে হাঁ করে চেয়ে রইলাম।

একমাত্র আমিই উঠে বসে আছি-আর সকলেই ঘুমে অচেতন-সে তো এগিয়েই আসছে। এসে পড়ল বলে আমাদের উপর। চিৎকার করে সকলকে জাগাবার জন্য হাঁ করলাম, গলা দিয়ে আওয়াজ বেরুল না। উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করলাম-পারলাম না-হাত-পা অসাড়। নিরুপায় হয়ে চোখ বুজলাম।

“সালাম আলোকুম!” একটি বছর আষ্টেকের কিশোরীর গলার স্বর। চমকে চোখ চাইলাম। সামনে দাঁড়িয়ে তিনি। পাহাড়টা তাঁর আড়ালে লুকিয়েছে। তাঁর পক্ষে যতটা সম্ভব ততটা সামনের দিকে হেঁট হয়ে আবার বললেন, “সালাম আলেকুম। বিলকুল একটি ছোট মেয়ের মিষ্টি কণ্ঠধ্বনি। বহু চেষ্টায় উচ্চারণ করলাম, “আলেকুম সালাম।” নিজের গলার আওয়াজ নিজেই শুনতে পেলাম না। তিনি হাসলেন। ধড়ে প্রাণ ফিরে এল।

আলাপ-পরিচয় হল। নাম তার শেরদিল। দুশমন খাঁ নাম হলেও আমার আপত্তি করবার কিছু ছিল না। ভদ্রলোক এখানকার কুয়ার রক্ষক। এই পাহাড়ের এক চমৎকার গুহায় সপরিবারের বসবাস করেন। আরও উত্তরে পাহাড়ের পিছন দিকে তাঁর খেত-খামার ছাগল উট সমস্তই আছে। বড় বড় ছেলে আছে তাঁর, তারাই সেসব দেখাশুনা করে। এখানে তিনি এই খোদার খিদমতগারি নিয়েই শেষ জীবনটা গুজরান করছেন।

কথা বলছিলেন তিনি তাঁর দুখানি বেঁটে বেঁটে হাত সজোরে আমার নাকের সামনে নাড়তে নাড়তে। অনর্গল বলে যাচ্ছিলেন তাঁর যা খুশি সেই ছেলেমানুষি গলায়! আর আমি কোনো মতে হাঁ-না ইত্যাদি দিয়ে আলাপটা চালু রাখছিলাম- আমার নিজের পায়ের গোছের চেয়ে ঢের সুস্পষ্ট তাঁর হাতের কব্জি দুখানির উপর নজর রেখে, বার বার এদিক ওদিক তাকিয়ে দেখছিলাম আর ছটফট করছিলাম গুলমহম্মদের জন্যে, এ সময় সে আবার গেল কোথায়?

শেরদিল তখন আমাকে বোঝাচ্ছেন, এখানে বিন্দুমাত্র কোনো তকলিফের কোনো সম্ভাবনা নেই। কাঠ জল সমস্ত মজুত। আর তার মতো খিদমতগার উপস্থিত থাকতে কোনো ভয়ের কারণ নেই। অনায়াসে আমরা দিন দুই আরাম করতে পারি তাঁর আশ্রয়ে।

“আল হামদোলিল্লাহ!”

পিছন ফিরে দেখি গুলমহম্মদ উপস্থিত। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলাম।

ওরা দুজনে আঁকড়ে ধরলে। বোধ হয় উভয়ে উভয়ের দাড়িগোঁফের জঙ্গলে বার বার চুম্বন দিলে কয়েকটা। হুড়মুড় করে দুজনে একসঙ্গে অনর্গল যা মুখে এল বলতে লাগল। সেই মহা শোরগোলে সকলের ঘুম ভেঙে গেল, যে যার বিছানায় উঠে বসে স্তম্ভিত বিস্ময়ে সেই জাপটাজাপটি দেখতে লাগল হাঁ করে।

অবশেষে ওদের শরীরে আর মনের উথলে-ওঠা আহ্লাদটা একটু ঝিমিয়ে এলে পর ওরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হল। তখন গুলমহম্মদ মস্ত ভূমিকাসহ আরম্ভ করলে তাঁর পরিচয় দিতে। নাম তাঁর শেরদিলই বটে। কারণ দিলটা এঁর বিলকুল শেরের মতোই। তাঁর নামে এ মুল্লুকের সকলেরই দিল কেঁপে ওঠে। বহু বহু বেয়াকুফ বেয়াদব এঁর হাতে শায়েস্তা হয়েছে। আবার এঁর দয়ারও অন্ত নেই। লোকের বিপদে আপদে নিজের বুক ইনি পেতে দেন, তখন আর শত্রু-মিত্র বাছ-বিচার নেই। এঁকে যে এখানে এখন পাওয়া যাবে এ হচ্ছে আশাতীত ব্যাপার। চাকর-বাকর দিয়েই ইনি এই কুয়া রক্ষার কার্যটি চালিয়ে নেন, এবার যে স্বয়ং উপস্থিত আছেন এ একমাত্র জোর নসিবের ফল বলতে হবে।

আমরাও একবাক্যে সে-কথা বলতে কসুর করলাম না। বৎস রূপলাল তার পণ্ডিতি পরিত্যাগ করে শেরদিলের পিছনে পিছনে ঘুরতে লাগল। তিনি ঘুরে ঘুরে তদ্বির তদারক করতে লাগলেন। দলের দু-দুটো আওরাত আছে দেখে গুলমহম্মদকে অনুরোধ করলেন এখনই তাঁর গুহায় উঠে গিয়ে তাঁর বিবিকে সংবাদটা জানাতে। গুলমহম্মদ তৎক্ষণাৎ উঠে গেল। তারপর তিনি আমাদের সকলকে উঠিয়ে নিয়ে গেলেন আরও খানিকটা উপরে একটা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন সমতল জায়গায়। সেই স্থানটির চারিদিকে খাড়া পাহাড় উঠে গেছে। স্থানটি ছায়াশীতল 1

একটি সরু গলির মতো পথ বেয়ে বেশ অনেকটা উঠে তারপর ফের খানিকটা নীচে নেমে আমরা সেখানে পৌঁছলাম। পৌঁছে চারিদিকে চেয়ে দেখতে দেখতে হঠাৎ খেয়াল হল-এ কি-এলাম আমরা কোন পথ দিয়ে?

চারিদিকে খাড়া পাহাড়, সব একরকম দেখতে। কোন পথ দিয়ে যে এসে পৌঁছলাম তার আর কোন চিহ্ন নেই। যে ফাঁকটি দিয়ে নেমে এলাম এইমাত্র, সেটি বেমালুম লোপ পেয়ে গেল। সকলেই দাঁড়িয়ে পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছি, এ আবার কোনো ফাঁদে পড়লাম না তো রে বাবা!

আমাদের সকলের আগে শেরদিল মহাশয় এখানকার সুখ-সুবিধাগুলির ফিরিস্তি দিতে দিতে এগিয়ে চলেছেন। এখানে দিনভর রোদ লাগবে না, উড়ন্ত বালির জ্বলন্ত ঝাঁপটারও ভয় নেই, জল একেবারে হাতের কাছে। কাজেই তাঁর স্থানটিকে বেহেস্ত বললে বাড়িয়ে বলা হয় না।

বাড়িয়ে কমিয়ে বলাবলির কথা তখন আমাদের মাথায় উঠেছে। সশরীরে বেহেস্তে ঢুকে পড়ে তখন মাথার মধ্যে দুমদাম হাতুড়ির ঘা পড়ছে, কি করে কোন ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে পড়ে এই বেহেস্ত থেকে উদ্ধার পাওয়া যায়।

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে পিছন ফিরে আমাদের সকলকে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে শেরদিল হাঁ হয়ে গেলেন। শেষে সকলের মুখের পর একবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে হা-হা করে হেসে উঠলেন তাঁর সেই ছেলেমানুষী গলায়। তারপর ফিরে এলেন আমাদের কাছে। কিন্তু থামলেন না আমাদের সামনে। আমাদের পাশ কাটিয়ে তরতর করে উঠে গেলেন পাহাড়ের হা বেয়ে। আমরা দলসুদ্ধ সকলে ফিরে দাঁড়িয়ে চেয়ে দেখছি তাঁর সেই স্বছন্দ পর্বতারোহণ। উঠতে উঠতে টুপ করে অদৃশ্য হয়ে গেল তাঁর সেই বপুখানি। কেবল কানে বাজতে লাগল তাঁর হাসির প্রতিধ্বনি।

একবারে চক্ষুস্থির!

কয়েকটি মুহূর্ত গড়িয়ে গেল, সকলের দৃষ্টি পাহাড়ের গায়ের সেই স্থানটির উপর, যেখানে শেরদিল মিলিয়ে গেলেন। তারপর দৌড়ল রূপলাল সেই পথে, যে পথে এইমাত্র শেরদিল উঠে গেছেন। উঠতে উঠতে ঠিক সেই স্থানটিতে পৌঁছে সেও ফস করে আমাদের এত জোড়া চক্ষুর সামনে একেবারে উবে গেল। যেন ওখানটায় পৌঁছনোমাত্র পাহাড়টা টপ করে গিলে ফেলল তাকে।

তাজ্জব কাণ্ড!

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে সকলে সেইদিকে চেয়ে আছি। চোখের পলক পড়ছে না, বুকের ধুক ধুক শব্দ নিজের কানে শোনা যাচ্ছে।

হঠাৎ আবার সেই অপূর্ব মধুর হাসি, হা হা হা হা। পরমুহূর্তে শেরদিল রূপলালকে ধরে নিয়ে ঠিক সেইখানটি থেকে বেরিয়ে নীচে নেমে আসতে লাগলেন।

শেষে যখন বোঝা গেল যে ওইটেই পথ, ওই পথেই আমরা নেমে এসেছি-লজ্জায় এতটুকু হয়ে যাওয়া ভিন্ন আর উপায় কি?

পণ্ডিত রূপলাল কিন্তু অপ্রতিভ হওয়ার পাত্র নয়। নেমে এসে দলপতি-জনোচিত এক হাঁকার দিলে-"চলে এসো জলদি আমার সঙ্গে কুঁজো নিয়ে, যার যার জলের দরকার।" যেন কুয়োটা কোথায় এইটুকু জানবার জন্যেই সে ছুটে গিয়েছিল শেরদিলের পিছু পিছু।

যাক। আবার আরম্ভ হল ঘর-গৃহস্থালি সাজানো সামনের সারা দিনটা আর অর্ধেক রাত্রির জন্যে।

স্থানটি প্রায় গোলাকার আর বেশ চাঁচাছোলা। অন্তত পাঁচশো লোক আরামে শুয়ে থাকতে পারে। মনে হল যেন মস্ত একটা কুয়োর তলায় শুকনো তকতকে বালির উপর আমরা নেমে পড়েছি।

শেরদিল সকলকে নির্দেশ দিলেন পাহাড়ের কোল ঘেঁষে কম্বল পাঁততে; আমাকে নিয়ে চলে এলেন একবারে উত্তর প্রান্তে।

সেখানে পড়ে ছিল একখানা হাত পাঁচ-ছয় লম্বা আর হাত তিনেক চওড়া কালো পাথর, উপরটা একেবারে সমান না হলেও শোওয়া-বসা চলতে পারে। তার উপর পড়ল আমার কম্বল, আর সেই কম্বলের উপর আমাকে বসিয়ে শেরদিল তৃপ্তির সঙ্গে বললে, 'ইয়া!" বলে কোমরের দু-পাশে দু-হাত রেখে অল্পক্ষণ চেয়ে রইলেন আমার দিকে। তারপর চলে গেলেন অন্য সকলের সুখ-সুবিধার ব্যবস্থা করতে।

সেই হাত-দেড়েক উঁচু পাষাণ-সিংহাসনের উপর চেপে বসে চক্ষু মুদিত করে আমিও মনে মনে একেবারে না বলে পারলাম না, "ইয়াঃ!" এ হেন স্থানে এ হেন আসনে বসে মন আর মেজাজ দুই-ই বাগ মানতে চাইল না, উড়তে লাগল খেয়ালের আকাশে।

তৎক্ষণাৎ দৃশ্য পরিবর্তন হল।

সেই দৃশ্য আমি স্বয়ং হলাম এক দুর্দান্ত পাহাড়ি দস্যুসর্দার, আর আমার সঙ্গী সাথীরা আমার উপযুক্ত শাগরেদ। বড় রকমের একটা লুটপাট সুসম্পন্ন করে আমরা সবেমাত্র আড্ডায় ফিরেছি। দলপতির সম্মানিত উচ্চাসনটি দখল করে বসে চারিদিকে শাগরেদদের কার্যকলাপ অবলোকন করছি। আমার সম্মান বাঁচিয়ে ওরা দূরে গোল হয়ে বসেছে। সামনের ফাঁকা জায়গায় এখনই নাচ আরম্ভ হবে।

আরম্ভ হল নৃত্য।

বনবন করে ঘুরতে ঘুরতে কোথা থেকে উদয় হল একটি নর্তকী। প্রকাণ্ড ঘেরের ঘাঘরা তার পরনে। ঘাঘরার নীচের দিকে আধাহাত সোনালি জরির কাজ। গায়ে আঁটা লাল রঙ্গের কাঁচুলি। বুকের নীচ থেকে নাভি পর্যন্ত অনাবৃত। কোমর এত সরু যে হাতের মুঠোয় ধরা যায় ।

প্রচণ্ড বেড়ে সে ঘুরছে। ঘুরছে আর তার ঘাঘরার জরির কারুকার্য অনেক দূর পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ছে, তাতে তার হাঁটু পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে। অতি দ্রুত তালে বাজছে বাজনা, তার সঙ্গে মিশিছে তার পায়ের ঘুঙুরের শব্দ। সমস্ত মিলেমিশে একসঙ্গে এমন এক অদ্ভুত ধ্বনির তরঙ্গ তুলেছে যে, দর্শকদের শরীরের রক্তের মধ্যে প্রবল আলোড়ন উঠেছে। সকলের চোখে-মুখে উত্তেজনার ছাপ ফুটে উঠেছে। মেয়েটি নৃত্যের তালে তালে ঘুরতে ঘুরতে আমার দিকেই এগিয়ে আসতে লাগল। ঠিক আমার সামনেই বারকতক ঘুরপাক খেয়ে সে থামল, আর সেই মুহূর্তেই তেহাই পড়ল ঢোলে। একেবারে স্তব্ধ। ...

চোখ মেলে চাইলাম... সামনে দাঁড়িয়ে স-কুন্তী ভৈরবী। দুজনের একজনও ঘাঘরা পরে না, সাদা-সাপটা শাড়ি মাত্র ।

মেজাজটা খিঁচড়ে গেল। অমন একটা মুখরোচক ব্যাপারের শেষটুকু আর দেখা হল না। অদৃষ্টটাই এমনি বটে।

ভৈরবীর সেই এক প্রশ্ন-"কোথায় পাতব কম্বল?" এবার মুখে এল, 'জাহান্নামে'। ঢোক গিলে ফেললাম, ফেলে আসন ছেড়ে নেমে এলাম। হাত নিশপিশ করছিল একখানা চাবুকের জন্যে, এ হেন অবস্থায় এ হেন বে-আদবির দরুন দস্যুসর্দার হিসাবে চাবুক চালানোই আমার একমাত্র কর্তব্য। কিন্তু চাবুক কোথায়? ঠিক সময়ে ঠিক জায়গাটিতে যেটির প্রয়োজন সেটি ত থাকবে না কিছুতেই। কি করি, ওদের দিকে রক্তচক্ষু হেনে একটা লোটা হাতে নিয়ে সোজা চলে গেলাম সেই দিকে যেখানে একটু আগে শেরদিল আর রূপলাল নেমে এসেছে।

মন-মেজাজ ঠাণ্ডা করে আবার যখন এলাম ঘণ্টাখানেক পরে, তখন আরও দুজন

লোক বেড়েছে দলে। গুলমহম্মদ ফিরে এসেছে শেরদিল-গৃহিণী আর তার চাকরানিকে সঙ্গে নিয়ে। আমার আসনের অনেকটা দূরে ডান দিকে পাহাড়ের কোল ঘেঁষে ওঁরা সংসার পাতছেন। বিলি-ব্যবস্থা করছেন শেরের পত্নী তাঁর চাকরানির উপর হুকুম চালিয়ে। বাঁ দিকে বসেছে বড় কলকের বৈঠক, শেরদিলকে মাঝখানে নিয়ে। ওখানটায় ধোঁয়ায় ধোঁয়াকার।

নিজের উচ্চাসনের উপর গুছিয়ে বসলাম এসে।

এবার একটু চা হলে হত। গেল কোথায় শ্রীমান সুখলাল?

বাঁ হাতে নাকে আঁচল চাপা দিয়ে ডান হাতে একটা কালো ভাঁড় নিয়ে কুন্তী উপস্থিত। ভাঁড়টা সামনে নামিয়ে উপরকার ঢাকাটা দিলে খুলে।

ওরে বাপ রে, একেবারে দম আটকে আসবার যোগাড়! কি ওটা, সরাও সরাও!”

তাড়াতাড়ি ঢাকাটা ভাঁড়ের মুখে চাপা দিয়ে কিছু দূরে ওটাকে সরিয়ে রাখলে কুন্তী, তারপর নাকের উপর থেকে আঁচল সরিয়ে হেসেই খুন।

জিজ্ঞাসা করলাম, “ওই ভাঁড়টায় কি? মারা পড়েছিলাম যে এখনই!”

হাসি সামলে কুন্তী বলল, “বকরির ঘি।”

বললাম, “বকরির ঘি এখানে এল কোত্থেকে? খুলনার কবরেজ মশায় ছাগলাদ্য ঘৃত বানাতে জানেন, এই পদার্থ এত দূরে পৌঁছল কি করে?”

কুন্তী বললে, “আমাদের জন্য ভেট এনেছেন শেরের গৃহিণী। ও খেলে শরীরের জ্বালা জুড়াবে, তাগদ বাড়বে, মেজাজ শরীফ থাকবে, পেটের গোলমাল...”

বললাম, “থামো, থামো, আর বলতে হবে না। আমি সমস্ত জানি। বাত সারবে, গোদ পালাবে, গণ্ডগোলে ফেঁসে গিয়ে চুপসে যাবে, টেকো মাথায় চুল গজাবে, নড়নড়ে দাঁত শক্ত হয়ে খাসির হাড় চিবোবে—এ সমস্ত আমার মুখস্থ আছে, কিন্তু ওই ছাগলাদ্য তো এ-দেশের ওরাও বানাতে জানে তা তো জানতাম না!”

কুন্তীর হাসি ততক্ষণে উবে গেছে, চোখ দুটো বড় বড় করে জিজ্ঞাসা করলে, “কেন, বকরির ঘি বানানো শক্ত কি? গোরুর দুধ থেকে যে ভাবে ঘি হয়, এ ঘিরিও ছাগলের দুধ থেকে সেইভাবেই বানিয়েছে।”

এবার আমার চক্ষু ছানাবড়া হবার পালা। এতকাল শুনে আসছি-ছাগলে কি না খায়, পাগলে কি না বলে! আজ স্বচক্ষে দেখবার সৌভাগ্যে হল যে ‘কি না খেয়ে ছাগলে দুধ দেয়—তা থেকে ঘৃত বানানো যায় ৷

কিন্তু ঘৃত বস্তুটি—শুনেছি দেবভোগ্য।

হায়, কে বলে দেবে সে দেবতার নামটি কি—যাঁর ভোগে লাগবে এই ঘৃত, যাঁর প্রতি বিন্দুটিই এতদূর মারাত্মক রকমের খাঁটি যে, দুগন্ধ শুঁকেই আমার মতো সামান্য জীবের প্রাণ গিয়েছিল আর কি!

কুন্তীকে বললাম, “এখনই ফেরত দাও ওই সাংঘাতিক জিনিস, নয়তো দলসুদ্ধ সকলের একটা বিপদ ঘটবে।”

দু-আঙুলে চওড়া ছোট্ট কপালটিকে যতদূর সম্ভব কুঁচকে ভয়ানক চিন্তায় পড়ে গেল কুন্তী।

“তা কি করে দেওয়া যায়, তাহলে যে ওদের অপমান করা হবে!”

অপমান করা হবে? আমিও ভুরু কুঁচকে কুন্তীর মুখের দিকে চেয়ে রইলাম।

আর যা কিছু করা যাক, এখানে বসে শেরদিল যাতে অপমান বোধ করবেন এমন কিছু করবার কথা মনেও আনা যায় না।

দুধের মতো সাদা আস্ত একখান কাপড় দিয়ে তৈরি পায়জামা পরিহিতা-শ্রীমতী শেরদিলকে সঙ্গে নিয়ে এগিয়ে এলেন ভৈরবী। হাত দশেক দূর থেকেই শ্রীমতী দু তিনবার নত হয়ে আপন কপালে হাত ঠেকালেন।

উঠে দাঁড়াতে হল।

একমাত্র দুটি চোখ আর সাদা ভুরু জোড়া ছাড়া, মাথা মুখ নাক গলা বুক একেবারে কোমর পর্যন্ত তাঁর ঢাকা একখানি মিশমিশে কালো সিল্কের চাদর দিয়ে। কপালে ছোঁয়াবার সময় একখানি হাতের যেটুকু দেখা গেল তাতে বোঝা গেল যে, অন্তত ষাটের কোঠা তাঁর পেরিয়ে গেছে। তা না হলে চামড়া অত কোঁচকায় না।

তাঁকে এধারে আসতে দেখে স্বামী শেরদিলও কলকের বৈঠক ছেড়ে উঠে এলেন। এসে আদব-কায়দা মাফিক পরিচয় করিয়ে দিলেন।

তখন সেই কালো কাপড়ের ভেতর থেকে কি কতকগুলো বাক্য-স্রোত গড়গড় করে বেরিয়ে আসতে লাগল।

শেরদিল তার তরজামা করে বুঝিয়ে দিলেন যে, আমাদের আগমনে তাঁর স্ত্রী কি খুশিই হয়েছেন! ‘নানী কি হজ’ যাত্রায় অতদূর থেকে আওরত এসেছেন। বিশেষত জীবনে তো তিনি কলকাতার আওরত দেখেননি। এ তাঁর একান্ত নসিবের জোর যে কলকাতার আওরত দেখতে পেলেন।

প্রমাদ গুনলাম।

খাল-বিল-হোগলা-কুমির বাঘের দেশ হচ্ছে বরিশালের দক্ষিণ সীমা। সে দেশকে যমের দক্ষিণ দরজা বললেও বাড়িয়ে বলা হয় না। সেখান থেকে এসেছেন ভৈরবী। সেখানকার ঠেঙাড়ে ভাষা, চালচলন—এক কথায় সেখানকার কৃষ্টি আর সংস্কৃতির তিনি জলজ্যান্ত প্রতিনিধি। তাঁকে দেখে যদি এই মরুবাসিনীর কলকাতার আওরত দর্শনের সাধ মেটে, তবে সেটা যে একেবারে হরিপালের করমচা চিবিয়ে কাশ্মীরি আঙুর খাওয়ার শখ মেটানো হবে!

প্রবল প্রতিবাদ করে আদত কলকাতা-বাসিনীদের রূপগুণ পোশাক-পরিচ্ছদ চালচলন ইত্যাদি সম্বন্ধে একটি সুচিন্তিত ভাষণ দেবার জন্যে চুলবুল করতে লাগল। কোনো ফল হবে কিনা ভেবে না পেয়ে ঢোক গিলে ফেলে দাঁত বার করে নীরব হাস্য করে কৃতজ্ঞতা জানালাম।

তারপরই উঠে পড়ল সেই ছাগলাদ্য ঘৃত প্রসঙ্গ।

শেরদিল-পত্নী তাঁর স্বামী মারফত জানালেন যে, ওই সামান্য জিনিসটুকু যদি আমরা গ্রহণ করি তবে তিনি ধন্য হবেন। ওই মহামূল্য দ্রব্য তাঁর নিজের হাতে বানানো একেবারে সর্বগুণ সম্পন্ন সর্বরোগহর বস্তু। অতএব

সভয়ে কিছুদূরে বসানো ভাঁড়টির দিকে একবার চাইলাম। তারপর মাথা চুলকে উভয়কে আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ করলাম।

ভৈরবীর মুখের দিকে চয়ে দেখি তিনি ঘাড় হেঁট করে নিজের পায়ের আঙুলের নখের শোভা দর্শনে একান্ত ব্যস্ত।

কুন্তী তার আঁচলের খুঁটটা নিজের মুখে পুরছে, তবু, তার নাক মুখ চোখ দিয়ে হাসি উপচে পড়তে চায়।

শেষে মরীয়া হয়ে শুরু করলাম, "আপনার মতো বন্ধু পথে পাওয়া যে কত বড় সৌভাগ্যের কথা এ আর মুখে কি করে বলি! আর ওই ঘি যে কত বড় অমৃততুল্য জিনিস সে কথা কি আর আমরা জানি না? কিন্তু কি করব, আমাদের যিনি গুরু, মানে ওস্তাদ, তাঁর আদেশমতো ওই সমস্ত ভালো ভালো জিনিস আমরা ছুঁতেও পারি না। সবই ত্যাগ করতে হয়েছে কি-না-এই যাকে আপনারা 'কোরবান' বলেন—তাই আর কি। এখন কি যে করি—"

বলে উভয়ের চোখের দিকে চাইলাম।

নাঃ দপ করে জ্বলে ওঠেনি চোখ আমার কথা শুনে। সেদিক থেকে মুখ ফিরিয়ে কুন্তীর দিকে চেয়ে দেখি হাসির তোড় সামলাতে গিয়ে সে কাঁপছে।

জলদি চা বানাবার হুকুম দিয়ে তাকে তাড়ালাম।

তখন জুত করে বসে ওরা কলকাতার গল্প শুনতে বাসনা প্রকাশ করলেন।

তথাস্তু। শুধু কলকাতার কেন খাস লন্ডন শহরের গল্পও করতে এখন আমার আপত্তি নেই। ছাগলাদ্যের হাত থেকে নিষ্কৃতি মিলেছে এ কি কম কথা!

ভৈরবীকে বললাম, "এঁদেরও ভাত চড়াওগে যাও। ঘি ছোট এলাচ আর কিশমিশ পেস্তা বাদাম ছাড়তে যেন ভুল না হয়। প্রত্যেক দিন দু-বেলা কলকাতার লোকে কি খেয়ে বেঁচে আছে তা এঁরা মালুম করে যান। একেবারে কলকাতাটা চাখা হয়ে যাক।

গম্ভীর মুখে ভৈরবী উঠে গেলেন।

কলকাতাটা কেমন পদার্থ তার বর্ণনা শুরু করলাম।

ঘণ্টা দু-এক পরে তখনও আমি বলে যাচ্ছি-"কলকাতার লোক মোটে হাঁটে না, হুস হুস কলের গাড়ি চেপে যেদিকে ইচ্ছে চলে যায়। সব্‌সে তাজ্জব ব্যাপার হচ্ছে, কলকাতায় যে সমস্ত আশমান-ছোঁয়া বাড়ি আছে সেই সমস্ত বাড়িতে দিন রাত হুড়হুড় করে জল পড়ছে তো পড়ছেই, এমনই সব আজব কল লাগানো আছে, কলকাতায় কখনো আঁধার হয় না, কলের চিরাগ জ্বলছে তো জ্বলছেই। তারপর আরও আছে, খিদে পেলে কলকাতার লোকের আর কোনো কথা নেই, তখনি ছুটে গিয়ে দোকান থেকে লাড্ডু মেঠাই কিনে পেট ভরে খেয়ে তবে নিশ্চিন্ত। তার সঙ্গে চালায় আঙুর বেদানা আপেল যত খুশি।

হঠাৎ শেরদিল জিজ্ঞাসা করে বসলেন, "কলকাতার লোক বিবাহ করে কটি করে?"

প্রশ্নের মতো প্রশ্ন। গুটিকতক করে বিবাহ করেন বললে কলকাতার লোকের ইজ্জতটা বাড়বে, না একটিমাত্র বিয়ে করেন বললে এঁরা খুশি হবেন? চিন্তায় পড়ে গেলাম।

এমন সময় শ্রীমান সুখলাল এসে সুসংবাদ দিলে –খানা প্রস্তুত ৷

আর কথা বাড়ানো কাজের কথা নয়। আপাতত কলকাতার লোকের মান-ইজ্জষ্টা তো বাঁচুক। হই হই করে ওঠে পড়লাম ওঁদের নিয়ে।

খাওয়া-দাওয়ার পরে ওঁরা বিদায় নিলেন। রূপলাল আর গুলমহম্মদ ধরে বসল যে, সন্ধ্যায় গানের আসর বসবে, শেরদিল যেন দয়া করে বাজানা সঙ্গে আনেন। কলকাতার খানা হজম করবার জন্যে শেরদিল পত্নীসহ চলে গেলেন নিজের গুহায়।

আমরাও গড়িয়ে নেবার আশায় তোড়জোড় শুরু করলাম। স্থানটি সত্যিই তেতে উঠল না। অনেক উঁচু দিয়ে সূর্যদেব নিজের বাঁধাধরা পথে ধীরে ধীরে এগিয়ে চললেন পশ্চিম দিকে। গর্তের মধ্যে পড়ে আছি আমরা, আজ আমাদের পাত্তা পাবেন কি করে তিনি? কি আফসোস!

একটি লম্বা ঘুম দেওয়া গেল-নিরেট নিশ্চিদ্র নিখুঁত নিদ্রা-যতক্ষণ পর্যন্ত না শেরদিল ফিরে এলেন টোল নিয়ে। তাঁর স্ত্রী এলেন আরও একটু পরে ঠিক সন্ধ্যার পূর্বেই।

গোটাচারেক আলো জ্বেলে ফেলতে হল। তাতে কি হবে? অন্ধকারটা যেন আরও দানা বেধে উঠল।

যে যার আসন কম্বল টেনে নিয়ে এল আমার সামনে। দিনের বেলা ছড়িয়ে থাকতে কারও আপত্তি নেই, কিন্তু সন্ধ্যার পর সকলের কাছাকাছি ছোঁওয়া-ছুঁয়ির মধ্যে থাকা চাই। জয়াশঙ্করজি এইটুক করে গেছেন। তাঁর বিদায় আমাদের এক-প্রাণ এক-মন এক-আত্মা করে দিয়ে গেছে।

পোটলাল ভাই একবার লোক গুনে নিলেন। রূপলাল দেখে নিলেন সকলের কুঁজো ভর্তি হয়েছে কিনা। মালপত্র গোছগাছ করে বেঁধেছেদে তৈরি করে রাখলে গুলমহম্মদ। রাত্রি শেষ প্রহরে আবার যাত্রা আরম্ভ। এখন ঊর্বশীদের নিয়ে দিলমহম্মদ ফিরলেই হয়।

যে পাথরখানায় চড়ে আমি বসে আছি তার ডান দিকে ভৈরবী আর কুন্তীরা কম্বল পাতল। রূপলাল বসল থিরুমলকে নিয়ে আমার বাঁ ধারে। পোপটলাল সমস্ত দলবল নিয়ে সামনে বসলেন। শ্রীমান সুখলাল থাকবে আমার সঙ্গে।

মাঝখানটা ফাঁকা রেখে সকলের বিছানা বিছানো হল। মাঝখানে গানের আসর বসবে, গান ভাঙলে যে যার নিজের কম্বলে শুয়ে পড়বে। রাত্রির জন্যে নিশ্চিন্ত হয়ে বসা গেল একেবারে।

থিরুমলের দিকে মাঝে মাঝে চেয়ে দেখছি। সে হাসছে, কথা বলছে, কলকে টানছে, কিংবা রূপলালের গলা জড়িয়ে চলাফেরা করছে। কে বলবে কিছু হয়েছে তার, কোনো গণ্ডগোল নেই। তবে লক্ষ করলে বেশ বোঝা যায়-একবার ভুলক্রমে ও সে কুন্তীর দিকে চেয়ে দেখছে না– যেন কুন্তীকে সে চেনেই না। রূপলালের একান্ত বাধ্য হয়ে আছে সে। দেখেশুনে একরকম নিশ্চিন্ত হয়ে আছি।

দিলমহম্মদ ফিরল। ঊর্বশীর গলার ঘণ্টার আওয়াজ ভেসে এল দূর থেকে। ছুটে চলে গেল গুলমহম্মদ বাইরে। উপর দিকে মুখ তুলে চেয়ে দেখলাম, একখানা আশমানী রঙের কাপড়ে চমৎকার জ্বলজ্বলে তারার ফুল ফুটে উঠেছে।

দিলমহম্মদ নেমে এল অন্ধকারের ভিতর থেকে, পাহাড়ের গা বেয়ে। দুদিন পরে উটেদের পেটে কিছু পড়েছে, সেজন্যে দিলমহম্মদের মুখে তৃপ্তির হাসি 1

হাতের কাছে তার ভাত রুটি চাটনি গোছানো ছিল। কুন্তী উঠে গিয়ে এগিয়ে দিলে।

শেরদিল উঠে গেলেন গুলমহম্মদকে নিয়ে আসতে। উটেদের ছেড়ে বুড়ো যদি আসে আর উট যদি কোনও দিকে পাড়ি জমায়, তবেই চিত্তির! এখানে তো ওদের নিয়ে আসা অসম্ভব। যে পথে আমরা আসা যাওয়া করছি উট ও-পথে আসবে কি করে?

কি করে গুলমহম্মদ! ভাবনায় পড়ে গেলাম।

হঠাৎ শুনি পাহাড়ের ভিতর দিকে ঘণ্টার শব্দ তার সঙ্গে গুলমহম্মদের গলা–"হৈ হৈ হট হট হৈ।" সেই সরু পথ বেয়ে ঊর্বশী আর তার মাকে সাবধানে নামিয়ে আনা হচ্ছে। পিঠে বোঝা না থাকায় ছাগলের মতো অক্লেশে ওরা সেই গড়ানে-পথে নেমে এল।

এসে বসল আমাদের সামনে লম্বা গলা উঁচু করে। গানের উপযুক্ত সমঝদার। ভৈরবী গেলেন বাম খেজুর নিয়ে ঊর্বশীকে আদর করতে।

বাইরে পড়ে রইলো আটার বস্তাগুলো। তা থাকুক, কে নেবে ওখান থেকে শেরদিল জ্যান্ত থাকতে?

গুলমহম্মদ এসে বসে ঢোল কোলে তুলে নিলে। দিলমহম্মদ বসল তার ডান পাশে, আর ওদের মুখোমুখি বসলেন শেরদিল। তিনি গাইবেন, ঢোল বাজাবে গুলমহম্মদ আর আখর দেবে তার ছেলে।

চাঁটি পড়ল ঢোলে। গুড় গুড় গুড় গুড় গুড়ুম।

ঘুরতে লাগল সেই শব্দ হাজার লক্ষ গুণ বাড়তে বাড়তে পাহাড়ের রন্ধ্রে রন্ধ্রে। ঘুরতে ঘুরতে উঠতে লাগল উপর দিকে, যেন শব্দময় ধূপের ধোঁয়া। নীচে থেকে উপর দিকে বার বার দেখতে লাগলাম চেয়ে চেয়ে, স্পষ্ট মনে হল সেই গুড় গুড় গুড়ুম জ্যান্ত হয়ে উঠেছে, চোখে বেশ দেখা যাচ্ছে।

থামল ঢোল, আরম্ভ হল গান। সুরটা ঠিক কি ছিল আজ সঠিক বলতে পারব না। হয় কাওয়ালী, নয় গজল। ভাষা জানি না, কিন্তু এটুকু বুঝতে বাকী রইল না যে, সৃষ্টিকর্তার উদ্দেশেই এই গানের ভাষা সুর সমস্ত নিবেদিত। যখন ঢোল থামে, তখন টেনে টেনে করুণ বিচিত্রসুরে শেরদিল কয়েক পদ বলে যান। যা বলেন তার মধ্যে সুরে আর ভাষায় যা ফুটে উঠে সে হচ্ছে নির্জলা আকুল আকুতি। ভাষা না জানা থাকলেও সেই সুর মর্মস্থলে আঘাত হেনে সবটুকু বেশ পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দেয়। তারপর দ্রুততালে ঢোল বেজে ওঠে, শেরদিলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে গানের দু-পদ গেয়ে ওঠে দিলমহম্মদ। তখন শ্রোতারা কেউ স্থির থাকতে পারে না। হাতে হাতে চাপড় মেরে তাল দেয়। ঘাড় নড়ে, দেহ দুলতে থাকে সকলের।

চলল গান একটার পর একটা। গাওয়ারও যেমন শেষ হয় না, শোনারও তেমনি শেষ হয় না। যে গান শুনতে শ্রান্তি জন্মায় না তেমন জাতের গান ক্বচিৎ কদাচিৎ ভাগ্যে ঘটে মনে পড়ে হিংলাজের পথে সেই পাহাড়ের গহ্বরে গোটাচারেক টিমটিম আলোর আবছা অন্ধকারে একতালে একদল লোক মন্ত্রমুগ্ধের মতো দুলছে আর হাতে তালি দিচ্ছে। এখনও গভীর রাতে ঘুম ভেঙে গেলে প্রথমে মাথার মধ্যে তারপর বুকের মধ্যে গুরু গুরু বাজতে থাকে সেই ঢোল। যখন কোথাও গান শুনতে বসি তখন হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে শুনতে থাকি সেই ন-দশ বছরের মেয়েলী গলার অপূর্ব সুর। যেন মনে হয়, আবার যদি কোনো রাতে সেই রকমের পরিবেশে কোথাও আরম্ভ হয় সেই সুরের গজল ও কাওয়ালী, তবে হাতে হাতে চাপড় মেরে ঠিক জায়গায় তাল দিয়ে মাথা নাড়তে পারি।

জাহাজের খোলের মধ্যে কাবুলির গান শুনে শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত যা বলেছিলেন সেটুকু হয়তো মিথ্যে নয়। জাহাজের খোলে, ড্রইংরুমে, পাড়ার জলসায় বাঁধা স্টেজে কাবুলিওয়ালার গান মানাবেই বা কেন, জমবেই বা কেন? বৈষ্ণবের আখড়ার অঙ্গনে তুলসীগাছের পাশটিতে খেমটা জমে কি না জানি না, তবে অন্য সুরের অন্য বস্তু এমন জমাই জমে যে, শ্রোতাকেও জমিয়ে নিয়ে গলিয়ে ছাড়ে এ আমি অনেকবার নিজ চক্ষে দেখেছি। তেমনি কাবুলির গানের মর্ম বুঝতে হলে, কাবুলির দেশেই যাওয়া দরকার, যেখানে তার গান উন্মুক্ত আকাশের তলায় কোথাও বাধা পায় না। পায় না বলেই বোধ হয় শ্রোতাকে সুদ্ধ সঙ্গে নিয়ে উধাও হয়ে যায় এমন রাজ্যে যেখানে আর জাতিবিচার থাকে না, সেখানে কাবুলির গানের সঙ্গে হালিশহরের রামপ্রসাদীর তফাত করা অসম্ভব। চার দেওয়ালের গণ্ডির মধ্যে স্বাধীন প্রাণের গানের প্রাণ থাকে না যে।

গান যখন থামল তখন যে ঠিক কখন এ আমরা জানতেই পারলাম না। শেষরাতে

আমাদের বিদায় দিতে আসবেন জানিয়ে শেরদিল সস্ত্রীক উঠে চলে গেলেন। উট দুটি নিয়ে গুলমহম্মদরাও পিতাপুত্রে বাইরে চলে গেল যেখানে আটার বস্তা পড়ে আছে।

আমরা কেউই উঠলাম না। যে যেখানে বসে ছিল সেখানেই শুয়ে পড়ল। গান তখনও চলতে লাগল আমাদের মনের কানায় কানায় পূর্ণ হয়ে।

সেই রাতে এমন এক কাণ্ড ঘটে বসল যার সঙ্গে তুলনা দিতে গেলে অনেকদিন আগেকার এক সন্ধ্যার একটি ঘটনা বড় বেশি করে মনে পড়ে। সে মাসটাও বোধ হয় আষাঢ়-শ্রাবণই ছিল। সন্ধ্যার সময় আলো জ্বলার সঙ্গে সঙ্গে যথানিয়মে আমরা খুড়তুতো জেঠতুতো পাঁচ ভাই আলোটার চার ধারে গিয়ে বই খুলে বসেছি। বাইরে বৃষ্টি পড়ছে। সেই সময় একটা চামচিকে জানালা দিয়ে ঘরে ঢুকল। ঢুকে চুপচাপ এক কোণে বসে থাকতেই পারত বৃষ্টি না থামা পর্যন্ত। তা নয়। একটা হাঙ্গামা বাধাবার বদ মতলব রয়েছে কিনা মাথার মধ্যে। চুপ করে থাকতে পারবে কেন। চারিদিকের দেওয়ালের গায়ে ঠোক্কর খেয়ে বনবন করে উড়তে লাগল। সেদিকে প্রথম কার নজর পড়েছিল বলতে পারব না। যারই সে সৌভাগ্য হয়ে থাকুক, এটুকু বেশ মনে পড়ছে যে, দিগবিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে আমরা পাঁচজনেই একযোগে চূড়ান্ত বিক্রমে সেই চামচিকের পিছনে আক্রমণ চালিয়েছিলাম। সেই আক্রমণে হাতের কাছে যা পাওয়া যাচ্ছিল সমস্তই নির্বিচারে ব্যবহার করা হচ্ছিল। বই খাতা টেনিস বল হকি স্টিক, মায় জুতো পর্যন্ত সব কিছুই সেই মহা-আক্রমণে কাজে লেগে গেল।

বই

নিমেষের মধ্যে হুলস্থুল কাণ্ড ঘটে গেল পড়বার ঘরে। দেওয়ালের গায়ে যে কখানা ছবি টাঙানো ছিল তার একখানাও আস্ত রইল না। দোয়াত ভাঙল, বই ছিঁড়ল, বই এর আলমারির কাঁচ চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে গেল। ছোট কাকার সদ্য-বিয়েতে পাওয়া পাম্পশু-জোড়ার এ-হেন অবস্থা হল যে, তা দেখলে তাঁর অতি বড় শত্রুর চোখেও জল আসত। শেষ পর্যন্ত আলোটা গেল উল্টে; শুধু উল্টে গিয়েই ক্ষান্ত হল না, তক্তপোশের উপর পাতা চাদর শতরঞ্জি সমস্ত ভিজিয়ে দিলে কেরোসিন তেলে। তারপর সেটা দপ্ দপ্ করতে করতে গেল নিভে। তখন সেই ঘোর অন্ধকারে আমরা পাঁচ বীরপুরুষ আক্রমণ বন্ধ করে হতভম্ব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম।

এর পরেরটুকু একান্ত করুণরসাত্মক ব্যাপার। তারপরে শুরু হয় পাল্টা আক্রমণ। বড়দা ছোটকাকা মা এবং আরও কে কে মনে নেই ছুটে এলেন। এল আলো, এল বেত। তখন সেই চামচিকের পক্ষ অবলম্বন করে তাঁরাও একযোগে চালালেন পাল্টা আক্রমণ। ঘণ্টাখানেক পরে যখন শান্তি স্থাপিত হল তখন আবার আমরা সেই ঘরের আরেকটা আলোর চারধারে বই খুলে বসতে বাধ্য হয়েছি, কিন্তু সবাই দু হাতে চোখের জল মুছছি। সবচেয়ে দুঃখের কথা, সব অনর্থের মূল সেই হতভাগা চামচিকেটার চুলের টিকিটাও আমরা আর দেখতে পেলাম না…

এই রকমেরই একটা কাণ্ড ঘটে গেল সেই রাতে। শেরদিলের সেই পরম শান্তিময় আশ্রমে নিরুদ্বেগ চিত্তে ঘুমোতে ঘুমোতে হঠাৎ লাফ দিয়ে উঠে অন্য সকলের সঙ্গে সেই স্থানটির ভিতরে ছুটতে লাগলাম ঘুরে ঘুরে। শুধু ছোটা নয়, প্রাণপণে সকলের সঙ্গে গলা মিলিয়ে চেঁচাতে লাগলাম, আর নিচু হয়ে যা হাতে ঠেকল তা-ই কুড়িয়ে নিয়ে ছুঁড়তে লাগলাম, পাহাড়ের গায়ে অনেকটা উঁচুতে আর একটি ছুটন্ত প্রাণীর দিকে। সেও ছুটছে ঘুরে ঘুরে, সেই চামচিকেটার মতোই পালিয়ে যাবার পথ খুঁজছে। আমাদের সকলের হাতের পাথর গিয়ে পড়ছে তার দিকে। আমাদের সমবেত কণ্ঠের চিৎকার লক্ষগুণ হয়ে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে পাহাড়ের মধ্যে। তুমুল কাণ্ড। হঠাৎ সে প্রাণীটির ছুটন্ত দেহটা কালো পাহাড়ের গায়ে অন্ধকারের সঙ্গে মিলিয়ে গেল। তবু কি সহজে আমাদের চিৎকার থামে! শেষে একান্ত হয়রান হয়েই আমাদের পা আর গলা থামল। আমরা হুঁশ ফিরে পেলাম।

বই

তখন প্রথম যে-কথা মাথায় এল তা হচ্ছে- ভৈবরী আর কুন্তীর অবস্থাটা কি?

যেখানে ওরা শুয়ে ছিল সকলেই সেই দিকে ছুটে গেলাম। গিয়ে পৌঁছে যা দেখা গেল তাতে আর কারও মুখে রা ফুটল না।

কুন্তীকে জড়িয়ে ধরে ভৈরবী বসে আছেন। স্পষ্ট কিছুই দেখা গেল না, তবে এটুকু বেশ বোঝা গেল যে, নিশ্চয়ই একটা কিছু হয়েছে কুন্তীর, নয়তো তাকে ওভাবে জড়িয়ে ধরে বসে ভৈরবী কাঁদছেন কেন।

"আলো, আলো জ্বালাও জলদি।"

গোটা-তিনেক আলো তৎক্ষণাৎ জ্বলে উঠল। ওদের কাছে গিয়ে নিচু হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি, হয়েছে কি?"

কাঁদতে কাঁদতে ভৈরবী উত্তর দিলেন, "হয়েছে আমার মাথা আর মুণ্ডু। ওদের সঙ্গে আপনিও কি এতক্ষণ জ্ঞানহারা হয়ে ছিলেন নাকি? কাকে ও রকম করে তাড়ালেন তা জানেন?"

সকলে পরস্পর মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলাম। সত্যিই তো–কাকে তাড়ালাম আমরা?

ভৈরবীই জানালেন, "ও থিরুমল-এতক্ষণ ধরে যাকে শেয়াল-তাড়া করে তাড়ানো হল। এই দেখুন ও কি করে গেল মেয়েটার!"

সবাই ঝুঁকে পড়লাম দেখবার জন্যে। আলো ধরে দেখা হল কুন্তীর গলায় মোক্ষম নিপীড়নের স্পষ্ট দাগ। দু-হাতে গলা টিপে তাকে শেষ করে দেবার চেষ্টা করা হয়েছে।

আরম্ভ হল মাথায় জল ঢেলে বাতাস করে কুন্তীর জ্ঞান ফিরিয়ে আনার প্রাণপণ চেষ্টা। ইতিমধ্যে আমরা শুনলাম কি করে ব্যাপারটা এতদূর গড়াল।

ভৈরবী বললেন, "গোঁ গোঁ আওয়াজ শুনে আমার ঘুম ভেঙে যায়। চোখ চেয়ে দেখি, কে চড়ে বসে রয়েছে কুন্তীর বুকের উপর। তখন লাফিয়ে উঠে সজোরে একটা ধাক্কা মারি, সঙ্গে সঙ্গে চেঁচিয়ে উঠি। লোকটা ছিটকে পড়ে ওধারে। আমার চিৎকার শুনে যে যার বিছানা থেকে উঠে চেঁচাতে চেঁচাতে তার পিছনে তাড়া করে। কেউ একবার ফিরেও দেখলো না যে, আমরা দুটো মেয়েমানুষ যে পড়ে রইলাম আমাদের দশা কি হল?"

সকলেই নির্বাক।

মুখ তুলে তাকালাম। অনেক উঁচুতে, পাহাড়ের একেবারে মাথা পর্যন্ত চোখ বুলিয়ে নিলাম। আরও উঁচুতে দৃষ্টি পড়তে দেখি, ভোর হয়ে এল। মাথার উপর গোল আকাশটুকুর রং ফিকে হয়ে এসেছে। তারাগুলিকে দেখতে পাওয়া গেল না।

গুলমহম্মদ এসে দাঁড়াল। বাইরে উটের পিঠে মালপত্র বাঁধা হয়ে গেছে। আমাদের বিদায় দিতে শেরদিলও এসে উপস্থিত হলেন।

দলসুদ্ধ সবাই বাক্যহারা। তখনও কুন্তীর মুখে মাথায় জলের ঝাঁপটা দেওয়া চলছে।

শেষে ওদের শোনানো হল সমস্ত ব্যাপারটা। শুনে ওরাও স্তম্ভিত।

শেরদিল বললেন যে, তিনিও কিছুক্ষণ আগে বিষম গোলমাল শুনতে পেয়েছিলেন তাঁর আস্তানা থেকে। পাহাড়ে নানা জাতের আওয়াজ তো হামেশাই হয়। হয় কোথাও পাহাড়ের গা থেকে প্রকাণ্ড পাথরের স্তূপ পড়তে লাগল গড়িয়ে, নয়তো পাহাড়ি জিনেরা গুহায় গুহায় কেঁদে বেড়াতে লাগল–কাজেই তিনি ঠিক খেয়াল করে উঠতে পারেননি যে, আমরাই প্রাণপণে চেঁচিয়ে মরেছি।

গুলমহম্মদ বললে, "তা হলে থিরুমল গেল কোথা? এখান থেকে বেরুবার রাস্তা ঠিক সামনেই তো আমরা উট নিয়ে বসে আছি, ওই পথে সে গেলে আমরা নিশ্চয়ই তাকে দেখতে পেতাম।"

ভৈরবী উঠে দাঁড়ালেন-তখনও কুন্তী বেহুঁশ। দাঁড়িয়ে তিনি হুকুম করলেন গুলমহম্মদকে-"এখনই যাত্রা করব আমরা। আর এক মুহূর্তও এখানে থাকা নয়। বুড়োবাবা, নিয়ে চলো তো তুলে এই মেয়েটাকে। ওকে আমার সঙ্গে খাঁটিয়ার ওপর তুলে দেবে।"

কেউই আপত্তি করলে না। যে যার কুঁজো কম্বল নিয়ে তৈরি হল। চুপ করে বসে সব

দেখছি। শেষে জিজ্ঞাসা করলাম, “কিন্তু থিরুমল যে রইল, তাঁকে খুঁজে বার করতে হবে না?”

ভৈরবী বললেন, ঝাড়ু মারি তার মুখে।” বলে আবার গুলমহম্মদকে মিনতি করলেন-”বুড়োবাবা, দাও না মেয়েটাকে তুলে!”

দলসুদ্ধ সকলের মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম। দেখলাম, ঘৃণায় বিরক্তিতে সকলের মুখ থমথম করছে। কেউ এরা চায় না থিরুমলকে। সে বাঁচল না ম'লো এটুকু জানবারও বিন্দুমাত্র স্পৃহা নেই কারো মনে।

ছড়িদার রূপলাল এগিয়ে এসে দাঁড়াল আমার সামনে। দৃঢ় কণ্ঠে সে জানালে যে, থিরুমলের জন্যে আর কারও এক মুহূর্ত নষ্ট করবার ইচ্ছা নেই। সকলেরই যথেষ্ট লোকসান হয়েছে তার জন্যে। যাচ্ছে সকলে তীর্থ করতে। সেই হতভাগার জন্যে সকলের তীর্থযাত্রায় বিঘ্ন পড়ছে বার বার। শেষ পর্যন্ত এই যাত্রা পণ্ড হয় এই কি আমার বাসনা?

পোপটভাই এসে আমার একটা হাত ধরলেন। তাঁর মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম। দেখলাম পোপটভাই-এর মুখের ওপরেও দৃঢ় সঙ্কল্পের ছাপ ফুটে উঠেছে।

যেমন ভাবে ছোট শিশুকে দু-হাতের উপর শুইয়ে নেয় তেমনি করে কুন্তীর জ্ঞানহীন দেহটা তুলে নিয়ে এগিয়ে চলেছেন শেরদিল। সামনে চলেছেন ভৈরবী 1

পোপটভাই আমাকে টেনে তুলে নিয়ে চললেন।

অনেকটা উঠে সেই পাহাড়ি গলি দিয়ে ঘুরে ঘুরে নেমে গিয়ে আমরা খোলা জায়গায় পৌঁছলাম। যেন মুক্তি পাওয়া গেল কারাগার থেকে। সামনে যতদূর দৃষ্টি যায় তার শেষ সীমায় আকাশের গায়ে গিয়ে মিশেছে পাণ্ডুবর্ণ ধরণীতল I সেইখানটিতে ক্ষিপ্রহস্তে রঙের পর রং চড়াচ্ছেন কোন এক অদৃশ্য শিল্পী। প্রথমে ফিকে গোলাপি। তারপর আরও একটু চড়া ওই একই রং। তারপর ফিকে লাল রং। তারপর তাঁর নিপুণ হাতের টানে সারা দিগন্তটা ঘোর রক্তবর্ণ হয়ে জ্বলতে লাগল। সেইদিকে চেয়ে রইলাম। দুটো রাত আর একটা পুরো দিন চোখের দৃষ্টি ছিল চতুঃসীমার মধ্যে আবদ্ধ। এতক্ষণে টের পেলাম সেটাও একটা কম জ্বালা নয়।

সবাই প্রস্তুত। উটের পিঠে খাঁটিয়ার মধ্যে স্বস্থানে বসেছেন ভৈরবী। কোলে তাঁর বেহুঁশ কুন্তী। সার বেধে দাঁড়িয়েছে সবাই কুঁজো কম্বল ঘাড়ে করে। এবার যাত্রা শুরু হবে।

পিছনে ফিরে তাকালাম কালো রুক্ষ পাহাড়টার দিকে। ওর গায়ের অত খাঁজ খোঁজের মধ্যে নিশ্চয়ই কোথায়ও লুকিয়ে বসে আমাদের দেখছে থিরুমল। পাহাড়টার আপাদমস্তক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে দেখতে লাগলাম যদি কোথাও তার মুখখানা দেখতে পাওয়া যায়।

সামনে থেকে রূপলাল চিৎকার করে উঠল, “হিংলাজ মাতাকি–” সকলে বেশ বলিষ্ঠ কণ্ঠে জবাব দিলে, “জয়”।

উট দুটো আর মানুষের সারিটা নড়ে উঠল।

স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে আছি। আমার একপাশে শেরদিল, অন্য পাশে পোপটভাই। পোপটভাই বললেন, “চলুন।”

শেরদিল বললেন, “কিছু ভাববেন না আপনি। নিশ্চয় সেই ছোকরাকে আমি পাব। পাগলই হোক আর যাই হোক, জল তেষ্টা পেলে তাকে নেমে আসতেই হবে পাহাড় থেকে। তখন আমার কাছেই রেখে দেব তাকে। গুলমহম্মদকে আমি বলে দিয়েছি যে, আপনারা যে পথে ফিরবেন সেই পথে একটা কুয়োর কাছে লোকের বসতি আছে। সেখানে আমি আমার লোক সঙ্গে দিয়ে ছোকরাকে পাঠিয়ে দেব।”

আমি তখন ভাবছি শোনবেণীর সেই ঝড়জলের রাতটার কথা। ভাবছি সেই রাতে থিরুমলকে ফিরিয়ে আনতে গিয়ে আমি প্রাণের মায়া ভুলে গিয়েছিলাম। ওর হাতে ধরে টানতে টানতে ছুটে চলেছি। এক একবার পিছনের দিকে তাকিয়ে, অন্ধকারের মাঝে পিছনে তাড়া করে ছুটে আসছে ঠিক ওই কালো পাহাড়টার মতো সমুদ্রের বিরাট ঢেউ। আমার কানে তখন বাজছে- থিরুমল সেই প্রথম অর্থহীন হাসি হেসে উঠল-হা হা হা হা। বিদ্যুতের আলোয়

ওর চোখ দুটোর দিকে চেয়ে আঁতকে উঠেছিলাম। তবু ওর হাত ছাড়িনি। কিন্তু-কেন?

কি করে তখন তাকে ছেড়ে দিয়ে পালিয়ে আসব? তার একটু আগে পাঁচিলের উপর থেকে যে শুনেছিলাম- শুনেছিলাম থিরুমলের সেই কাকুতি-মিনতি–"কিছুই হয়নি কুন্তী। কিচ্ছু হয়নি। আমি তোমায় ছেড়ে বাঁচব কি করে, কোথায় যাব আমি? যে করে হোক আমরা আবার দাঁড়াব। আবার ঘর বাঁধব। কেন অবুঝ হচ্ছ তুমি?"

আবার নতুন করে শুনতে পেলাম, সেই আকুল আকুতি থিরুমলের। আর একবার চোখ বুলিয়ে নিলাম পিছনে দাঁড়ানো পাহাড়টার চূড়া থেকে নীচে পর্যন্ত। নিশ্চয় ওখানে রয়েছে থিরুমল। নিশ্চয়ই সে কোনও একটা পাথরের আড়ালে লুকিয়ে বসে চেয়ে রয়েছে আমাদের দিকে। অসহায়ভাবে দেখছে থিরুমল যে, আমরা তাকে ফেলে রেখে তার কুন্তীকে নিয়ে পালাচ্ছি।

কিন্তু কোন অধিকারে?

এক ঝটকায় পোপটলালের হাত থেকে হাত ছাড়িয়ে নিলাম। প্রাণপণে ছুটলাম সামনে ডাকতে ডাকতে, "গুলমহম্মদ, গুলমহম্মদ!"

সামনের বড় উট থামল। তার পিছনে থামল ছোট উট যার উপর ভৈরবী আর কুন্তী। দৌড়ে গিয়ে পৌঁছলাম ওদের পাশে।

"নামাও কুন্তীকে। নামিয়ে দাও বলছি এখনই। আমাদের কোনো অধিকার নেই ওকে নিয়ে যাবার—"

সবাই স্তম্ভিত। আমাকে ঘিরে দাঁড়িয়েছে সকলে। আমি হাঁফাচ্ছি।

উটের উপর থেকে ভৈরবী ভুরু কুঁচকে জিজ্ঞাসা করলেন, "তার মানে?"

উত্তর দেবার আগে সকলের মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম। সকলেই রুদ্ধ নিশ্বাসে চেয়ে আছে আমার দিকে। কি রকম যেন হয়ে গেল আমার ভিতরটায়। গলাটা কেঁপে উঠল। তবু বললাম, বললাম একান্ত মিনতি করে, "বুঝে দেখো তোমরা। সবাই মাথা ঠাণ্ডা করে বুঝে দেখো, কেন আমরা ওই মেয়েটাকে নিয়ে যাচ্ছি? আমরা ওর কে? থিরুমল এখানে থেকে গেল। শেরদিল বলছেন যে, সে ফিরে আসবেই জলের জন্যে। জল পর্যন্ত না খেয়ে সে কতক্ষণ থাকবে! কুন্তীও থাকুক শেরদিলের কাছে। ওদের দুজনকেই শেরদিল পাঠিয়ে দেবেন আমাদের ফেরার পথে সেই কুয়োর ধারের বস্তিতে। কুন্তীকে যদি আমরা নিয়ে যাই, থিরুমল ফিরে এসে যখন দেখবে যে কুন্তীও নেই তখন সে আরও খেপে উঠবে। আর যদি তার মাথায় গোলমাল কেটে যায়–তখন সে কি ভাববে? থিরুমল ভাববে যে তাকে বিসর্জন দিয়ে আমরা তার কুন্তীকে নিয়ে পালিয়েছি।"

আরো হয়তো বলতে পারতাম। রূপলাল সামনে এসে দাঁড়াল চোখ পাকিয়ে। তার চোখে তখন নিদারুণ ঘৃণা। থেমে থেমে চিবিয়ে চিবিয়ে সে উচ্চারণ করলে, " আপনি কি বলতে চান আমরা এতজন হিন্দুসন্তান ওই হিন্দুর মেয়েটাকে এই মুল্লুকে ফেলে রেখে চলে যাব?"

ভৈরবীর চোখে আগুন জ্বলছে। তিনি শুধু বললেন, 'ভীমরতি ধরছে' বলে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে দিলমহম্মদকে আদেশ করলেন-"চলো।"

ঘাড় হেঁট হয়ে গেল আমার। আর একবার কি একটা বলবার জন্যে চোখ তুলে ওদের দিকে চাইতে নজর পড়ল কুন্তীর চোখের ওপর। কুন্তী চেয়ে আছে। চেয়ে আছে সোজা আমার দিকে। কি যে দেখছে কুন্তীই জানে। কিন্তু আমি তার চোখে দেখলাম ত্রাস আর তার সঙ্গে মেশানো ঘৃণা। বোধ হল যেন ব্যাকুল মিনতিও ঝরে পড়ছে সে দৃষ্টি থেকে। সে চোখ দুটি মুখর হয়ে উঠছে তখন, শব্দহীন ভাষায় বলছে আমাকে, ফেলে যাবে? আমাকেও এখানে বিসর্জন দিয়ে যাবে তুমি?

চোখ নামিয়ে নিলাম আমার।

পোপটলাল হাত ধরে টান দিলেন- "চলুন।"

সামনে চেয়ে দেখলাম সূর্যদেব উঠে আসছেন। কি জানি কেন আজ বহুদিন পরে

একবার চোখ বুজে আমার ইষ্টদেবতাকে সূর্যমণ্ডলের মধ্যে দেখবার চেষ্টা করলাম। থিরুমলের মুখখানাই ভেসে উঠল। মুখ টিপে সে হাসছে।

তারপর কখন যে সবাই-এর সঙ্গে পা মিলিয়ে চলতে আরম্ভ করেছি তা নিজে বুঝতেও পারিনি।

চলেছি। কারণ, না চলে উপায় কি! এ চলার কি বিরাম আছে কোথাও। সবাই চলছে এ দুনিয়ায়। সবাই তীর্থযাত্রী। যে মহাতীর্থে গিয়ে পৌঁছতে পারলে এই চলা কর্মটির হাত থেকে একবারে রেহাই মেলে সে তীর্থের নাম-ঠিকানা আজও জানা নেই। এই যে হিংলাজ-যাত্রা, যেখানে এর শেষ হবে সেই খানেই শুরু হবে আরেক যাত্রার। হয়তো সে পথে চোর-কাঁটার মতো সঙ্গ নেবে আর একদল কুন্তী আর থিরুমল। তখনও হয়তো এইভাবে চোখের জল মুছতে হবে কারো জন্যে। এক হাতে চোখের জল মোছা আর অন্য হাতে এই চলার পথের দু-ধারে যা মেলে তা কুড়িয়ে নিয়ে আঁচলে বাঁধা—এই হচ্ছে এ চলার নীতি। কিন্তু আঁচলটা হচ্ছে শতচ্ছিন্ন। তার অজস্র ছিদ্র দিয়ে সব গলে পড়ে পথের ধূলায় গড়াগড়ি যায়। তবু দঁড়াবার সময় নেই কারও। পিছন ফিরে তাকাবার সময় নেই। কারণ অন্য সবাই এগিয়ে যাচ্ছে যে।

তাই তো দেখছি। জীবনের অনেকগুলো দিন মাস বছর গঙ্গার ঘাটে বসে কাটাতে কাটাতে দেখছি। দেখছি সন্তানকে বুকে জড়িয়ে ধরে হাহাকারে আকাশ-বাতাস কাঁপাতে কাঁপাতে মা এসে উপস্থিত হলেন। চিতায় তুলে দেবার পরও হাহাকার। সে হাহাকারে পাষাণ গলে যায়। চিতা নিভল। নেয়ে ধুয়ে ফিরে গেলেন মা। দিন গেল, মাস গেল-বছরও প্রায় যায় যায়। সেই মাকেই আবার ঘুরে আসতে দেখেছি। এবার তাঁর কোলে আর একটি নূতন আগন্তুক। সূতিকাগার থেকে বেরিয়ে গঙ্গাস্নানে এসেছেন। শুদ্ধশুচি হয়ে ঘরে ফিরবেন ছেলে কোলে নিয়ে। বুকের ভিতর তাঁর সীমাহীন কামনা-তাঁর এই সন্তান বড় হবে, এরই কোলে মাথা রেখে তিনি চোখ বুজবেন, আর এই ছেলেই তখন তাঁর জন্যে চোখের জলে বুক ভাসাবে।

শহরের রাস্তায় দেখেছি-পথের এক পাশ দিয়ে শুষ্কমুখ নগ্ন-পা, নগ্ন-গা একদল চলেছে একখানা খাঁটিয়া কাঁধে করে। চোখের দৃষ্টি তাদের শূন্য, মুখে তাদের ভাষা নেই। সেই সময় সেই রাস্তারই মাঝখান দিয়ে মস্ত এক গাড়িতে চলছে একজন,-পাশে তার নববিবাহিতা বধূ। চোখে সোনালি স্বপ্নের কাজল, বুকে তাদের মধু-ভাষার কলধ্বনি। ওদের দেখে এরা মুখ ফিরিয়ে নিল। বিতৃষ্ণায় মনটা ভরে গেল এদের-"মরবার আর দিন পেলে না ব্যাটা!" এই অলক্ষণে দৃশ্য চোখে পড়ে আজকের দিনে মনের আমেজটুকু না মাটি হয়ে যায় এজন্যে নববধূকে একটু আড়াল করে বসল।

জীবনভর যেখানে যা কিছু চোখে পড়েছে তার সবটুকুই একটা বিরাট হ্যাংলাপনার উলঙ্গ মূর্তি ধরে সামনে এসে দাঁড়াল। এ দুনিয়ায় বেঁচে থাকার সোজা অর্থটা হচ্ছে আগাগোড়া গোঁজামিলের মিল খুঁজে বেড়ানো। যা কিছু সামনে পড়ুক তাকে কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়াটাই সবচেয়ে চরম কথা। অজস্রবার নিজের সঙ্গে আপোসে মিটমাট করে নিয়ে সামনে শুধু চোখ বুজে ছুটে চলাটাই বেঁচে থাকার পরম সার্থকতা।

তাই-ই করতে হল। প্রচণ্ড একটা ধমক দিয়ে নিজেকে বোঝাতে লাগলাম-"তুমি চলেছ তীর্থ করতে। বেঁচে যদি ফিরতে পারো এখান থেকে তাহলে দাঁড়ি-পাল্লায় পুণ্যের দিকটা কতখানি ঝুঁকে পড়বে তার হিসাব রাখো বাপু? শুধু কি তাই? যদি ধড়ে প্রাণটুকু বজায় রেখে গিয়ে দাঁড়াতে পারো তোমার সমশ্রেণীর সগোত্রদের মাঝে, তখন তোমার যাযাবরত্বের মহামূল্য এই মুকুটে হিংলাজ-পথে কুড়িয়ে পাওয়া জ্বলজ্বলে হীরাখানি দেখে সকলের কতটা তাক লেগে যাবে সেটা কি ভুলে গেছ? পা চালাও, সামনে পা চালাও ঘাড় গুঁজে, কোনো দিকে না চেয়ে। সামনেই চন্দ্রকূপ জানো সেটা আবার কি পদার্থ। যখন সেটা চোখের নাগালের মধ্যে আসবে তখন বুঝতে পারবে কি বিস্ময় অপেক্ষা করছে তোমার জন্যে। যে পড়ে রইল সে থাকুক। কোনও লাভ নেই পিছন ফিরে চেয়ে। শুধু সামনে এগিয়ে চলো।"

চলতে লাগলাম ভাই পোপটলাল প্যাটেলের আমার চেয়ে আধ হাত উঁচু দীর্ঘ দেহখানির পাশে পাশে।

একটা লম্বা নিশ্বাস পড়ার শব্দ শুনলাম। আমার ডান কানের আধ হাত উঁচুতে পোপটলালের মুখ, সেখান থেকে সেই নিশ্বাসের সঙ্গে চাপা গম্ভীর স্বরে বেরুল-"হে ভগবান, হে হিংলাজ মাতাজি, আজ সন্ধ্যা পর্যন্ত যেন বেঁচে থাকি। একবার যেন চন্দ্রকূপ পৌঁছতে পারি এই দেহটা নিয়ে। তারপর মরণই আসুক আর পাগলই হয়ে যাই কোনো আফসোস নেই।

মুখ তুলে চেয়ে দেখলাম পোপটলালের মুখ। পোপটভাই ওই দেহটার মধ্যে কোথায় তলিয়ে গেছেন। বহুদূরে কোথায় চলে গেছেন তিনি। তাঁর লম্বা দেহটা দম দেওয়া পুতুলের মতো আমার পাশে পাশে হাঁটছে।

কিছুক্ষণ চুপচাপ। দুজনে আপন চিন্তায় হাবুডুবু খাচ্ছি। আবার অতি নিচু গলায় কি বলতে লাগলেন পোপটলাল। এবার মনে হল যেন বহু দূর থেকে তাঁর কথাগুলি ভেসে আসছে। কান খাড়া করে শুনতে লাগলাম।

"উঃ কতদিন! কতদিন ধরে কাটালাম এই দিনটির অপেক্ষায়। বারো বছর-বারোটা বছরের প্রত্যেক দিন-রাত গুনে গুনে কাটিয়েছি। এই বারোটা বছরের প্রত্যেকটি রাতে স্বপ্ন দেখেছি চন্দ্রকূপের। আর মাত্র কয়েকটা ঘণ্টা। এই কয়েকটা ঘণ্টা যদি সামর্থ্যটুকু বজায় থাকে তবে পৌঁছব নিশ্চয়ই চন্দ্রকূপে। এই দেহ নিয়েই চন্দ্রকূপ দর্শন হবে। সমস্ত জ্বালা জুড়িয়ে যাবে। জয় বাবা চন্দ্রকূপ! এইটুকু সময় যেন তোমার দয়ায় আমার হুঁশ বজায় থাকে বাবা।"

আবার চেয়ে দেখলাম পার্শ্ববর্তী চলন্ত দেহটার মুখের দিকে। প্রকাণ্ড পাগড়ির নীচে কপালের উপর এ-কান থেকে ও-কান পর্যন্ত পর পর পাঁচটা রেখা। সুগভীর সুস্পষ্ট পাঁচটা দাগ। যদি পড়তে জানতাম ওই দাগগুলোর অর্থ! কত কিছুই যে জানা যেত। সোজা সামনের দিকে চেয়ে আছেন পোপটলাল। তাঁর চোখের পাতা পড়ছে না। সামান্য ঘোলাটে তারা-দুটিও স্থির নিশ্চল। যেন এখান থেকেই তিনি দেখতে পাচ্ছেন চন্দ্রকূপ। না, তা ঠিক নয়। দেখছেন তিনি পার হয়ে-আসা বারোটা বছর আগেকার কোনো কিছু, যা জানতে পারলে ওঁর কপালের ওই রেখাগুলোর মানে বোঝা যেত, যা হয়তো আর ওঁর মুখ দিয়ে বার হবে না কখনো।

রুদ্ধ নিশ্বাসে মন কান সজাগ রেখে হাঁটছি তাঁর পাশে পাশে। অনেকটা সময় নিঃশব্দে পার হওয়া গেল। পায়ের নীচে চাঙড়া চাঙড়া পাথর শেষ হয়ে গেছে। আরম্ভ হয়েছে বালি। সাদা ঝুরঝুরে চিকচিকে নির্ভেজাল বালি। পা বসে যাচ্ছে। বহু আগে দেখা যাচ্ছে উট দুটিকে। সামনের বড় উটটার উপর এতগুলো লোকের বেঁচে থাকার রসদ। পিছনেরটার উপর খাঁটিয়ার মধ্যে ওরা দুজন। হেলছে দুলছে দুটো দেহ। এতদূর থেকে মনে হচ্ছে যেন হাওয়ায় দুলছে। তারপর মানুষের একটা লম্বা সারি। পাশাপাশি দুজন, তাদের পিছনে আরও দুজন বা একলা একজন। সার বেঁধে একমনে চলেছে সবাই জলের কুঁজো কাঁধে নিয়ে। মুখে কথা নেই, যেন সকলেই গভীর চিন্তায় ডুবে গেছে। কি ভাবছে ওরা এখন? ভাবছে নাকি থিরুমলের কথা? পিছনে যে পড়ে রইল সে হতভাগার একমাথা রুক্ষ কোঁকড়ানো চুল। আর ভাসা ভাসা চোখ দুটো সুদ্ধ শুকনো মুখখানা সকলের মনের কোণে উঁকিঝুঁকি দিচ্ছে হয়তো। হয়তো ইতিমধ্যে অনেকের বুকের মধ্যেই তোলপাড় করছে একটা চিন্তা—এই তীর্থপথে এখন এই সময় হঠাৎ যদি বিগড়ে বসে দেহের মধ্যে মন নামে যে কলটা চলেছে সেই কলটা-তাহলে? হঠাৎ যদি সেটার কোথাও কিছু ঢিলে হয়ে যায়? দৈবাৎ যদি এমন হয়ে বসে যার ফলে এতদিনের চেনা-জানা এই পুরনো জগৎটাকে আর চেনাই যাবে না-তখন? তখন আর কি, তখন নির্বিঘ্নে নির্বিবাদে সহযাত্রীরা তাকে ফেলে রেখে এগিয়ে চলে যাবে। তারপর এই বিশাল মরুভূমির আদিগন্ত সমস্তটুকু মৌরসী স্বত্বে ভোগদখল করতে থাক। কেউ কোনো দিন তিলমাত্র আপত্তি করতে আসবে না।

দেশে-গাঁয়ে নিজের স্বজাতি-স্বজনের মাঝে স্বাধীনতা বলতে কোনো কিছুর বালাই

নেই। না যায় প্রাণ খুলে একটা কথা বলা, না চলে নিজের প্রাণটা নিয়ে একটা কিছু করা। এখনই খপ করে মরব বললে সহজে কেউ মরতেও দেবে না। গলায় দড়ি দিলে লুকিয়ে দিতে হবে। টের পেলে দড়ি কেটে নামাবে। বিষ খেলে তৎক্ষণাৎ বদ্যি ডেকে আনবে। টেনে-হিঁচড়ে যমের দরজা থেকে আনবে ফিরিয়ে। পাগল হয়ে ও শান্তি নেই, দড়িদড়া শিকল দিয়ে বেঁধে রাখবে। যার কেউ কোথাও নেই তারও না খেয়ে মরবার ভয় নেই। দিগম্বর হয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল রাস্তায় রাস্তায়। তখন সবাই দেয় খেতে, সকলেই তার ভার বয়। সকলেরই নজর থাকে তার উপর। দুদিন না দেখতে পেলেই অমনি আরম্ভ হয়ে যায় চারিদিকে-"তাই তো, পাগলটা আবার গেল কোথায়? কনি দেখা যাচ্ছে না তো?" সকলের দরজার সামনের খোলা রাস্তাটুকু তার জন্যে। দিন-রাত যদৃচ্ছা পড়ে কাটাও। কেউ আপত্তি করবে না।

কিন্তু এখানে? এখানে কেউ নেই যে তোমার শান্তির ব্যাঘাত ঘটাবে। তোমার স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ করবে এমন জনপ্রাণী কখনো এখানে এসে জুটবে না। উপরের ওই আকাশ আর পায়ের তলায় এই ধূ ধূ মরুভূমি-এরা দুজনেই নির্বাক বিস্ময়ে চেয়ে থাকবে তোমার দিকে, যতক্ষণ না তুমি এই মরুভূমির বুকে লুটিয়ে পড়ো। তারপর এই শ্বেতশুভ্র অকলঙ্ক বালির বুকে পড়ে থাকবে একখানি শ্বেতশুভ্র পবিত্র হাড়।

বালির বুকের মধ্যে লুকিয়ে রেখে এসেছি আমরা জয়াশঙ্করকে। উপরের খোসা ছাড়ানো তাঁর হাড় কখানা আকাশের দিকে চেয়ে নির্লজ্জের হাসি হাসতে পারবে না। কিন্তু থিরুমলের যে সে-উপকারটুকু করে আসা হল না। তা না হল তো কি এমন ক্ষতি হল। যতক্ষণ এই খোলা হাওয়ায় ছুটে বেড়াতে পারে, বেড়াক। তারপর পড়ে থাকবে আরাম করে এই খোলা হাওয়ায়।

এতক্ষণ পরে খেয়াল হল খোলা হাওয়ার মধুর আস্বাদটুকু। চোখ মুখ পুড়িয়ে ঝলসে দিতে শুরু করেছে। তাড়াতাড়ি চাদরটা দিয়ে মাথা মুখ ঢেকে ফেললাম।

আবার মুখ খুললেন পোপটলাল

"এই আগুন-বারো বছর ধরে দিনরাত অষ্টপ্রহর এই আগুনে দগ্ধে মরছি। আজ আর এর আঁচ গায়ে লাগে না আমার। এ তো অতি তুচ্ছ। এ শুধু বাইরেটাই পোড়াতে পারে। যে আগুনে আমি পুড়ছি তা শুধু পুড়িয়েছে ভিতরটা। মুখ বুজে দিনের পর দিন কাটাতে হয়েছে। সে জ্বালা সে দগ্ধানি কোথাও কারও কাছে তিলমাত্র প্রকাশ করার উপায় নেই। এইবার তার শেষ। আর কয়েকটা ঘণ্টা যদি এই শরীরের শক্তিসামর্থ্যটুকু বজায় থাকে! জয় বাবা চন্দ্রকূপ!"

বোধ হয় বাবা চন্দ্রকূপকেই উদ্দেশ্য করে বার বার জোড়হাত কপালে ঠেকালেন তিনি।

চুপ করে চলেছি। আমাকে তো শোনাচ্ছেন না পোপটলাল। কথা বলছেন তিনি নিজের সঙ্গে। বলুন, কান আছে শুনে যাই। তাঁর সেই নিজের সঙ্গে বাক্যালাপের মাঝে আমি কি কথা কইব!

কথা না বললেও তাঁর স্বগতোক্তি আর এক নূতন ভাবনায় ফেলে দিলে। এই যাত্রার প্রথম থেকেই নানাজনের মুখ থেকে নানাকথা কানে আসছে চন্দ্রকূপ সম্বন্ধে। চন্দ্রকূপের কোনো আলোচনা উঠলেই বেশ সন্ত্রস্ত ভাব এসে পড়েছে সুরে আর ভাষায়। রহস্যজনক সমীহ করা হচ্ছে চন্দ্রকূপ বাবাকে। অনেকবার এ জাতের আলাপও শুনছি যে, চন্দ্রকূপ বাবার কৃপা হলে, তাঁর হুকুম পেলে, তবে তো হিংলাজ দর্শন। এতদিন বিশেষ করে এ সব কথায় আমি মাথা ঘামাইনি। ভারতবর্ষের প্রায় সব তীর্থেই কুণ্ডু আর কূপের ছড়াছড়ি। উষ্ণ শীতল শ্যামা রাধা গৌরী সৌভাগ্য সূর্য-আরও নানা রকমের কুণ্ড দেখেছি, স্পর্শ করেছি। কূপেরও কিছু কমতি নেই। সর্বত্রই এক আইন, এক চাল। স্নান করবার মতো জল থাকলে স্নান করো, নয়তো সেই ফুল-বেলপাতা-পচা জল মাথায় ছিটিয়ে নাও। তারপর সেই সমস্ত কুণ্ড-কূপের রক্ষক পাণ্ডা-পুরুতদের সঙ্গে যথারীতি খেচাখেচির পর যথাশক্তি দান-দক্ষিণা শেষ করে হাঙ্গামা চুকিয়ে ফেলো। চন্দ্রকূপে পৌঁছে ওই ধরনের কিছু করলেই চলবে-এতদিন

এই ধারণাই করে আসছিলাম। পোপটলাল প্যাটেলের কথাগুলি শুনে বাবা চন্দ্রকূপের প্রতি ভক্তির মাত্রাটা কতখানি বৃধি হল বলা শক্ত, তবে ভয় না হোক, দুশ্চিন্তা যে খানিকটা বৃদ্ধি হল তাতে সন্দেহ নেই। কি জানি কি আছে সেই চন্দ্রকূপে, যার মাহাত্ম্য এমনই অসীম যে, একবার সেখানে পৌঁছতে পারলে দীর্ঘ বারো বছরের তুষানলের জ্বালা জুড়িয়ে যাবে।

কিন্তু এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন-কি সে কারণটি যার জন্যে এই সদানন্দ প্রৌঢ়ের এই সুদীর্ঘ অর্ন্তদাহ। সেখানে পৌঁছলেই ত জানা হয়ে যাবে চন্দ্রকূপের রহস্যটা কি-কিন্তু পোপটভাই-এর গোপন রহস্যটি আর কখনই জানা যাবে না।

আমার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে অল্পক্ষণ চেয়ে থেকে হঠাৎ পোপটলাল জিজ্ঞাসা করলেন–"স্বামীজি মহারাজ, একটা কথা জিজ্ঞাসা করতে চাই আপনাকে, যদি কিছু না মনে করেন।"

এতক্ষণ পরে কথা বলবার সুযোগ পেয়ে কৃতার্থ হয়ে গেলাম, তাড়াতাড়ি জবাব দিলাম, "বলুন না কি জানতে চান?"

"ঐ যে মাতাজি চলেছেন আপনার সঙ্গে, উনি আপনার কে?"

এই প্রশ্নটির জন্যে প্রস্তুত ছিলাম না। আশা করেছিলাম পাপ-পুণ্য সম্বন্ধে একটি সারগর্ভ বক্তৃতা করবার সুযোগ পাব তাঁর প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে। কিন্তু এ একেবারে অপ্রত্যাশিত প্রশ্ন। উত্তর দিতে গিয়ে ঢোক গিলতে হল। বাস্তবিক আমি নিজেও তো কখনো ভেবে দেখিনি উনি আমার কে। কিন্তু চট করে উত্তর না দিলে চলে না। পোপটলাল তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন আমার মুখের দিকে। যা মুখে এল তাই বললাম, "কই- কেউ নয় তো। মানে কোনো সম্বন্ধ নেই আমার সঙ্গে ওঁর। দুনিয়ায় আমি স্রেফ একা, কারও সঙ্গেই কোনো সম্বন্ধ নেই আমার।"

উত্তরটা শুনে তাঁর কপালের পাঁচটা রেখা সঙ্কুচিত হয়ে উঠল। একটু চুপ করে থেকে তিনি বললেন, তবে? তাহলে কিসের জন্য একটা মেয়ে-মানুষের দায়িত্ব বয়ে বেড়াচ্ছেন আপনি শুধু শুধু; এখানে এই যমের মুখে এসেছেন আজন্মের পাপ-তাপের জ্বালা থেকে পরিত্রাণ পেতে? এখানেও ওই আপদ সঙ্গে এনেছেন কেন?"

একটু যেন রাগের ছোঁয়াচ তাঁর স্বরে, যেন একটু ধমকের সুর মেশানো। আমিও ভাবনায় পড়ে গেলাম- বললাম-"কই, মনে তো পড়ছে না এমন কোনো বড়সড় পাপ-টাপের কথা, যার জ্বলুনির হাত থেকে রেহাই পাবার আশায় এতদূর ছুটে এসেছি। আর জন্মাবার সময় যখন ঐ আপদের জাতেরই একজনের পেট থেকে বেরুতে হয়েছে-তখন আছেই না হয় একটা সঙ্গে। এতে আর দায়-দায়িত্বটা কোথায় আছে বলুন? এমনকি নিজের কুঁজো থেকে একবিন্দু জলও তো দেবার উপায় নেই। হাব নদীর কিনারার সেই প্রতিজ্ঞাগুলো সঙ্গে চলেছে তো। কি আর এমন ক্ষতি বৃদ্ধি হচ্ছে আর ও সঙ্গে থাকলে। তীর্থ করে ও ওর ভাগের পুণ্য নিয়ে ফিরবে, আমি আমার ভাগেরটুকু নিয়ে ফিরব। কেউ কারও পুণ্যে ভাগ না বসালেই হল।"

শুনে তিনি একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। টেনে টেনে বলতে লাগলেন-হায়, আমিও যদি পারতাম আপনার মতো বলতে। এত বড় পাপের বোঝাটা বয়ে যদি আমাকে এখানে আসতে না হত। আপনার আর ওই মাতাজির মতো আমিও তাহলে অনায়াসে পারতাম যাকে-তাকে কুড়িয়ে নিয়ে বুকে করে আগলে বেড়াতে। কোনো ঝঞ্ঝাটই তাহলে আপদ বলে মনে হত না আমার। কিন্তু তা হবার উপায় নেই। নিজের ভার যতক্ষণ না নামছে বুক থেকে, ততক্ষণ অন্য কিছুর সেখানে স্থান নেই। এই দলের অনেকেরই এই তীর্থপথে অন্য কোনো দিকে নজর দিবার উপায় নেই। অনেকেরই বুকের উপর চাপা জগদ্দল পাথর। সামনে ওই চন্দ্রকূপ। ওখানে পৌঁছলে সে পাষাণ বুক থেকে নামবে। জয় বাবা চন্দ্রকূপ!

কাঁধের ঝোলা থেকে দুটি বিড়ি বার করে একটি তাঁকে দিলাম। একটা কাঠি জ্বেলে দুজনের বিড়ি ধরিয়ে নিয়ে আবার চলা শুরু করলাম। এক সুদীর্ঘ টানে বিড়িটার সুতো পর্যন্ত পৌঁছে নাক মুখ দিয়ে গলগল করে ধোঁয়া ছেড়ে পোপটভাই বললেন, 'কিছু মনে বরবেন না,

স্বামীজি মহারাজ, আমার বেয়াদবির জন্যে। ও কথাটা আপনাকে জিজ্ঞাসা করা কখনই আমার উচিত হয়নি। মাতাজি তো সাক্ষাৎ দেবী! ওর কথা আলাদা। কিন্তু মেয়েমানুষ জাতটাকেই আমি সাপের চেয়ে বেশি ভয় করি। বারো বছর আগে আমিও আপনার মতো বুক ফুলিয়ে বলতে পারতাম, কই মনে তো পড়ছে না এমন কোনো বড়সড় পাপের কথা—যদি না তখন সে এসে জুটত আমার জীবনে। ওই মায়ের জাতেরই সে একজন। কিন্তু আমার এই পোড়া চোখে তাকে দেখেছিলাম অন্য নজরে। সেই বয়সই ছিল তখন আমার। আগুন জ্বলে উঠল আমার দেহমনে। নিজের সর্বনাশ নিজে করে বসলাম। সেই সর্বনাশের ফাঁস থেকে মাথা গলিয়ে পালাবার জন্যে যা করলাম তার ফলে এই বারো বছর আমার চোখের ঘুম গেছে ঘুচে, মুখের গ্রাস বিস্বাদ হয়ে গেছে। ওই জাতকে আমি সাপের চেয়ে বেশি ভয় করি। শুধু ভয় নয়, ঘৃণাও করি। হাঁ, ঘৃণাই করি। নিজের এই দু-চোখে যা দেখেছি, এই হাত দুটো দিয়ে যা ঘাঁটতে হয়েছে আমাকে, তার ফলে ওই জাতের উপর আর কোনো নেশা নেই আমার। ভালোও না মন্দ-ও না। শুধু ঘৃণা-শুধু বিতৃষ্ণা—", বলতে বলতে পোপটলাল বার বার শিউরে উঠলেন, যেন কি একটা বীভৎস দৃশ্য আজও দেখতে পাচ্ছেন তিনি।

বিস্ময়ে হতবাক হয়ে বার বার মুখ ফিরিয়ে দেখলাম পোপটলাল প্যাটেলকে। আমার দেহের চেয়ে আধ-হাত লম্বা লোহার মতো শক্ত ওই দেহটির ভিতর থেকে, আসল যে পোপটলাল, তিনি যেন এইবার ধীরে ধীরে বেরিয়ে এসে দাঁড়ালেন আমার চোখের সামনে। দেখলাম সেই আসল মানুষটির সর্বাঙ্গে বড় বড় ফোঁসকা। ধৈর্য ধরে অপেক্ষা করতে লাগলাম প্রায় নিশ্বাস বন্ধ করে।

"কি নিদারুণ অবস্থা! একদিকে বংশের সুনাম, সমাজ, আত্মীয়স্বজন, ঘরবাড়ি, গ্রামদেশ সব ছেড়ে পালানো, নয় আত্মহত্যা করা; অন্যদিকে জেল-হাজত পুলিশ আর তার জীবন। কি করি, কোথায় যাই, কার সঙ্গে পরামর্শ করি! যত বড় আত্মবন্ধুই হোক সেই বিপদের কথা জানিয়ে কারও কাছে সাহায্য চাইতে গেলেই জাহান্নামের অতলতলে তলিয়ে যেতে হবে। সকলের চোখে ধুলো দিয়ে মহাফ্যাসাদ থেকে উদ্ধার হতে হবে। তার না জানি কোনো উপায়, না জানি কোনও ওষুধ। নিজের গ্রামে সকলের মাঝখানে সে কর্ম করবার স্থানই বা কোথায়? শেষে সুযোগ নিজে থেকেই এসে উপস্থিত হল। সেই রাক্ষুসে সুযোগ এ জীবনের বারোটা বছর বিষিয়ে দেবার জন্যেই এসে ধরা দিলে। তারপর সেই শেষ দুটো দিন আর দুটো রাত। অসীম ধৈর্য ধরে এক-একটি মুহূর্ত গুনতে গুনতে অপেক্ষা করা। প্রাণ যখন একেবারে কণ্ঠাগত প্রায়-তখন উপস্থিত হল সেই মোক্ষম সময়। সেই একটা রাতেই আমার বয়স বিশ বছর বেড়ে গেল। বাইরে আলকাতরার মতো আঁধার, আর বৃষ্টি পড়ছে। কাছে-পিঠে এক ক্রোশের মধ্যে জন-প্রাণী নেই। নদীর কিনারায় একটা ভাঙা ঘরের ভিকর আমরা দুটি প্রাণী। অসহ্য যন্ত্রণায় সে গোঙাচ্ছে সে মেঝেয় পড়ে, মিটমিটে আলোয় তার দিকে চেয়ে আমি অসহায় ভাবে বসে আছি। কি ভাবে কি হয়, তখন কি করা দরকার, তার কিছুমাত্র জ্ঞান নেই আমার। বুকের মধ্যে ঢিপঢিপ করছে, ভয়ে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। যদি মরে যায়? ছেলে হবার সময় অনেকেই তো মরে ছেলে আটকে। যদি তাই হয়—তখন? অমানুষিক তার সেই কাতরানি, তার উপর তার দেহটা কুঁকড়ে মুচড়ে দুমড়ে এমন ভয়ঙ্কর হয়ে দাঁড়াল যে, সেদিকে আর চাওয়াই যায় না। একবার মনে হল-দিই দু-হাতে গলাটা টিপে চিরকালের মতো সমস্ত আওয়াজ বন্ধ করে। চোখ বুজে নিজের দু-কানে আঙুল দিলাম। ও একটা তীব্র চিৎকার করে উঠল। ভয়ে আঁতকে উঠে চোখ খুললাম। দেখি নীল হয়ে গেছে তার মুখ। ঠিক করলাম ছুটে পালাব। উঠে দাঁড়ালাম তার পাশ থেকে। চোরের মতো পা টিপে টিপে এগিয়ে যাচ্ছি ঘরের দরজার দিকে, আবার সে করুণ আর্তনাদ করে উঠল।

পিছন ফিরে তাকালাম। ইশারায় কাছে ডেকে বহু কষ্টে সে বললে—

কে যেন পোপটলালের কণ্ঠ চেপে ধরল দৃঢ়মুষ্টিতে। হঠাৎ তিনি দাঁড়িয়ে পড়লেন। নিজের দু হাতের মুঠো দুটো বার বার খুলে আর বন্ধ করে কি যেন দেখতে লাগলেন। যেন কিসের দাগ তাঁর দুই হাতে লেগে রয়েছে।

হঠাৎ হু-হুঁ করে কেঁদে উঠলেন তিনি। নিজেকে খাড়া রাখতে পারলেন না আর, হাঁটু মুড়ে বালির উপর বসে পড়লেন। কান্নার সঙ্গে মিশিয়ে ফিসফিস করে বলতে লাগলেন পোপটভাই–

“জ্যান্ত লাল-টুকটুকে এতটুকু একটি মেয়ে আমার এই দু-হাতে। কেঁদে উঠল নিষ্কলঙ্ক সদ্য-আগতের প্রথম ধ্বনি। তাড়াতাড়ি মুখ চেপে ধরলাম। তার সেই ছোট্ট মাথাটা ধরে একটা পাক দিতেই কোঁক কোঁক করে আবার সামান্য একটু আওয়াজ বেরুল। এক মুহূর্ত নষ্ট করবার কি সময় আছে তখন আমার? চক্ষের নিমেষে কাপড় জড়িয়ে নিয়ে গিয়ে নামালাম নদীর জলে। গলা পর্যন্ত জলে গিয়ে পুঁটলিটা ছুঁড়ে ফেলে দিলাম নদীর মাঝে। তখন সেই জলের মধ্যে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। আবার আমার শ্বাস বইতে লাগল। যেন প্রচণ্ড নেশা করেছিলাম এতক্ষণ। এবার সেই নেশার ঘোর কেটে যেতে লাগল। সভয়ে একবার পিছনে ফিরে দেখলাম কেউ সাক্ষী রইল কি না কোথাও। সেখানে সেই আঁধারে বৃষ্টির মাঝে কে আসবে! চেয়ে রইল শুধু মাথার উপরের ওই আকাশ। নিকষ-কালো বিরাট দুই চক্ষু মেলে, সভয়ে চেয়ে রইল আমার দিকে। ওই আকাশ আজও ঠিক তেমনি করেই চেয়ে আছে। ওর দিকে চোখ তুলে তাকালেই দেখতে পাই মুখ টিপে হাসছে আর নীরব ভাষায় বলছে আমায়- তোমার সেই মহাপাতকের সাক্ষী আছি আমি। আগাগোড়া আমি সমস্তই দেখেছি। আমাকে তো লুকাতে পারোনি তুমি কিছু। আমার কাছ থেকে কোথায় লুকাবে তুমি তোমার মুখ?”

সমস্ত পাগড়িসুদ্ধ মাথাটা সজোরে বার-কতক নেড়ে নিজের দু-হাত দিয়ে মুখ ঢেকে পোপটভাই কাঠ হয়ে বসে রইলেন।

তাঁর কাঁধের উপর আলতো করে একটা হাত রেখে নীরবে তাঁর পাশে দাঁড়িয়ে রইলাম আমি।

একসঙ্গে একগাদা প্রশ্ন ঠেলাঠেলি করতে লাগল মনের দরজায়। কে সেই মেয়ে? তারপর কি হল সেই মেয়ের? নদীর জল থেকে উঠে এসে কি করলেন তিনি, কোথায় গেলেন তারপর? মরবার জন্যে মেয়েটাকে সেই ঘরে ফেলে রেখে পালিয়ে এলেন নাকি? না ফিরে এসে দেখলেন ঘরের মেঝেয় সেও মরে কাঠ হয়ে আছে?– আরও কত রকমের কত প্রশ্নই করবার ছিল তাঁকে। একটি কথাও জিজ্ঞাসা করা হল না। যা জিজ্ঞাসা করব সেটাই হবে অবান্তর প্রশ্ন। আসল কথাটা হচ্ছে-পোপটলাল প্যাটেল সেই রাতের পর থেকে আজ পর্যন্ত বেঁচে রয়েছেন। বেঁচে থেকে তুষানলে দগ্ধ হচ্ছেন মাত্র এই আশাটুকু বুকে নিয়ে যে, একদিন না একদিন তিনি সশরীরে এসে পৌঁছবেন চন্দ্রকূপে–যেখানে পৌঁছলে তাঁর ভ্রূণহত্যার মহাপাতকটা বেমালুম যাবে উবে।

সামনের দিকে চেয়ে দেখলাম। কোথাও কিছুমাত্র নেই। ওই যে বিরাট শূন্যতার সমুদ্র, ওর ওপারে পৌঁছতে হবে। সেই তীরে আছে চন্দ্রকূপ, যার মাহাত্ম্য এমনই ভীষণ যে–যত বড় পাপই থাকুক না কেন-চন্দ্রকূপের জলে নিঃশেষে তার সবটুকু ধুয়ে গলে সাফ হয়ে যাবে। চেয়ে থাকতে থাকতে কিন্তু আমার মনে হল যে, পাপ নিয়ে কেউ চন্দ্রকূপ পর্যন্ত পৌঁছতে পারবে না। মনে হল যেন, এখানে পায়ের তলার বালি আর মাথার উপরের আকাশ-এ দুটোও এই অপার অতল শূন্যতার মাঝে কোথায় তলিয়ে গেছে। শুধু থাকবার মধ্যে আছে একটা অগ্নি-তরঙ্গ, যার উপর ভাসতে ভাসতে আমরা কোথায় যে চলেছি তা নিজেরাই জানি না। যদি সত্যই এই ভাসার অন্তে কোথাও কোনও কূলে গিয়ে ঠেকতে পারি তখন পাপপুণ্য, কর্মফল, এর কোনো কিছুই সঙ্গে থাকবে না, সবই নিঃশেষে পুড়ে ভস্ম হয়ে যাবে আমাদের কূল পাওয়ার আগেই। আমরা তখন অগ্নিশুদ্ধ নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক জ্যোতি মাত্র। অমৃতের সন্তান আমরা, আমাদের ভয় কি?

তবু একবার আগাগোড়া সমস্ত জীবনটা তন্ন তন্ন করে খুঁজে দেখলাম-আছে নাকি কোথাও ঘাপটি মেরে লুকিয়ে একটা মস্ত বড় জাত-পাপ। নাঃ, সেদিক দিয়ে আমি দেউলিয়া। মনের অন্ধকার কোনা-খুঁজিগুলোয় ছোটখাটো ঢোঁড়া ঢ্যামনা চিতি জাতের নির্বিষ পাপ অনেকগুলো কিলবিল করে উঠল বটে, কিন্তু চন্দ্রকূপের জলে ডুবিয়ে মারবার মতো

এক-আধটা কেউটে গোখরো-জাতের কোনো কিছু খুঁজেই পেলাম না। নাঃ, এই সামান্য পুঁজি নিয়ে এর তোড়জোড় করে এতদূর আসা ডাহা মূর্খামি হয়েছে। আমার খুদে পাপগুলোর জন্য ঘরের কাছের গঙ্গাসাগর বা শ্রীধাম নবদ্বীপই যথেষ্ট হত।

হিসাবটা উলটিয়ে নিলে অবশ্য লোকসান কিছুমাত্র নেই। চা-বাগানে ম্যালেরিয়ার বিষ পাছে শরীরে প্রবেশ করে এই ভয়ে আগে থেকে সপ্তাহে সপ্তাহে কুইনাইন গেলানো হয়। তেমনি যার শরীরে মহাপাপের বিষ ঢোকেনি, সে যদি চন্দ্রকূপ-দর্শনটা সমাধা করে গিয়ে দু-একটা কুলীন জাতের পাপ করেই ফেলে, তাহলে সেই পাপের ফল নিশ্চয়ই তাকে স্পর্শ করতে পারবে না। সুতরাং এ জীবনের বাকী দিনগুলোর জন্যে অনেকটা বেপরোয়া হয়ে চলতে ফিরতে পারব যদি একবার চন্দ্রকূপ থেকে সশরীরে ফিরে যেতে পারি। এও কি কম কথা নাকি!

দল থেকে আমরা অনেক পিছিয়ে পড়েছি। সেদিকে খেয়াল হতে পোপটভাই বললেন, "চলুন একটু পা চালিয়ে, নয়তো ওরা নাগালের বাইরে চলে যাবে।

অসম্ভব নয়। আমাদের ফেলে রেখে চলে যাওয়া কিছুমাত্র অন্যায় হবে না ওদের। ওরা যে তীর্থযাত্রী। ওদের এখন একমাত্র লক্ষ চন্দ্রকূপ। যে করে হোক একবার সেখানে পৌঁছে পাপের বোঝাটা ঘাড় থেকে নামাতে পারলে হয়। এ হেন সময়ে কে রইল পড়ে পিছনে তা দেখবার জন্যে ফিরে তাকাবার মতো দুর্বলতাটা যে হবে অমার্জনীয় অপরাধ।

সামনে নজর করে সমস্ত দলটা দেখতে পেলাম। অগ্নিকুণ্ডের মাঝে সুমুখ দিকে ঝুঁকে যেন সত্যই কি গুরুভার পিঠে নিয়ে চলেছে সব। দেখলাম যেন কালো কাপড়ে জড়ানো এক-একটা বিরাট মোট বাঁধা রয়েছে প্রত্যেকের পিঠে। সেইটের ভারে সকলে সামনের দিকে নুয়ে পড়েছে। বেচারা চন্দ্রকূপ বাবার বরাতটা কেমন! কি চমৎকর উপাচার নিয়ে চলেছি আমরা তাঁকে ভেট দিতে! এক-এক মোট উৎকট বিষাক্ত কালো কালো পাপ।

আবার কানে এল পোপটলালের স্বর।

"এবার দেখবেন ওই কুন্তীও আর আপনার সঙ্গ ছাড়বে না।"

চমকে উঠলাম। পোপটভাই বলতে লাগলেন, "ঠিক এই-ই হয়। একটা মেয়ের জন্য কেউ সর্বস্ব পণ করে বসে। হিতাহিতজ্ঞানশূন্য হয়ে আগুনের মাঝে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারপর সেই মেয়েকে যখন হাতের মুঠোয় পায় তখন সেই মেয়েই তাকে দেখে সকলের চেয়ে ঘৃণার চোখে। দুটি জিনিস হচ্ছে মেয়েদের কাছে কাছে সবচেয়ে মূল্যবান। নিজের জন্যে ইজ্জৎ আর নিরাপদ নিশ্চিন্ত আশ্রয়, আর তার গর্ভের সন্তানের জন্যে সমাজে উপযুক্ত স্থান। প্রবৃত্তির তাড়নার নেশার ঝোঁকে ঘরের বার হয়ে এসে সে দেখে যে, মান ইজ্জৎ শালীনতা সর্বস্ব খুইয়ে যার হাত ধরে সে পথে নামল সে তাকে আর যাই দিক ও-দুটি জিনিস কখনও দিতে পারবে না। আজীবন কাটাতে হবে শুধু ভয় বিড়ম্বনা আর মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে। তখন সেই লোকটিই হয়ে ওঠে সেই মেয়ের চোখে সব চেয়ে বড় শত্রু। তারপর সুযোগ-সুবিধা মেলে তো ছেঁড়া জুতোর মতো সেই লোকটিকে টেনে ফেলে দেয় দূর করে।

"কি দিয়েছে ওই থিরুমল কুন্তীকে? আপনি বলবেন ওই মেয়েটার জন্যে থিরুমলের প্রাণটা যেতে বসেছিল। কিংবা হয়তো এও বলতে পারেন যে, ওই মেয়ের জন্যেই থিরুমল আজ পাগল হয়ে গেছে। কিন্তু থিরুমল গেল কেন কুন্তীকে তার বাপের নিরাপদ আশ্রয় থেকে ভাগিয়ে আনতে? এই লাঞ্ছনা এই নির্যাতন এই নরক যন্ত্রণা ভোগ আজ কুন্তীর ভাগ্যে কিসের জন্যে? থিরুমলের সঙ্গে যদি দেখা না হত তাহলে কুন্তী তার বাপের ঘরে যেমন ছিল তেমনিই থাকত। কোনো দুর্ভোগ ঘটত না তার কপালে। সেই জন্যেই থিরুমলের চেয়ে বড় শত্রু আজ আর কুন্তীর কাছে কেউ নয়। থিরুমলকে সে আর কিছুতেই বরদাস্ত করতে পারবে না, কারণ তার নারীত্বের ইজ্জটুকু ওই থিরুমলের জন্যেই খোয়া গেছে।"

এর জবাবে অনেকগুলো ভালো কথা শোনাতে পারতাম পোপটভাইকে। বলতে পারতাম তাঁর মুখের উপর। এই দুনিয়ার একান্ত পবিত্র সব অমূল্য কথাগুলি,—প্রেম ভালোবাসা আত্মত্যাগ বিরহ ইত্যাদি। প্রেমের জন্যে কবে কোথায় কখন কি ভাবে কোন

কোন চিরস্মরণীয়া অতুলনীয় আত্মত্যাগ আর বিরহযন্ত্রণা ভোগ করে জ্বলন্ত আদর্শ স্থাপন করে গেছেন। ইতিহাস-পুরাণের বিখ্যাত বিখ্যাত নজিরগুলি টেনে এনে তাঁর চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে অপূর্ব পুলক অনুভব করতে পারতাম। সাড়ম্বরে তাকে বুঝিয়ে দিতে পারতাম, সহজিয়া পরকীয়া ইত্যাদি সব গুহ্য রসতত্ত্বের অপার মহিমা। একখান জুতসই গীতও হয়তো তাঁকে শুনিয়ে দিতে পারতাম যাতে প্রেমিকা প্রেমিকের জন্য কেঁদে আকুল হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কিছুই করা হল না। তার বদলে স্পষ্ট দেখতে পেয়ে শিউড়ে উঠলাম পোপটভাই-এর মনটায় গাময় দগদগে বিষাক্ত ঘা। অনর্থক পাছে সেই ব্যথার স্থানেই আবার আঘাত দিয়ে ফেলি এই ভয়ে চুপ করে রইলাম।

"আমার ভাগ্যেও ঠিক তাই হয়েছিল। সেই রাতের পর থেকেই আমি তাঁর দু চোখের বিষ হয়ে উঠলাম। বিপদ থেকে উদ্ধার পেয়ে তাঁকে নিয়ে তো বাড়ি ফিরলাম। মেলা থেকে ফেরবার পথে ডাকাতের হাতে পড়ে তিনটে দিক কি ভয়ঙ্কর অবস্থায় কেটেছে তার লোমহর্ষক বিবরণ, আর কি অদ্ভুত উপায়ে তাদের হাত থেকে আমরা পালিয়ে আসতে পেরেছি তার আশ্চর্য কাহিনী শুনিয়ে আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে রেহাই মিলল। উপোসে আর পথের কষ্টে তাঁর শরীর ভেঙে পড়েছে এই অছিলায় তিনি কয়েকদিন শুয়ে রইলেন। কোথাও কারও মনে কিছু সন্দেহ হল না। সন্দেহ করবেই বা কে। চিরকালই গ্রামে আর নিজের লোকের কাছে আমি একজন আদর্শ নিষ্কলঙ্ক চরিত্রের মানুষ। সেই আমি যদি মৃত বড় ভাই-এর স্ত্রী আর গ্রামের দু-চারজন বুড়িকে নিয়ে মেলা দেখিয়ে আনতে যাই তাতে আর সন্দেহ করবার কি আছে। তারপর সেই বুড়ি কটাকে ফাঁকি দিয়ে দুজনের সরে পড়তে কতক্ষণ লাগে? আগে থেকেই নদীর ধারে একটা ভাঙা ঘর আমার জানা ছিল। সেইখানেই গিয়ে উঠেছিলাম আমরা দুজনে। জনপ্রাণীও সেধারে যায় না। কাজেই দুটো দিন লুকিয়ে থাকতে কোনো বাধাই ছিল না সেখানে। প্রাণ নিয়ে যে বাড়ি ফিরে এসেছি আমরা এই আনন্দেই সকলে উন্মত্ত হয়ে উঠল।

"সবই সব দিক থেকে যেমন আশা করেছিলাম সেই রকমটি হয়ে গেল। আবার আমার মনে কল্পনার রং ধরতে শুরু করল। তখনই আরম্ভ হল সেই আসল খেলা। তিনি আর আমার ছায়া পর্যন্ত সহ্য করতে পারলেন না। দূর থেকে কি উপায়ে কত রকমে সকলের চোখে আমায় হেয় করা যায়-সর্বদা সেই চেষ্টা করতে লাগলেন। অন্য সমস্ত সৎগুণের সঙ্গে মেয়েদের একটি শক্তি আছে যা কোনো পুরুষ কখনো আয়ত্ত করতে পারবে না। সে শক্তিটি হচ্ছে নিজের ভালোমানুষি ষোল আনা বজায় রেখে দূর থেকে নানা উপায়ে শত্রুতা করে জ্বালানো। এ বিদ্যেটা মেয়েরা কষ্ট করে বহু যত্নে শেখে। যে হতভাগার উপর এই বিদ্যের পরীক্ষা প্রয়োগ চলে তার অবস্থা হয় শোচনীয়। মুখ বুজে শুধু মার খেয়ে যাও। মুখ খুলেছ কি মরেছ। তৎক্ষণাৎ চারিদিক থেকে সকলে একবাক্যে বলে উঠবে, তোমার চেয়ে নীচ তোমার চেয়ে হীন নরাধম আর দুনিয়ায় দুটি নেই। এ দুর্ভোগে যে কখনো পড়েনি সে বুঝবে না সেই বর্ণচোরা শত্রুতার স্বরূপটি কি।

"মুখ বুজেই মার খেয়ে চলেছিলাম আমি। চিরকাল তাই চলতাম। কখনো ধৈর্যের বাঁধ ভাঙতো না আমার। কিন্তু সব চেয়ে চরম শত্রুতা যা তা-ই তিনি করে বসলেন। আমাদের বংশের মুখে কালি লেপে দিলেন। আমার বাপ-ঠাকুর্দা চৌদ্দপুরুষের উঁচু মাথা হেঁট করলেন। করবেনই তো, তাঁর কি দোষ। সেই বংশেরই বংশধর আমি-আমিই তো তাঁকে সর্বনাশের পথে টেনে নামিয়েছি। কেন তিনি প্রতিশোধ নিতে ছাড়বেন।"

অসহ্য ক্ষোভে পুনরায় পোপটভাই-এর কণ্ঠ রুদ্ধ হল। অনেকক্ষণ পরে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলাম, "এখন আপনার বৌদি কোথায়?"

নিষ্প্রাণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চাইলেন পোপটভাই।

"নাগালের বাইরে। একেবারে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। এখন তিনি অনেক উঁচুতে উঠে গেছেন। আমাদের কুমার সাহেবের সব চেয়ে বড় বাঈজি এখন তিনি। কত নামডাক এখন তাঁর। নাচ জানেন গান জানেন। দেশসুদ্ধ লোক বলাবলি করছে-অমুক বাঈজি অমুক বাড়ির

বড় বৌ। এই কথা শুনতে শুনতে আমার বাবা মারা গেছেন। আমি যখন মরব তখনও লোকে আমাদের বাড়ির বড় বউ-এর খ্যাতি গাইবে। আমার মা পাগলপ্রায় হয়ে আছেন। দেশে আজ আমরা একঘরে। এ সমস্তের জন্য আমিই দায়ী। হাঁ, আমিই। আমিই সংসারে এই বিষ ঢুকিয়েছি, উঃ!"

এরপর পোপটলাল সত্যিই সজোরে পা চালালেন। চন্দ্রকূপ যে তাঁকে পৌঁছতে হবেই তাড়াতাড়ি।

একাই চলেছি। অনেকটা আগে এগিয়ে গেছে সকলে। মাঝে মাঝে চোখ তুলে দেখছি ওদের। রোদের ঝলকানিতে এতদূর থেকে ওদের দেখাচ্ছে যেন একটা লম্বা সরীসৃপ-জাতীয় প্রাণী। উট দুটো সামনে থাকায় মনে হচ্ছে যে প্রাণীটা মাথা উঁচু করে বুকে হেঁটে এগিয়ে চলেছে। আরও অনেক সামনে অজস্র যজ্ঞকুণ্ড জ্বালা হয়েছে। কুণ্ডলী পাকিয়ে সাদা ধোঁয়া সেই সমস্ত কুণ্ড থেকে উঠে আকাশ স্পর্শ করেছে। তার ওধারে আর দৃষ্টি পৌঁছয় না। ওই ধোঁয়ার যবনিকার অন্তরালে বসে কে জানে কোন জন্মেঞ্জয় আবার নূতন করে সর্পযজ্ঞ আরম্ভ করেছেন- যাঁর মন্ত্রের অমোঘ অনিবার্য আকর্ষণে ওই বিরাট সরীসৃপটি আপ্রাণ চেষ্টায় অগ্রসর হচ্ছে তাঁর সেই যজ্ঞকুণ্ডে ঝাঁপিয়ে পড়ে পুড়ে মরবার জন্যে। আমিও চলেছি সরীসৃপটাকে দূর থেকে অনুসরণ করে যজ্ঞের পূর্ণাহুতি দেখবার আশায়।

যজ্ঞস্থানে পৌঁছে কতটা সমারোহ-কাণ্ড দেখা ভাগ্যে জুটবে এই চিন্তায় অনেকটা অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিলাম; হঠাৎ চমকে উঠে মুখ তুলে দেখি কে একজন ফিরে আসছে। কি হল আবার ওর! কাছাকাছি হতে চিনতে পারলাম-আমার ছড়িদার পণ্ডিত রূপলাল ঠাকুর করাচীওয়ালে। বত্রিশখানা দাঁত বার করে নীরবে সামনে এসে দাঁড়াল, —হাতে এক লোটা পানি।

আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞসা করলাম, "কি ব্যাপার- আবার ফিরে চলেছ কোথায়?" সলজ্জ সুরে বললে, 'আপনার জন্যে জল নিয়ে এলাম। বড্ড পিছিয়ে পড়েছেন। হয়তো তেষ্টাও পেয়েছে আপনার।"

চেয়ে রইলাম ওর মুখের দিকে। এ কি সেই রূপলাল, যে আজ ভোরেই আমায় চোখ রাঙিয়েছে, যে বিন্দুমাত্র দিক্কা না করে তারই সমবয়সী জুড়িদার আর একজনকে বিসর্জন দিয়ে চলে এল অবলীলাক্রমে!

পকেট থেকে এক ডেলা মিছরি আর কয়েকটা খেজুর বার করে দিয়ে রূপলাল বলেন, "নিন-জল খেয়ে নিন। এখনও অনেকটা যেতে হবে। একেবারে চন্দ্রকূপের কাছে গিয়ে তবে আমরা থামব।"

নিলাম। তেষ্টায় পায়ের নখ পর্যন্ত শুকিয়ে টা-টা করছিল। মিছরির ডেলাটা চিবিয়ে লোটার সবটুকু জল গলায় ডেলে দিয়ে আবার ওর মুখের দিকে চাইলাম। ওর মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠেছে।

বিড়ি ধরিয়ে নিয়ে আবার হাঁটা আরম্ভ হল। এবার আমার ছড়িদার আমার পাশে। এতক্ষণ পরে কি জানি কেন মনটা বেশ হাল্কা হয়ে গেল। সকাল থেকে এতক্ষণ একটা দীর্ঘ দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম, সেটার হাত থেকে মুক্তি পেলাম। মহাতীর্থ হিংলাজ দর্শনে চলেছি আমি, আমার পাশে আমার পাণ্ডা আমার এই তীর্থপথের কাণ্ডারী, যে আমাকে হিংলাজ দর্শন করিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে যাবে করাচীর সেই নাগনাথের আখড়ায়। হোক সে বয়সে ঢের ছোট, নেহাত লক্ষ্মীছাড়ার মতো হলই বা তাকে দেখতে, টানলই না হয় সে ছিলিমের পর ছিলিম। তবু এখানে এই তীর্থপথে এই ছোকরাই আমার একমাত্র বন্ধু, সব চেয়ে বড় আপনার। তাই তো পিছিয়ে পড়েছি বলে ওকে ফিরে এসে টেনে নিয়ে যেতে হচ্ছে আমাকে। এ আমাকে যেখানে নিয়ে গিয়ে দেখাবে তা-ই হবে আমার কাছে মহাতীর্থ। যে কোনো উপাখ্যান যে ভাবেই বোঝাক, যে কোনো মন্ত্র যে রকম উচ্চারণ করেই পড়াক, তার বিচার করবার আমি কে? একবার যখন ওর হাতে সমস্ত সঁপে দিয়েছি তখন আমার একমাত্র কর্তব্য ভালো মন্দ সব কিছুর ভার ওর হাতে ছেড়ে দেওয়া-ওকে বিশ্বাস করে ওর আদেশ শিরোধার্য করে তীর্থ

করে ফেরা। অবিশ্বাস সংশয় বিচারবুদ্ধি শুধু যন্ত্রণাই বাড়াবে। শান্তি পাব না। তীর্থযাত্রা বিফল হবে আমার।

পাশে চলতে লাগল রূপলাল চিৎকার উঠল, “হিংলাজ রানি-মাতা কি—”

সামনে থেকে সকলেই একযোগে উত্তর দিলে ওর ডাকে–”জয়!”

আরো জোরো পা চালালাম।

“ও কি! কি ও?”

আচম্বিতে আর্তনাদ করে উঠলেন ভৈরবী। সামনে বহুদূরে অসাধারণ কিছু দেখতে পেয়েছেন তিনি উটের উপর থেকে, যা দেখে তাঁর বাহ্যজ্ঞান হারিয়েছে। কাঠ হয়ে চেয়ে আছেন দু চোখ মেলে। তাঁকে আঁকড়ে ধরে কুন্তীও সেইভাবে চেয়ে আছে সামনের দিকে।

চেঁচিয়ে উঠলাম নীচে থেকে, “কি হয়েছে– কি দেখছ অমন করে?” কোনো উত্তর নেই। আমার কথা কানেও গেল না ওদের। দুজনেই যেন পাষাণ হয়ে গেছে।

অনেকটা আগে বড় উট নিয়ে চলেছে গুলমহম্মদ। আরও কয়েক পা এগিয়ে একটা বালির টিলার উপর পৌঁছল সে, সঙ্গে সঙ্গে অদ্ভূত একটা আওয়াজ করে উঠল। তারপর একটানে মাথার পাগড়িটা খুলে আছড়ে ফেললে পায়ের কাছে। উটের দড়ি আর টাঙিখানা তার হাত থেকে খসে পড়ল। হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল সে বালুর উপর।

রূপলাল ছুটে গেল তার পাশে। গিয়েই চেঁচিয়ে উঠল, “বাবা চন্দ্রকূপ স্বামী!” কথাটা শেষ হবার আগেই উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল সে।

চক্ষের নিমেষে সবাই কাঁধের কুঁজো নামিয়ে লুটিয়ে পড়ল অগ্নি জ্বলন্ত বালুর বুকে। একেবারে সাষ্টাঙ্গ প্রণাম।

মাথার পাগড়ি খুলে দিলমহম্মদ বসে পড়ল ঊর্বশীর পায়ের কাছে। একা আমি থ হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। সামনে পিছনে কোনো দিকে পা বাড়াবার উপায় নেই। চারিদিকে সবাই নিচুমুখ হয়ে পড়ে আছে টান টান হয়ে।

আবার ধমক দিলাম ভৈরবীকে, “হয়েছে কি? দেখছ কি তুমি অমন করে?”

কোনো জবাব দিলেন না তিনি, তবে কাজ হল। হুঁশ ফিরে পেয়ে দুহাত জোড় করে কপালে ঠেকিয়ে চোখ বুজে রইলেন। তাঁর দেখাদেখি কুন্তীও।

একে টপকে ওকে ডিঙিয়ে গুলমহম্মদের পাশে গিয়ে দাঁড়ালাম। দাঁড়িয়ে মুখ তুলে চেয়ে দেখি- যা দেখলাম তা দেখে ভয় বিস্ময়ে আমিও কাঠ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। হয়তো উচিত ছিল তখনই সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়া। কিন্তু তা আর আমার ভাগ্যে হয়ে ওঠেনি। উচিত-অনুচিতের প্রশ্নই তখন উঠতে পারে না। বিচার-বিবেচনা করে মন আর বুদ্ধি। এমন কিছু দেখছি দু-চোখ দিয়ে যার লেশমাত্র ধ্যানধারণা ছিল না মনের কোণেও। সে দৃশ্য চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গেই চিত্তবৃত্তি নিরুদ্ধ হয়ে গেছে। ক্ষণেকের তরে হলেও সুখ দুঃখ আনন্দ অনুভূতি–সব কিছুর হাত থেকে পরিত্রাণ পেয়ে এক অপার্থিব মহাজিজ্ঞাসার মাঝে ডুবে গেলাম। হারিয়ে ফেললাম নিজেকে সেই মুহূর্তে। চোখ দিয়ে-শুধু চোখ নয় সমস্ত মন দিয়ে নমস্কার দিয়ে সর্বেন্দ্রিয় দিয়ে গিলতে লাগলাম দৃষ্টির শেষ সীমায় আকাশের বিচিত্র আঁকা সেই ছবিখানি।

ছোট বড় মেজ সেজ অনেকগুলি নৈবেদ্য সাজানো রয়েছে সেখানে। যাঁর উদ্দেশ্য সাজানো হয়েছে ওগুলি, তাঁর পায়ের তলা স্পর্শ পাবার আশায় নৈবেদ্যর চূড়াগুলি ধোঁয়াটা মেঘ ভেদ করে উড়ে গেছে আকাশের মধ্যে। কুণ্ডলী পাকিয়ে উঠেছে ধোয়া ওখান থেকে। তা দেখে বেশ আন্দাজ করা যায় কি পরিমাণ ধূপ-ধুনা পোড়ানো হচ্ছে ওখানে। কিংবা হয়তো বিরাট যজ্ঞ হচ্ছে। ধরিত্রীর একেবারে শেষ প্রান্তে ওই নিভৃত স্থানটি খুঁজে বার করে তামাম জীবজগতের দৃষ্টির অন্তরালে যাঁরা ওই পূজা-অনুষ্ঠানের বিপুল আয়োজন করেছেন-ভালো করে নজর করেও এতদূর থেকে তাঁদের কাকেও দেখতে পাওয়া গেল না। কিন্তু কেমন একটা আতঙ্কে বার বার বুকের ভিতর কেঁপে উঠল।

কারা করছেন ওই অনুষ্ঠান? কোন দেবতার তুষ্টির জন্যে ওই অমানুষিক আয়োজন?

কি উদ্দেশ্যে এত সঙ্গোপন? কি মন্ত্র উচ্চারিত হচ্ছে ওখানে? কোন মহাবিল নিবেদন করা হবে ওই পূজায়?

ওই চন্দ্রকূপ। অথবা ওখানেই চন্দ্রকূপ। ওই চন্দ্রকূপের অধীশ্বর সকলের সর্বপাপ নিঃশেষে হরণ করেন। আর তা করেন বলেই তাঁকে এই নিরালায় সকলের ধরা ছোঁয়ার নাগালের বাইরে পালিয়ে এসে ধুনি জ্বালাতে হয়েছে। দুনিয়ার পাপ-স্রোত নিরন্তর গড়িয়ে এসে পড়ছে তাঁর ধুনিতে। সেই হচ্ছে চন্দ্রকূপ স্বামীর ধুনির হবি। তারপর সেই পাপ ধোঁয়া হয়ে ধোঁয়ার সঙ্গে মিশে যাচ্ছে অনন্ত আকাশের গায়ে। মেঘ হয়ে ছড়িয়ে পড়ছে সারা জগতে। জল হয়ে নামছে মানুষের মাথায়। পড়ছে শস্য-ফসলের উপর। তা-ই খাচ্ছে সবাই জীবনধারণের তাগিদে। ফলে পাপই জন্মাচ্ছে আবার তাদের রক্ত-মাংস থেকে। সেই পাপ আবার হুড়হুড় করে এসে পড়ছে চন্দ্রকূপ দেবতার ধুনিতে। সৃষ্টির কোন আদিকালে এই অখণ্ড অনির্বাণ যজ্ঞাগ্নি জ্বালা হয়েছে, আজও তা জ্বলছে সমানে। অনাগত অন্তহীন ভবিষ্যৎ জুড়ে জ্বলতে থাকবে এই ধুনি। কখনো কোনো কালে ক্ষুন্নিবৃত্তি হবে না এই বৈশ্বানরের। নিরবচ্ছিন্ন হবিঃস্রোত চাই আহুতির জন্যে। সুতরাং পাপীরা চিরকাল জন্মাবেই নয়তো মহাকালের এই মহাপ্রয়োজন সিদ্ধ হবে কি করে।

কিন্তু যদি কেউ প্রাণের মায়া ত্যাগ করে একবার এসে পড়তে পারে এখানে, এসে একটিবার স্পর্শ করতে পার এই যজ্ঞাগ্নি, তবে তৎক্ষণাৎ সে হবে অগ্নিশুদ্ধ নিষ্পাপ জ্যোতিষ্মান আনন্দের সন্তান। তার তখন অধিকার মাতৃদর্শনের। ব্রহ্মরন্ধ্রের মহাপীঠে সে তখন জ্যোতিঃদর্শন করতে পারবে। জ্যোতিঃস্বরূপিণী আনন্দময়ী জননী পাপপুণ্য প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি জ্ঞান-বিচার এ সবের ধরা ছোঁয়ার বাইরে। সেই মাতৃলোকের দ্বার জুড়ে এই ধুনি জ্বেলেছেন মহাকাল। আজ আমরা অগ্নিশুদ্ধ হব। আনন্দের সন্তান হতে চলেছি আমরা। আজ আমাদের নবজন্ম লাভের পরম ক্ষণটি সমুপস্থিত।

নিজের অজ্ঞাতে কখন হাঁটু গেড়ে বসে পড়েছি বালুর উপর-কখন উঁচু মাথা নিচু হয়ে পোড়া কপালটা ঠেকেছে পোড়া বালুর উপর-এ সমস্ত কিছুই টের পাইনি। শুধু মনে আছে তখন একটিমাত্র মন্ত্র সমস্ত ভক্তির মধ্যে ছুটোছুটি করে বুকের মধ্যে তোলপাড় লাগিয়েছিল। সেই মহামন্ত্রটি হচ্ছে-মা।

এসে যে আমরা পৌঁছেছি এ সংবাদ বার বার গলার জোরে পৌঁছে দেওয়া হল চন্দ্রকূপ স্বামীর দরবারে। বুক ফাটিয়ে বার বার জয়ধ্বনি দেওয়া হল চন্দ্রকূপ বাবার। একে অপরকে জাপটে ধরে হাউমাউ করে কাঁদতে লাগল। কেউ বা বুক চাপড়ে ধেই ধেই করে নাচতে লাগল। জন-দুই সেই যে উপুড় হয়ে শুয়েছে আর ওঠেই না।

ইতিমধ্যে ঊর্বশীকে বসিয়েছে দিলমহম্মদ। কুন্তীকে নিয়ে ভৈরবী নেমে পড়েছেন। আর উটের উপর চড়ে এগোনো চলতেই পারে না। সে স্পর্ধা থাকাও একান্ত অনুচিত। ওই দীন দুনিয়ার মালিক দীনবন্ধু দয়ালের দরবারে দীনহীনের মতো পায়ে হেঁটে যাওয়াই প্রয়োজন। দেহ মন আত্মা জুড়িয়ে যাবে তাঁর কল্যাণস্পর্শে। যে দুর্বার পিপাসা নিয়ে জন্মেছি, যা বুকে নিয়ে এতদিন ছুটে মরছি, আজ হবে সেই অনন্ত পিপাসার শান্তি। করুণাময়ের আঁখির করুণাধারায় স্নান করে জীবনের সকল জ্বালা আজ জুড়োবে। চলো, এগিয়ে চলো আর একটু।

কিন্তু এ আবার কী! ওরা দুজনে যে ওঠেই না!

ওরা দণ্ড খাটতে খাটতে যাবে।

যেখান থেকে চন্দ্রকূপ প্রথম দর্শন হবে সেখান থেকে দণ্ড খাটবে চন্দ্রকূপ পর্যন্ত—এই মানত করে ওরা রওয়ানা হয়েছে বাড়ি থেকে। উপুড় হয়ে শুয়ে পড়বে হাত দুটো মাথার দিকে সোজা করে দিয়ে। হাত যে পর্যন্ত পৌঁছল সেখানে একজন বালির উপর দাগ টানবে। তখন উঠে হেঁটে সেই দাগ পর্যন্ত পৌঁছে আবার উপুড় হয়ে পড়বে। তখন আবার দাগ টানা হবে। এইভাবে শুতে শুতে ওরা যাবে চন্দ্রকূপ পর্যন্ত।

ব্যাপারটা মাথায় যখন ঢুকল তখন শিউরে উঠলাম ভয়ে দুর্ভাবনায়। ওরা যে ঝলসে

যাবে। বড় বড় ফোঁসকা পড়বে ওদের মুখে হাতে সর্বাঙ্গে। কিন্তু কে যাবে ওদের বারণ করতে? আর বারণ ওরা শুনবেই বা কেন? কার আছে এত বড় বুকের পাটা, যে দেবতার মানত শোধ না দিয়ে তার রোষবহ্নিতে জ্বলে পুড়ে খাক হবে!

অতএব তারা ওইভাবেই চলল। সঙ্গে দাগ টানতে টানতে চলল পাণ্ডা রূপলাল ঠাকুর ছড়িওয়ালা। আমি দুই চোখ বুজে মনে মনে বার বার ক্ষমা চাইলাম চন্দ্রকূপ বাবার কাছে

"হে দেবতা, তুমি এদের ক্ষমা কোরো। যারা তোমার করুণাময় স্বরূপটি বুঝতে পারল না, তাদের তুমি দয়া কোরো দয়াময়। খানিকটা আত্মতৃপ্তি ওরা পাবে এই নিষ্ঠুর আত্মপীড়নের ফলে। হয়তো তাতে কিছুটা আত্মগ্লানির উপশম হবে ওদের। কিন্তু এই মিথ্যা আত্মতৃপ্তি লাভের মোহে ওরা তোমাকে কোথায় নামিয়ে আনছে তা বোঝবার শক্তিও ওদের নেই। চিরকাল ওরা পরের কাছ থেকে পেয়েছে নিষ্ঠুর নির্যাতন। নিজেরাও অন্যকে দিয়েছে নির্দয় আঘাত। একমাত্র নৃশংসতা ছাড়া অন্য কিছু ওরা জানেও না বোঝে ও না। সেই উপাচারেই তোমায় তুষ্ট করতে চায় ওরা। ওরা যে তোমায় আত্মবৎ কল্পনা করেছে। নির্যাতন করে ওরা চিরকাল আনন্দ পেয়েছে বলেই তোমাকেও একজন চরম নিপীড়নকারী বলে ওদের ধারণা হয়েছে। তাই এই বীভৎস আয়োজন তোমার অনুগ্রহ লাভের আশায়। একমাত্র তুমিই এদের এই মহাভ্রম থেকে মুক্তি দিতে পারো। কে এদের বোঝায় যে তুমি জমিদারের নায়েব মশাই বা থানার দারোগা সাহেব নও!"

কতক্ষণ চোখ বুজে হাঁটছিলাম খেয়াল ছিল না। আর কেনই বা দু-চোখের জল গড়িয়ে নামছিল বুকে তাও আজ সঠিক বলতে পারব না। কানে এল—

"কেন কাঁদছেন?"

চোখ মেলোম, আর তখন খেয়াল হল যে আমার চিরশুষ্ক চোখে শ্রাবণের ঢল নেমেছে। একটু লজ্জায় পড়ে গেলাম বৈকি। মুখ ফিরিয়ে দেখি, পাশে কুন্তী। তখনও সে চেয়ে আছে আমার মুখের দিকে। আবার জিজ্ঞাসা করলে চাপা গলায়, "কেন কাঁদছেন?"

এ কেন'র জবাব দেওয়া সহজ নয়। সব সময় সব কেন'র জবাব কি দেওয়া সম্ভব? তাহলে সমস্যা বলে কোনো কিছুর অস্তিত্বই থাকত না যে দুনিয়ায়। মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়া মাত্রই সকলে সর্বাগ্রে কেঁদে ওঠে কেন? কেউ কি কখনো শুনেছে না দেখেছে যে খিলখিল করে হাসতে হাসতে কোনো শিশু পৃথিবীতে শুভ পদার্পণ করেছে?

তেমনি আমার সেদিনকার অহেতুক চোখের জলের যেমন কোনো মানে খুঁজে পাই না, তেমনি সে পোড়া চোখের জল পড়া সহজে বন্ধ হতেও চাইল না। কি জানি কেন বার বার মনে হতে লাগল যে, চন্দ্রকূপের দেবতাও ওই ওখানে একলা বসে অশ্রু বিসর্জন করছেন নীরবে। এই মূঢ় মানুষ দুটির দিকে অসহায় আকুল দৃষ্টিতে চেয়ে আছেন তিনি। এদের এই অমানুষিক আত্মপীড়নে তাঁর বুক হাহাকারে ভরে উঠেছে। বার বার গুমরে গুমরে বলছেন তিনি, "ওরে না না না, দুঃখ দিয়ে আর দুঃখ পেয়ে আমকে তুষ্ট করতে চাস নে তোরা। তোদের এই দানবীয় ভক্তির অত্যাচার আর আমার সহ্য হয় না। ওসব সইবার আমার শক্তি নেই বলেই এখানে দুনিয়ার এই শেষপ্রান্তে পালিয়ে এসেছি আমি। এখানেও কি তোরা আমায় রেহাই দিবি না রে? এখানেও তাড়া করে এসে আমাকে জ্বালা দিচ্ছিস তোরা! তোদের এই রাক্ষুসে ভক্তি দেখানোটা বন্ধ করে আমায় শান্তি দে এবার!"

স্পষ্ট দেখতে পেলাম চোখ বুজে-জটাজটধারী, কপালে অর্ধচন্দ্র, পরনে বাঘছাল—এক জ্যোতির্ময় ক্ষমা সুন্দর পরম দেবতাকে। দুটি অনুপম আঁখি হতে মুক্তার মতো বড় বড় ফোঁটা গড়িয়ে পড়ছে তাঁর বুকের উপর। অসহ্য যন্ত্রণায় তিনি একেবারে আড়ষ্ট নীল হয়ে গেছেন।

আবার শুনতে পেলাম পাশ থেকে-"কাঁদবেন না আপনি। অনর্থক চোখের জল ফেলছেন কেন? সে আসবে, ঠিক আসবে। দেখবেন আমার কথা সত্যি হয় কি-না।"

কুন্তী! এ হতভাগীর আর অন্য কোনো চিন্তা নেই। এ শুধু আপন দুঃখসাগরেই হাবুডুবু খাচ্ছে। ফিসফিসিয়ে বলতে বলতে চলল কুন্তী আমার পাশে পাশে-"এত সহজে কি রেহাই পাব নাকি আমি তার হাত থেকে? এখন হয়েছে কি আমার? কতটুকু হয়েছে? আজীবন

আমাকে নরকযন্ত্রণা ভুগতে হবে যে। কুকুরে শেয়ালে আমাকে নিয়ে ছেঁড়াছিঁড়ি করবে তবে না আমার কাজের উপযুক্ত ফল মিলবে! কি দেখে, কার উপর নির্ভর করে আমি ঘর ছেড়ে পথে নেমেছি? বাপ-মায়ের মুখে কালি মাখিয়ে দিয়েছি কিসের লোভে? তার ফল ভুগতে হবে আমাকে? কিসের অভাব ছিল আমার? আজ আমায় কোথায় আশ্রয় মিলবে? কুষ্ঠব্যাধি হয়েছে যে আমার সর্বাঙ্গে—আমাকে ছোঁবে কে? শুধু ওই আমায় ছোঁবে, আর ওর মতো আমার হাড় মাংস নিয়ে যারা ছেঁড়াছিঁড়ি করবে তারাই আমায় ছোঁবে। তার জন্যে আপনার চোখের জল পড়ছে-পড়বেই তো! সে যে পুরুষমানুষ, তার তো কোনো অপরাধ থাকতে পারে না। সব দোষ সব অপরাধ আমার কারণ আমি মেয়ে হয়ে জন্মেছি। শুধু শুধু আর কাঁদবেন না আপনি। সে ঠিক এসে পৌঁছবে। না এসেই পারে না। যতক্ষণ আমার এই হাড় রক্ত মাংস আছে ততক্ষণ সে এর লোভ ছাড়তেই পারে না। তা সে পাগলই হোক আর যাই-ই হোক।

এবার জল পড়তে লাগল কুন্তীর চোখ দিয়েও। কোনো কথা না বলে তার কাঁধে একটা হাত তুলে দিলাম। সে ফোঁপাতে লাগল। কাঁদুক খানিক। পড়ুক চোখের জল এই বালুর উপর। তাতে যদি জুড়ায় ধরিত্রীর অঙ্গ, তাহলে ওর বুকের জ্বালাও নিশ্চয়ই জুড়োবে। অন্য কারও চোখের জল পড়তেই পারে না ওর জন্যে। এতটুকু সহানুভূতির বিন্দুমাত্র আশা ও করতে পারে না কারও কাছে। স্বেচ্ছায় সমাজ স্বজাতি আত্মজন সব কিছু ছেড়ে আজ ও এমন জায়গায় নেমে দাঁড়িয়েছে যেখানে সব কিছুর জন্যেই মূল্য দিতে হয়। এটুকু ও নিজেই ভালো করে বোঝে। তাই আজ ও কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারে না যে সম্পূর্ণ অকারণ এবং কিছুমাত্র প্রত্যাশা না করেই এই তীর্থযাত্রী দলের সব কটি লোক ওর হিতাকাঙ্ক্ষী। আমরা সকলেই মরণের মুখ গহ্বরের মাঝে ঘুরে বেড়াচ্ছি। এ সময় কোনো শখ কোনো বাসনা-কামনা কারও মনে আসতেই পারে না। তাছাড়া সকলেই এখানে এসেছে জান কবুল করে নিজের নিজের বুকের ভার নামাতে। তবুও যে কেউ ওকে এখানে ফেলে যেতে চায় না, তার কারণ সকলেরই মা বোন কন্যা ঘরে আছে। কোনো রকমে ওকে নিয়ে করাচী পৌঁছতে পারলে হয়। তারপর যা থাকে হোক ওর কপালে। আমরা কেউ ফিরেও দেখতে যাব না।

ঠিক সমানেই চলছেন ভৈরবী-তাঁর ঠোঁট নড়ছে। ডানহাতের কব্জি পর্যন্ত জপমালার লাল ঝুলিটির মধ্যে ঢোকানো। ঝুলিসুদ্ধ হাতটি বুকের কাছে ধরা রয়েছে। বাঁ হাতখানি সুখলালের কাঁধে। অর্থাৎ এখনও ইষ্টমন্ত্রটা ভোলেননি তিনি। এটাও সহজ কথা নয়।

অনেকে সুর করে ভজন গাইতে গাইতে চলেছে। দীর্ঘকায় গোকুলদাস সবার আগে চলেছে লম্বা লম্বা পা ফেলে। চিরঞ্জীর সঙ্গে আড়াআড়ি ভাবটার নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। দুটো কুঁজোই বইছে চিরঞ্জীলাল। কে জানে আর কোনো খাবার জিনিস লুকানো আছে কিনা গোকুলদাসের কাছে।

চলেছেন পোপটভাই মাথা হেঁট করে। পিছন থেকে আজ তাঁকে দেখলাম এক নতুন দৃষ্টিতে। সকলের সঙ্গে থেকেও এ ব্যক্তি সম্পূর্ণ একা, সঙ্গীহীন। মুখ বুজে ইনি নিজের বোঝা নিয়ে চলেছেন নিঃশব্দে। সে বোঝার অংশ নেবার শক্তিও নেই অপর কারও। চন্দ্রকূপে পৌঁছে বিসর্জন দেবেন সেই জঞ্জালের পুঁটলিটি। তখন ভারমুক্ত হবেন পোপটভাই। স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখতে পাবেন দুনিয়ার সব কিছু। সেদিন হাসিমুখে সকলের বেদনার ভার স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নেবেন পোপটভাই। সেই পোড়-খাওয়া পোপট-লালের ছায়ায় তখন লোকে এসে আশ্রয় নেবে শান্তির আশায়। বহুর দুঃখ দূর করবেন ইনি, অনেকের ভার বইবেন নিজের কাঁধে। সার্থক শুভঙ্কর হবে মাতৃদর্শন পোপটভাই-এর।

ক্রমে সামনের দিকচক্রবাল আরও স্পষ্ট হয়ে উঠতে লাগল। সেখানকার আকাশচুম্বী নৈবেদ্যগুলির ধূসর রং গাঢ় হতে হতে মাটির রং হয়ে ধরা দিল চোখে। এতদিন পরে সত্যই এবার খাঁটি মাটি দেখতে পেলাম। পায়ের তলায় বালু কমতে কমতে রুক্ষ কঠিন মৃত্তিকায় পরিণত হল। এখানে ওখানে নজরে পড়তে লাগল সবুজের আভা। আরও কমে এল মাটির কর্কশতা। শেষে আমরা চলতে লাগলাম নরম মাটির উপর দিয়ে। মাটির ছোঁয়ায় শরীর মন

জুড়িয়ে গেল। দু-পাশে কচি কচি পাতা বেরুনো কাঁটার ঝোঁপ দেখে উর্বশী আর তার মা চঞ্চল হয়ে উঠল। পায়ের তলায় কাঁটার অনুভব করে অনেকদিন পরে আবার সর্বশরীরে সিরসির করে উঠল। মাঝে মাঝে দেখা গেল ছোট ছোট খানা ডোবা গর্ত। সেই সব গর্তের তলায় জল দেখে অনেকে তো আঁজলা করে মাথায় মুখে দিতে গেল। তাতে ঘটল আর এক বিভ্রাট। জলে গন্ধকের গন্ধ—এমনই বিটকেল গন্ধ যে কুঁজোর জর খরচ করে মুখ হাত ধুয়ে ফেলেও সে গন্ধ গেল না। কাজেই সে জলের লোভ সংবরণ করে আমরা এগিয়ে চললাম সামনে। শেষে যখন সেদিনের শেষ আদেশ শোনা গেল গুলমহম্মদের কাছ থেকে, তখন চন্দ্রকূপের বিপরীত দিক থেকে সূর্যদেব আস্তে আস্তে নেমে যাচ্ছেন—আর আমাদের সামনে সেই নৈবেদ্যগুলির ওপর কারা যেন রাশি রাশি আবীর ঢেলে দিচ্ছে। তীর্থযাত্রীদল ঘুরে দাঁড়িয়ে অস্তাচলগামী বিভাবসুকে জোড়হাতে প্রণাম করলে অনেক দিন পরে।

অনেক দিন পরে। অনেকদিন বটে। মানে আজকের এই রাতটি হচ্ছে একাদশী রাত, আজ থেকে ঠিক দশ রাত্রির আগের যে রাত সেই রাতে আমরা এই মানুষ কজন হাব নদীর ধারে এসে যখন বসলাম তখন আমাদের বুকের মধ্যে সে কি প্রবল উত্তেজনা, রক্তের তালে তালে সে কি বিচিত্র ঝঙ্কার! তখন আমরা একে অপরকে চিনতামও না। তবু কেউ কাউকে পর বলে ভাবতে পারিনি। সেই রাতে ত্রিশজন মানুষের এক চিন্তা এক সঙ্কল্প এক মন এক প্রাণ। ত্রিশ জনে সেদিন এক হয়ে গিয়েছি। একজন কিছু বললে অপরের কানে তা মধু বর্ষণ করেছে। কখন রাতটা পোহাবে, কখন নদী পার হব আর প্রকৃত যাত্রা আরম্ভ হবে, সেই উৎকণ্ঠায় সে রাতে আমরা কেউ চোখের পাতা এক করিনি। তখন দেহ মন প্রাণ সব কিছু হালকা শোলার মতো মনে হচ্ছিল। নদীটা একবার পার হতে পারলেই হয়, একেবারে পাখির মতো উড়ে গিয়ে পৌঁছব হিংলাজ। পথের দুঃখকষ্টের কথা সেদিনও বেশ ভালো করে জানা ছিল। রক্ত মাংস অস্থি মজ্জা দিয়ে যেটুকু সাক্ষাৎপরিচয় ঘটেছে এই দশ দিনে পথের সঙ্গে, তার চেয়ে শতগুণে ভয়াবহ ছিল এই পথ তখন আমাদের মনে। তবুও সেই রাতে কারও মন টলেনি, পা কাঁপেনি, চোখের পাতা ভিজে ওঠেনি। অদেখাকে দেখার, না-জানাকে জানার দুর্নিবার আকর্ষণে তখন আমাদের বদ্ধ মাতালের মতো অবস্থা। বাঁধন ছেঁড়ার জন্যে দেহের মধ্যে রক্ত টগবগ করে ফুটছে তখন আমাদের।

সেই রাত যথাসময়ে প্রভাত হল, হাব নদী পেরিয়ে এপারে এসে 'বাঁধন ছেঁড়ার সাধন' সমাধা করে আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। কিন্তু তারপর?

তারপর জুড়োতে জুড়োতে জুড়িয়ে একেবারে হিম হয়ে গেল দেহের রক্ত, তার সঙ্গে উচ্ছ্বাস উদ্দীপনা। উঁহু-ঠিক হল না-বলা উচিত, শরীর মন প্রাণ সমস্ত শুকিয়ে গেল-একেবারে রসকষশূন্য ছিবড়ে হয়ে গেল শুকিয়ে। কোথায় গেল সেই অদম্য উৎসাহ আর কোথায়ই বা গেল সে তড়পানো! এখন পা চলে না, ঘাড় আর সোজা হয় না, গলা দিয়ে আওয়াজও বার হয় না ভালো করে। এখন আমরা একে অপরের মুখদর্শন না করতে পারলেই বাঁচি। কারও কথা কানে ঢুকলে সর্বশরীরে যেন বিষ ছড়িয়ে দেয় ৷

ওই তো সামনেই চন্দ্রকূপ। জাগ্রত অবস্থায় এই কদিন ওই চন্দ্রকূপের কল্পনা করেছি মনে মনে, ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছি এই চন্দ্রকূপের। এই চন্দ্রকূপের কিনারায় এসে দাঁড়িয়ে এখন আর চোখ তুলে ভালো করে চেয়ে দেখবার সামর্থ্যও নেই কারও দেহে—গরজও নেই মনে। সর্বস্ব খোয়া গেলে লোকে কিছুক্ষণের জন্যেও নিরাসক্ত নিস্পৃহ হয়ে ওঠে। সেই রকমের একটা তুরীয় অবস্থায় পৌঁছেছি আমরা তখন। এগারো দিনের ধকলে পুণ্যার্জনের, উদ্ধার পাবার, পাপক্ষয়ের দুরন্ত বাসনাও ঝিমিয়ে এসেছে। কোনো কিছুর জন্যেই আর ছিটেফোঁটা আঁকুপাঁকু নেই মনে দেহে কোথাও ৷ এসেই পড়েছি-কাল সকাল হোক, তখন কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে দর্শন-স্পর্শনটা সারলেই চলবে। অতএব এখন লুটিয়ে পড়া যাক ধরিত্রীর বুকে।

দুনিয়ার জ্বালা-যন্ত্রণার হাত থেকে মুক্তি পাবার স্পর্শমণি এই মহাতীর্থগুলি সকলের ধরা ছোঁয়া-নাগালের বাইরে এই রকমের উৎকট পথের শেষপ্রান্তে নির্দেশ করা হয়েছে কি

কারণে, তার একটা সহজ সরল অর্থ খুঁজে পেলাম। ঝাঁ করে মেলগাড়িতে চেপে রাতারাতি কাশী পৌঁছে বিশ্বনাথের মাথায় ফুল-বেলপাতা চাপিয়ে তার পরদিনই আবার বাড়ি ফিরে আপিস করলে কাশী বিশ্বনাথ-দর্শনের ফল কতটুকু পাওয়া যায় তা মা অন্নপূর্ণাই জানেন। কিন্তু পুণ্যকামীর পুণ্যার্জনের ক্ষুধাটা যে তাতে ষোল আনা মেটে না এটুকু জোর দিয়েই বলা যায়। আর-পুরানো তেঁতুল ইসবগুল পর্যন্ত পুটুলি বেঁধে পিঠে ফেলে দু-মাস ধরে পাহাড় পর্বত ভেঙে সর্বশরীরে ঘা করে খোঁড়াতে খোঁড়াতে কেদারবদরী থেকে ফিরে এলে তৃপ্তিতে বুকখানা দশ হাত ফুলে ওঠে। তাই বোধ হয় কেদারনাথের মহিমা বিশ্বনাথের চেয়ে অনেক উঁচুতে পৌঁছেছে। আসল কথা, তীর্থপথের কষ্টটুকু হচ্ছে 'তপঃ'। তপস্যা দ্বারা ব্রহ্মদর্শন হয়, তাই বলা হয়েছে 'তপোহি ব্রহ্ম'। মেলে চেপে তীর্থদর্শন করে ফিরে এলে তীর্থদর্শনও হয়, গায়েও আঁচড় লাগে না, তবে 'তপ'টুকু বাকি থেকে যায়।

তীর্থপথ এমন হওয়া চাই যা পার হয়ে তীর্থে পৌঁছতে মন বুদ্ধি অহঙ্কার-তার সঙ্গে ইন্দ্রিয়গুলি পর্যন্ত-পুড়ে পুড়ে খাঁটি সোনা হয়ে যায়। অন্য কোনো কামনা-বাসনা তো দূরের কথা, খাস যে উদ্দেশ্য নিয়ে তীর্থযাত্রা সেই পুণ্যকামনারও ছিটেফোঁটা যেন না থাকে তীর্থে পৌঁছে। সৎ হোক অসৎ হোক যে কোনো জাতের বাসনা-কামনা বুকে থাকলে ঈশ্বরকেও দেখা যাবে রঙিন কাঁচের ভিতর দিয়ে। ওই রঙিন কাঁচ ভেঙে ফেলে সব কিছু সাদা স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখতে পাওয়ার শক্তিলাভ করার জন্যেই এই সব তীর্থদর্শন সাধন-ভজন ধ্যান-ধারণা দুরূহ তপস্যা।

সবাই বসে পড়েছে গোল হয়ে। অন্য সব দিনের মতো 'কোথায় জল, কোথায় কাঠ, দাও এখনই বড় কলকের মাথায় আগুন চাপিয়ে, এই সব ডাকহাঁকও উঠল না। ভোর থেকে সন্ধে পর্যন্ত সামনে চলে এসেও কারও ক্ষুধা-পিপাসার গরজ নেই। কেউ কারও সঙ্গে আলাপ করছে না। যেন কেউ কাউকে চেনে না। এমনকি আমাদের সুখলালও একপাশে আলাদা হয়ে বসে পড়েছে। অন্যদিন যাত্রাবিরতির সঙ্গে সঙ্গে যে হয়ে ওঠে একজন কর্মবীর। জল আনো, আগুন জ্বালাও, চা চড়াও—এই সব হাঁকডাকে একেবারে অস্থির করে তোলে সবাইকে। সুখলালও চুপটি করে বসে থাকে একদৃষ্টে চেয়ে আছে চন্দ্রকূপের দিকে। সবাই আমরা নিশ্চল হয়ে বসে আছি সেই ছোট-বড় মেজ-সেজ পাহাড়গুলির দিকে চেয়ে। আশ্চর্য হয়ে দেখছি, সব চেয়ে বড়টি থেকে সব চেয়ে ছোটটি পর্যন্ত প্রত্যেকটির আকার একই ধরনের। ঠিক দুর্গাপূজার চালের নৈবেদ্য। নৈবেদ্যের চূড়ায় বসানো থাকে একটা বড় নারকেল নাড়ু বা ক্ষীরের সন্দেশ। সেইগুলি দিতে ভুল হয়ে গেছে এখানে। সেই জন্যেই এই বিরাট বিরাট মাটির নৈবেদ্যগুলিকে কেমন যেন ন্যাড়া ন্যাড়া দেখাচ্ছে। শুধু তাই নয়-আরও তাজ্জব কাণ্ড হচ্ছে এই যে, চ্যাপটা চূড়াগুলি থেকে সাদা ধোঁয়া উঠছে। জল ফুটলে যেমন ধোঁয়া ওঠে ঠিক তেমনি। সূর্য অস্ত যাবার পরেও পশ্চিম দিক থেকে যে স্বচ্ছ আলোটুকু এসে পড়েছে ওখানে তাতে সেই সাদা ধোঁয়া আরও স্পষ্ট হয়ে দেখা গেল।

একটু একটু করে আঁধার জমা হতে লাগল সেই চ্যাপটা-মাথা ধোঁয়া-বেরুনো মাটির নৈবেদ্যগুলির পায়ের তলায়। ওইদিকে একভাবে চেয়ে থাকতে একটা অদ্ভুত চিন্তা একেবারে পেয়ে বসল আমাকে। চোখের দৃষ্টি আড়াল করে ওই যে বিচিত্র ছবি আঁকা পর্দাখানি ঝুলছে, ওর পিছনে নিশ্চয়ই তোড়জোড় চলছে এক বিরাট নাটক অভিনয়ের। ওই যবনিকাখানি হঠাৎ উঠে যাবে চোখের উপর থেকে। তখন উজ্জ্বল আলোতে চোখ ধাঁধিয়ে যাবে-আর স্পষ্ট দেখতে পাব ওই যবনিকার অন্তরালে কি রহস্য লুকিয়ে রয়েছে। সেই প্রতীক্ষায় রুদ্ধ নিশ্বাসে একদৃষ্টে চেয়ে রইলাম সেই দিকে। শেষে নিবিড় আঁধারের মাঝে একেবারে তলিয়ে গেল সব কিছু। লেপে মুছে একাকার হয়ে গেল সেই পর্দার গায়ে আঁকা ছবিখানি, শুধু দেখা যেতে লাগল অনন্ত আকাশ আর আকাশের গায়ে ফুটে ওঠা অসংখ্য জ্বলজ্বলে ছোট ছোট রূপালী ফুলগুলি। তখনও মিথ্যে আশায় নিস্তব্ধ হয়ে বসে আছি ওইদিকে একদৃষ্টে চেয়ে। নিশ্চয়ই একটা কিছু ঘটবে ওখানে। হঠাৎ ওই আঁধার যবনিকাখানি অদৃশ্য হয়ে যাবে চোখের উপর থেকে, আর চোখ-ধাঁধানো আলোয় আরম্ভ হবে এক নাটক, যে নাটক দেখে ইহজন্ম পরজন্ম

কর্মফল পুরুষকার-এই সমস্ত চিরন্তন দ্বন্ধ-সমস্যার একেবারে চরম সমাধান পেয়ে যাব। আগে কি ছিলাম, এখন কি হয়েছি আর আগামীতে কি হব-এইসব বিশ্রী বিদঘুঁটে জিজ্ঞাসার শেষ উত্তর মিলে যাবে সেই নাটক দেখে।

“ওই যে দেখছেন ডানধারে সব চেয়ে উঁচু পাহাড়–ওই পাহাড়টাই হচ্ছে চন্দ্রকূপ।” আচমকা কানে এল কথাটি। সঙ্গে সঙ্গে সর্বেন্দ্রিয় সজাগ হয়ে উঠল।

“ওই পাহাড়ের উপরেই কাল সকালে আমাদের উঠতে হবে।”

আমাদের পাণ্ডা রূপলাল কথা বলছেন। কিন্তু কোথায় যে তিনি বসে আছেন তা ঠাহর করতে পারলাম না।

“ওখানে উঠে কাল আমার কবুল করতে হবে যদি আমাদের মধ্যে কেউ এই দুটি মহাপাতক করে থাকেন জীবনে : একটি হচ্ছে-নারীহত্যা, অপরটির নাম-ভ্রূণহত্যা। আমাদের মধ্যে যদি কেউ ওই দুটি মহাপাতকের একটিও করে থাকেন আর তা কবুল না করেন চন্দ্রকূপ স্বামীর দরবারে, তাহলে চন্দ্রকূপ বাবার হুকুম মিলবে না আর এগোবার। তাহলে তাঁকে এখানেই আমাদের ত্যাগ করতে হবে। মাতা হিংলাজের গুহায় প্রবেশ করার তাঁর অধিকার নেই।“

ধীর অচঞ্চল কণ্ঠে রূপলাল বলে যেতে লাগল।

“আপনারা সকলেই চাক্ষুস প্রমাণ পাবেন চন্দ্রকূপ বাবার হুকুমের। ওই পাহাড়ের মাথায় উঠে দেখতে পাবেন, ওখানে ওঁর সমস্ত মাথাটা জুড়ে রয়েছে একটা মস্ত পুকুর। ওই যে দেখছেন সাদা ধোঁয়া উঠছে ওখান থেকে–ওই ধোঁয়া উঠছে সেই পুকুর থেকেই। সে পুকুরে জল নেই, জলের বদলে আছে থকথকে নরম কাদা। সেই কাদা ফুটছে অনবরত, বড় বড় বুজকুড়ি উঠছে সেই কাদার পুকুরে। দেখলে মনে হবে, যেন ওই পাহাড়ের ভিতর আগুন জ্বলছে আর সেইজন্যেই ফুটছে ওই নরম কাদা। মা ধরণীর ভিতর থেকে কত যুগ ধরে ওই নরম মাটি বেরুচ্ছে আর তা জমে জমে ওই অত উঁচু পাহাড়টা তৈরি হয়েছে। শুধু ওই পাহাড়টা নয়, এত বড় দুনিয়াখানা সৃষ্টি হয়েছে ওই কাদায়। ওখানে পৌঁছে দেখতে পাবেন এখনও সেই নরম কাদা ওই পাহাড়ের গা বেয়ে গড়িয়ে নামছে অনেক জায়গা দিয়ে। চন্দ্রকূপ দর্শনের পর আমি আপনাদের শোনাব এই চন্দ্রকূপের উপাখ্যান। কি করে এর সৃষ্টি হল আর কেনই বা চন্দ্রকূপ বাবা সকলের সর্বপাপ হরণ করেন, সে-সব কথা তখন শুনবেন। এখন শুনতে নেই, শুনলে বিপদ ঘটে।”

রূপলাল হঠাৎ নামল। যেন কে তার মুখ চেপে ধরলে। অন্ধকারে তার মুখ দেখা যাচ্ছে না। মনে হল যেন সে আরও কিছু বলতে ইতস্তত করছে। শেষে গলা নামিয়ে এক-রকম ফিসফিস করে সে তার বক্তব্যটুকু এইভাবে শেষ করলে।

“ওখানে সেই অত বড় পুকুরের সর্বত্র সব সময় বুদবুদ উঠছে, আবার মিলিয়ে যাচ্ছে। ছোট ছোট বুদবুদ হয়। দু মণ চাল-গম রাখা যায় এমন মাপের বড় ঝোড়া উল্টে রাখলে যত বড় দেখায় তার চেয়ে ঢের বড় বড় বুজকুড়ি উঠছে সেই কাদায়। আমি আবার বলছি, চন্দ্রকূপ স্বামীর হুকুমের চাক্ষুষ প্রমাণ পাবেন আপনারা সেখানে গিয়ে। যদি কেউ ওই দুটো পাপের একটি করে থাকেন আর তা চেঁচিয়ে কবুল না করেন এখানে দাঁড়িয়ে, তাহলে তৎক্ষণাৎ বুজকুড়ি ওঠা একেবারে বন্ধ হয়ে যাবে। যতক্ষণ না তিনি স্বীকার করছেন তাঁর পাপ, কিংবা যতক্ষণ না তাঁকে নামিয়ে দেওয়া হবে পাহাড় থেকে, ততক্ষণ কিছুতেই আর একটিও বুদবুদ উঠবে না। ওখানে দাঁড়িয়ে নিজের নাম, বাপ মা ঠাকুরদাদা এঁদের নাম বলে প্রত্যেককে চন্দ্রকূপ মহারাজের হুকুম প্রার্থনা করতে হবে হিংলাজ দর্শনে যাবার। সেই সময়ই কবুল করতে হবে নিজের পাপ। তা যদি কেউ না করেন, তবে কখনই বুদবুদ ওঠা না থাকে, তবে আর কোনো মুশকিলই নেই। বুদবুদ উঠতেই থাকবে। আমরা ওখান থেকে নেমে হিংলাজ মায়ীর গুহায় রওয়ানা হয়ে যাবে।

রূপলাল আবার থামল। চারিদিক থেকে নাকঝাড়ার ফোঁস ফোঁস শব্দ শোনা যেতে লাগল। বুড়ো গুলমহম্মদ কখন এসে দাঁড়িয়েছে আমার পেছনে।

বিড়বিড় করে সে তার নিজের ভাষায় কি সব মন্ত্র আওড়াচ্ছে। অন্ধকারে কেউ কারও মুখও দেখতে পাচ্ছি না। পোপটভাই-এর কথা মনে পড়ল। এ সময় তাঁর পাশে থাকা আমার একান্ত উচিত ছিল। অন্তত তাঁর হাতখানা চেপে ধরে তাঁর প্রাণে একটু শান্তি দিতে পারতাম।

কে একজন উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে বেশ চেঁচিয়ে সে বলতে লাগল। গলা শুনে বুঝলাম রূপলালই উঠে দাঁড়িয়ে কথা বলছে। ওখানে আমাদের কি কি সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে, ওখানে পৌঁছে কি ভাবে তীর্থকর্ম করতে হবে, এই সব সম্বন্ধে আমাদের ওয়াকিবহাল করছে সে এবার।

"আপনাদের প্রত্যেকের কাছে দুটি করে নারকেল আছে, তার একটি এইখানে পূজায় লাগবে। চন্দ্রকূপ বাবার পূজার জন্যে আপনার সঙ্গে যে ছোট কল্কেটি আর গাঁজা এনেছেন তাও সঙ্গে নিতে হবে পূজার জন্যে। ঐ সব পূজোর জিনিস সঙ্গে নিয়ে কাল ভোরে আমরা ওই পাহাড়ের উপর উঠব। উঠতে কষ্ট নেই কিছুই, তবে পা না হড়কায়। এক ঘণ্টা বা সওয়া ঘণ্টা লাগবে ওই পাহাড়ের মাথায় গিয়ে পৌঁছতে। সেখানে সেই কাদার পুকুরের ধারে দাঁড়িয়ে নিজের নাম বাপ-মায়ের নাম বলে চন্দ্রকূপ স্বামীর হুকুম চাইতে হবে। হুকুম মিললে তখন নারকেলটি, কল্কেটি আর গাঁজাটুকু ফেলে দিতে হবে চন্দ্রকূপে। বাবার হুকুম না পেয়ে যদি ওসব জিনিস ফেলা হয় বাবা পূজা গ্রহণ করেন না। মানে জিনিসগুলো কাদার উপর পড়ে থাকবে, কাদায় তলিয়ে যাবে না। আর বাবার হুকুম পেয়ে পূজো ফেললে বাবা সে পূজো তখনই গ্রহণ করবেন। সমস্তই আপনারা চাক্ষুষ দেখতে পাবেন। আজ সারারাত আমরা জেগে থাকব। আজ রাতে চন্দ্রকূপ স্বামীর 'লোট' বানানো হবে। সেই লোট নিয়ে যাওয়া হবে উপরে। তা-ই বাবার ভোগে নিবেদন করা হবে। ওখান থেকে নেমে এসে কাল আমরা সেই লোট প্রাসাদ খাব সকলে। ওইখানে চন্দ্রকূপের কিনারায় দাঁড়িয়ে আপানারা যা দান-দক্ষিণা করবার করবেন।"

এরপর রূপলাল জোড় হাত করে চন্দ্রকূপের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে বলতে লাগল, 'আমি রূপলাল ছড়িওয়ালা, আমার বাপের নাম ছগনলাল ছড়িওয়ালা, আমার ঠাকুদা ছিলেন ছেদীলাল ছড়িওয়ালা, যিনি সওয়া দু-শ বার হিংলাজ দর্শন করে গেছেন-আর আমার মায়ের নাম হচ্ছে বাসন্তী; আজ আমি আর আমার ছোট ভাই সুখলাল ছড়িওয়ালা এইখানে বাবার সামনে দাঁড়িয়ে বাবার কাছ থেকে হুকুম চাচ্ছি-দয়া করে বাবা আমাদের সকলকে হিংলাজ দর্শনের অনুমতি দিন। বহু যাত্রীকে নিয়ে বহুবার আমাদের বাবা-ঠাকুর্দা এই চন্দ্রকূপ স্বামীর দরবারে এসেছেন, আবার সকলকে হিংলাজ দর্শন করিয়ে ফিরিয়েও নিয়ে গেছেন। আমরা দু-ভাই তাঁদের বংশধর। আজ আমরা যাদের সঙ্গে করে এনেছি তাদের সব পাপ সব অপরাধ বাবা ক্ষমা করুন। আমরা যেন তাদের মঙ্গলমতো হিংলাজ-মাতা দর্শন করিয়ে-ফিরিয়ে নিয়ে যেতে পারি-জয় বাবা চন্দ্রকূপ মহারাজ কি- "জয়!"

বার বার তিনবার জয়ধ্বনি দেয়া হল। সকলের কণ্ঠে আবার আওয়াজ ফুটল। এতক্ষণে যেন সকলে প্রাণ ফিরে পেল।

সব কটা আলো জ্বেলে ফেলা হল। ছড়ি পুঁতে কল্কে সাজিয়ে ছড়ির ভোগসেবা চলতে লাগল ওধারে। কিন্তু সব কিছুই আজ একান্ত নিঃশব্দে। অন্যদিন এই সময় হৈ-হল্লা ইয়ারকি-ঠাট্টা হাসি-চিৎকার এই সমস্ত চলতে থাকে। আজ সে সব কিছুই হল না। নেহাত প্রয়োজনীয় কথা ছাড়া কেউ কথাই বলছে না। যদিও বা কিছু বলছে কেউ, তাও গলা খাটো করে। সাবধানে সসম্ভ্রমে চলাফেরা করছে সকলে। চন্দ্রকূপ স্বামীর বিশ্রামের না ব্যাঘাত ঘটে।

এখান থেকে অনেকদূরে ওই চন্দ্রকূপের ধারেই কোথায় জল উঠছে নিজ থেকে। দুটো আলো আর কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে গুলমহম্মদ চলল সেই জল আনতে। আমাদের দুটো কুঁজোর জল একটায় রেখে একটা কুঁজো তার হাতে পাঠালেন ভৈরবী। জল এল। দারুণ গন্ধকের গন্ধ জলে। সেই জলে গা হাত মুখ মাথা ধুয়ে মুছে ফেলা হল। সে রাতে রুটি পোড়াবার হাঙ্গামা নেই কারও। এক এক মুঠো বাদাম আর খেজুর খেয়ে সকলে জল খেলে। অনেকে তাও খেলে না। নিরম্বু উপবাস করে রাতটা কাটাবে তারা। কাল চন্দ্রকূপ দর্শন করার

পর তবে জল খাওয়া।

তবে সকলকেই সেই অন্ধকারে কুড়িয়ে আনতে হল এককাঁড়ি শুকনো ডালপালা। লোট পোড়ানো হবে, অর্থাৎ চন্দ্রকূপ বাবার ভোগ বানানো হবে।

একখানা নতুন কাপড়ের চার কোণ টেনে ধরে চারজন দাঁড়াল। সেই কাপড়ে প্রত্যেকে আধপো করে আটা আর যার যেমন সামর্থ্য চিনি ঘি ফেলে দিল। অনেকে কিছু কিছু কিশমিশ পেস্তা বাদামও দিলে। এ সমস্ত জিনিস সকলেই আলাদা করে সঙ্গে এনেছে চন্দ্রকূপ আর হিংলাজের ভোগের জন্য।

তখন রূপলাল আদুড় গায়ে জোড়হাত করে সেই চারজন লোক আর তাদের ধরা চাদরখানাকে তিনবার প্রদক্ষিণ করে নিলে। নিয়ে চন্দ্রকূপের দিকে মুখ করে দাঁড়িয়ে জল দিয়ে সেই সমস্ত জিনিস ওই চাদরের উপরেই মেখে ফেললে। মাখা কর্মটি শূন্যে সমাধা হয়ে গেল। মাটির উপর রেখে মাখা নিষেধ। ততক্ষণে সেই ডালপালার কাঁড়িতে আগুন দেওয়া হয়েছে। এইবার সেই প্রকাণ্ড আটার ডেলাটা তুলে দেওয়া হল সেই আগুনের উপর। তার উপর আরও ডালপালা চাপিয়ে দেওয়া হল। সারারাত ধরে আগুন জ্বলবে, তারপর নিববে আর জুড়োবে। ততক্ষণে ভোর হয়ে যাবে। তখন আমরা এই লোট ওই চুলা থেকেই তুলে নিয়ে পাহাড়ে চড়া আরম্ভ করব। চন্দ্রকূপ বাবার লোট মাটিতে স্পর্শ করালেই উচ্ছিষ্ট হয়ে যায়। তাই এত কড়াক্কড়ি।

সেই আগুনের ধারেই কম্বল বিছিয়ে আমরা সকলে শুয়ে বসে রইলাম।

চোখ বুজে শুয়ে ছিলাম। শুনতে পেলাম-"তাহলে কি বলব আমি চন্দ্রকূপে গিয়ে? মাথার কাছে বসে ফিসফিস করে বলছেন ভৈরবী। দারুণ দুশ্চিন্তায় তাঁর গলা ভেঙে পড়ল।

সজোরে এক ধাক্কা দিলে আমার মাথার মধ্যে তাঁর কথাটি। "তার মানে?"

একটু চুপ করে থেকে ভৈরবী বললেন-"মানে, ওই পাপ সম্বন্ধে—" আর কোন কথা বেরুল না তাঁর মুখ দিয়ে।

ধড়মড়িয়ে উঠে বসলাম —"কি বললে! পাপ! তা তোমার কি?" আমারও আর একটি কথা বেরুল না মুখ দিয়ে। উত্তেজনায় উৎকণ্ঠায় গলার ভিতরটা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

কোনো রকমে তিনি উচ্চারণ করলেন, "সেই কথাই তো বলছি-আমি যে একবার-" এবার তিনি সত্যই কেঁদে ফেললেন।

শরীরের সমস্ত রক্ত চনচন করে মাথায় উঠে গেল। আগুন বেরুতে লাগল আমার দু চোখ দিয়ে। দম বন্ধ করে চেয়ে রইলাম একদৃষ্টে পার্শ্ববর্তিনীর অন্ধকার মূর্তির দিকে।

একটু সামলে আবার আরম্ভ করলেন তিনি ভাঙা গলায়-"কিন্তু আমার কোনো দোষ ছিল না। সে যে মারা যাবে তা আমি ভাবতেও পারিনি।"

এতক্ষণে দম ছাড়লাম। সর্বরক্ষে হোক। তা হলে অন্য কিছু নয়। কবে কোথায় হত্যা করে ফেলেছেন কাকে। কিন্তু এত বড় ব্যাপরটা ঘটল কোথায়?

ভাঙা গলায় আস্তে আস্তে বলেই চলেছেন ভৈরবী —"রোজই তাকে স্নান করাতাম। রোজ স্নান করালে যে মরে যাবে এ কথা তো তখন কেউ আমায় বলে দেয়নি। শেষে যখন সে ম'লো তখন ঠাকুমা খুব বকলেন। বললেন, স্ত্রী হত্যা করলি তো-তোর আর উদ্ধার হবে না কোনও কালে।"

এই পর্যন্ত বলে একটা গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেললেন তিনি।

আর ধৈর্য রাখতে পারলাম না। একটা চাপা ধমক দিলাম-"বলোই না ছাই সে? কবে আবার কাকে হত্যা-টত্যা করে মরতে গেলে তুমি—"

প্রায় কাঁদতে কাঁদতেই তিনি জবাব দিলেন-"তার নাম রেখেছিলাম লক্ষ্মী। এই এত বড় বড় লোম, লালে সাদায় মেশানো রঙ। আমাদের বাড়ির পাশের বাড়ির খাঁদু পিসি তার শ্বশুরবাড়ি থেকে তাকে এনে দিয়েছিল। মাদী বেড়াল, খুব সুলক্ষণা। আমার কপালে টিকবে কেন। আদর যত্ন সেবার তো ত্রুটি করিনি কোনো দিন। রোজ স্নান করিয়েছি, পাউডার মাখিয়ে, চিরুনি দিয়ে তার গায়ের চুল আঁচড়ে দিয়েছি। তবু সে মরে গেল আর আমাকে স্ত্রী

হত্যার ভাগী করে রেখে গেল।" তিনি ফোঁপাতে লাগলেন।

তাঁর দিকে চেয়ে চুপ করে বসে রইলাম। মনে পড়ে গেল আজ ভোরেই ইনি আমাকে শেষ সম্বোধন করেছিলেন-"ভীমরতি হয়েছে!" কারণ মরবার জন্যে একলা একটা অজ্ঞান পাগলকে সেখানে আমি ফেলে আসতে চাচ্ছিলাম না। সারাটা দিন পরে অর্ধেক রাতে সেই "ভীমরতি হওয়া" আমার সঙ্গে এই প্রথম আলাপ করতে এসেছেন। কি ব্যাপার-না কবে কোথায় একটি মাদী বেড়াল মেরে ইনি স্ত্রী হত্যার পাপ করে ফেলেছেন!

আদিখ্যেতা নেকাপনা ইত্যাদি চোখা চোখা কথাগুলো জিবের ডগায় এসে গিয়েছিল। অনর্থক আর সে-সব ব্যবহার করলাম না। এই মানুষটিকে যাঁরা জানেন তাঁরা জীবজন্তুর ব্যাপার নিয়ে এঁর সঙ্গে তর্কাতর্কি করতে যাবেন না কিছুতেই। কুকুর বেড়াল পশু পাখি-এরা যে ষোল আনা মানুষের খাতির পাবার যোগ্য নয়, এ কথা এঁকে বোঝাতে গেলে লাঠালাঠি করা ভিন্ন উপায় নেই। চন্দ্রকূপের পাশে বসে এই রাতে খেয়োখেয়ি করে লাভ কি? আবার চাদর মুড়ি দিয়ে চুপচাপ শুয়ে পড়লাম।

বোধ হয় ঘুমিয়েই পড়েছিলাম। কান্নার শব্দ শুনে ঘুম ভেঙে গেল। চাদর মুড়ি দিয়েই শুনতে লাগলাম।

"না না না-যাব না আমি ওই পাহাড়ের উপরে। একলা আমি ওখানে কিছুতেই যাব না। বড় আশা করেছিলাম আমি একবার তাকে নিয়ে চন্দ্রকূপ বাবার স্থানে পৌঁছতে পারলেই তার মাথার গোলমাল সেরে যাবে, সে আবার মানুষ হয়ে উঠবে। তার হাত ধরে সারাজীবন আমি পথে পথে ঘুরে বেড়াব। লোকের দরজায় দরজায় ভিক্ষা মেগে খাব। সে ভিন্ন আর কেউই আমাকে ছোঁবে না। যতক্ষণ তার হুঁশ ছিল সে আমায় ছেড়ে পালায়নি। আমাকে বাঁচাবার জন্যে সে নিজের প্রাণ পর্যন্ত দিতে গিয়েছিল আর আজ তাকে যমের মুখে ফেলে রেখে নিজের প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এসেছি আমি! এখন তার হুঁশ নেই, এখন সে একটা ছোট বাচ্চার মতো, মুখে তুলে না দিলে এখন সে এক ফোঁটা জলও খাবে না। এই অবস্থায় তাকে আমি এই নির্জলা মুল্লুকে শুকিয়ে মরবার জন্যে ছেড়ে দিয়ে পালাচ্ছি। মরবার সময়ও তার মুখে এক ফোঁটা জল পড়বে না। আমার জন্যেই আজ সে পাগল হয়ে গেছে আর আমিই তাকে একলা শুকিয়ে মরবার জন্যে ফেলে রেখে নিজের প্রাণ নিয়ে পালিয়ে এলাম গুমরে গুমরে কাঁদতে লাগল কুন্তী।

একেবারে নিচুস্বরে তাকে কি বললেন ভৈরবী। কথাগুলো শুনতে পেলাম না—মিনতি ঝরে পড়ছে তাঁর গলা দিয়ে।

আবার কুন্তীর গলাই শুনতে পেলাম।

"না না না-সে আর আসবে না। আমাকে খুঁজে ছুটে বেড়াতে বেড়াতে জলতেষ্টায় সে এতক্ষণে মরে কাঠ হয়ে গেছে। হয়তো তার দেহটা নিয়ে এখন নেকড়েরা ছেঁড়াছেঁড়ি লাগিয়েছে। কেউ তাকে ধরতে পারবে না, কারও কাছে সে জলের জন্যে যাবে না। উঃ, কেন আমি তাকে সেখানে ছেড়ে রেখে এলাম, কেন আমি রইলাম না সেখানে, তাহলে সে ঠিক আমার কাছে এসে ধরা দিত।"

অকস্মাৎ গুলমহম্মদ হাঁক দিয়ে উঠল। নিমেষের মধ্যে আকাশ বাতাস ভরে গেল বহু কণ্ঠের

তুমুল গর্জনে। লাফ দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। দলসুদ্ধ সবাই উঠে দাঁড়িয়েছে, এমনকি উট দুটি পর্যন্ত। প্রত্যেক হাতের লাঠি শূন্যে তুলে বিকট চিৎকার করছে। কিন্তু কেউ কি এক পাও এগুচ্ছে না। ওরা বাপ-বেটা দুজনে মাথার উপর টাঙি বাগিয়ে ধরে হাঁকার দিচ্ছে। সবাই-এর মুখ একদিকে। ওইদিক থেকেই যেন কোনও কিছু এগিয়ে আসছিল এদিকে। এই হই-চই লম্ফঝম্ফ তাকে ভয় দেখিয়ে দূর করে দেবার জন্যেই করা হচ্ছে।

অনেকক্ষণ ধরে সেই চিৎকার চলল। নিশ্চয়ই নেকড়ে। এ জায়গায় একপাল নেকড়ে থাকাও কিছুমাত্র আশ্চর্য নয়। আমার সামনে ঠিক ভৈরবী এক হাতে কুন্তীকে, অন্য হাতে সুখলালকে ধরে দাঁড়িয়ে আছেন।

তখনও হই-চই থামেনি। আমার কানের কাছে মুখ নিয়ে চুপি চুপি কে বললে, "স্বামীজি মহারাজ, কাকে তাড়ানো হল বুঝতে পারলেন?"

চেয়ে দেখি পোপটভাই। মাথায় পাগড়ি নেই, অন্ধকারে তাঁর মুখ ভালো করে দেখা গেল না। পোপটভাই চুপি চুপি বললেন-"ও নিশ্চয়ই আমাদের থিরুমল?"

"অ্যাঁ!" আঁতকে উঠলাম একেবারে।

পোপটভাই খপ করে আমার একটা হাত ধরে ভীষণ চাপ দিলেন।

"চুপ, মুখ বুজে থাকুন। এ সময় কোনো কথা বলে লাভ নেই। আমারও ভুল হতে পারে। এখানে ওই পাহাড়ের মধ্যে বাহেড়া আছে। হয়তো সেই বাহেড়া একটা আসছিল এধারে। গুলমহম্মদকে ডেকে জিজ্ঞাসা করুন কি দেখেছে সে।"

বাহেড়া!

'বাম' এই তার আর একটি নাম। বিশদ পরিচয় শুনে ধারণা হল বনমানুষ জাতীয় প্রাণী এরা। এইখানেই এই পাহাড়ের মধ্যে কোথাও আছে তাদের আস্তানা। তাদের স্বভাব হচ্ছে ঘুমন্ত মানুষ চুরি করা। রাতের অন্ধকারে সকলে ঘুমিয়ে পড়লে নিঃশব্দে তারা আসে, মানুষের মতো দু-পায়ে হেঁটে তারা চলাফেরা করে। ঘুমন্ত মানুষের কাছে এসে তার পায়ের কাছে মুখ রেখে শুয়ে পড়ে বাহেড়া। শুয়ে তাদের লম্বা লকলকে জিব দিয়ে মানুষের পায়ের তলায় চাটতে থাকে। যত চাটে লোকটির ঘুমও তত গাঢ় হয়। শেষ পর্যন্ত মানুষটি চৈতন্য হারায়, আর এ কর্মটি হয় বোধ হয় তাদের বিষাক্ত লালার স্পর্শে। আবার যখন তার জ্ঞান ফিরে আসে তখন সে দেখে যে পাহাড়ের মধ্যে এক গুহায় শুয়ে আছে, কিন্তু উঠে দাঁড়াবার ক্ষমতা নেই। তখন তার পায়ের তলায় দগদগে ঘা, ছাল-চামড়া সব উঠে গেছে।

বুঝলাম- বনে যেমন বনমানুষ, তুষারশৃঙ্গে তুষারমানব, তেমনি মরুর মাঝে রয়েছে মরুমানব।

কিন্তু কিসের জন্য মানুষ চুরি করে তারা? এ রকমের বিদঘুঁটে বদখেয়াল কেন তাদের? মানুষ তো গরু-ছাগল নয় যে দুধ দেবে বা লাঙল টানবে! মানুষ দিয়ে তারা করে কি? খায় নাকি?

তা কেউ বলতে পারে না। ওটা ওদের স্বভাব-গুলমহম্মদের ভাষায় 'খুশ খেয়াল'। তাদের বেটাছেলেরা চুরি করে মেয়েমানুষ পেলে, আর স্ত্রী-বহেড়া পুরুষমানুষ চুরির তালে থাকে। চুরি করে নিজেদের আস্তানায় নিয়ে গিয়ে ফেলে রাখে। মারধর বা অন্য কোন অত্যাচারই করে না। হুঁশ ফিরে এসেছে দেখলেই পা চাটতে থাকে, তখন লোকটি আবার ঘুমিয়ে পড়ে। এই ভাবে চাটতে চাটতে পায়ের গোছ পর্যন্ত তাদের জিবে জিবেই চলে যায়। এধারে কিছুই না খেতে পেয়ে লোকটা মারা পড়ে। মরে গেলেও অনেকদিন পর্যন্ত তারা যত্ন করে রাখে। শেষে যখন পা চাটলে আর তাদের জিভে রক্ত লাগে না, তখন তাকে বয়ে এনে বাইরে খোলা জায়গায় ফেলে রেখে যায়।

শেষবার কতদিন আগে হয়েছিল এই রকম মানুষচুরি? শেষবার কাকে চুরি করেছিল তারা?

হরদম আলাপ চালিয়ে যাবার ক্ষমতা নেই বুড়ো গুলমহম্মদের। সে তার পাগড়ি খুলে মাথার চুলের মধ্যে আঙুল দিয়ে কি খুঁজতে লাগল। তার হয়ে রূপলাল উত্তর দিলে–

"আমার বাবার কাছ থেকে সে গল্প আমরা শুনেছি। বাবা শুনেছিলেন ঠাকুরাদার কাছ থেকে। নরসিং ছড়িওয়ালা ছিলেন আমার ঠাকুরদার পিসতুতো ভাই। যেমন ছিল তার তাঁর সাহস তেমনি অসুরের মতো গায়ের জোরও ছিল তাঁর। একবার একটা উট করাচী শহরের রাস্তায় খেপে উঠে অনেক লোককে কামড়ে বেড়াচ্ছিল। নরসিং এক লাফে সেই খেপা উটটার উপর লাফিয়ে উঠে তার লম্বা গলা মুচড়ে একেবারে দফারফা করে দেন। এইজন্যে লোকে তাঁকে উটমারা বলে ডাকত।

"সেই নরসিং ছড়িওয়ালা একবার তাঁর এক বড়লোক যজমান আর তার বউকে নিয়ে হিংলাজ আসেন। সে সময় শোনবেণী শহর ছিল না, নাম-ধাম লিখিয়ে খাজনাও দিতে হত

না। এ মুল্লুক থেকে কোনো উটওয়ালাও তখন যাত্রী নিয়ে আসত না। যাত্রীরা আসত পায়ে হেঁটে, পথ দেখিয়ে আনত ছড়িওয়ালা। আর তাদের মালপত্রও আসত মানুষের পিঠে। ছড়িওয়ালাই মাল বয়ে আনবার লোকের ব্যবস্থা করত।

"নরসিং এখানে এসে পৌঁছলেন তাঁর যজমান আর তার বউকে নিয়ে। পরদিন চন্দ্রকূপ দর্শন করাবেন তাদের। রাত্রে সকলে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছেন। পরদিন সকালে আর বউটিকে পাওয়া গেল না। তখন নরসিং আর তাঁর যজমান প্রতিজ্ঞা করলেন যে, বউটিকে উদ্ধার করতেই হবে। সঙ্গের লোকজনদের রেখে ওঁরা দুজনে দুখানা খোলা কৃপাণ হাতে করে এই চন্দ্রকূপ এলাকার মধ্যে ঢুকলেন। বাহেড়াদের অনেকগুলোকে মেরে তাদের গুহা থেকে বউটিকে তুলে নিয়ে তিনদিন পরে তাঁরা বেরিয়ে এলেন ওই পাহাড়ের ভিতর থেকে। এখান থেকেই সেবার নরসিংকে করাচী ফিরতে হয়। বউটি তো আর হাঁটতে পারে না, কাজেই হিংলাজ যায় কি করে! সেই নরসিং বলেন বাহেড়াদের কেমন দেখতে। সুস্থ হয়ে বউটিও ওদের স্বভাব চরিত্রের ঘরসংসারের গল্প করে। কিন্তু তারপর থেকে তারা আর কাউকে চুরি করেছে কি না বলতে পারি না।"

দিলমহম্মদ স্বল্প কথায় জানাল যে, মানুষ চুরি তাদের এই মুল্লুকে হামেশাই হয়। বালুর উপর বাহেড়াদের অস্বাভাবিক লম্বা পায়ের ছাপ দেখে সবাই বুঝতে পারে কারা চুরি করল মানুষটিকে

আরও অনেক রকমের প্রশ্নই করবার ছিল। ভাবলাম দরকার কি! বাম, বাহেড়া যে নামেই হোক সেই মানুষচোরদের, তবুও যে তারা এই মানুষ গোরু পশু পাখি কীট পতঙ্গ, এক কথায় এই জগতের তাবৎ প্রাণীর দ্বারা বর্জিত এই ভয়ঙ্কর স্থানে বাস করছে আর বেঁচে আছে, এটাও তো কম কথা নয়। বেশি খোঁচাখুঁচি করে জানতে গেলে হয়তো সন্দেহ জাগবে মনে যে ওই রকমের কোনো প্রাণীর অস্তিত্বই নেই। তাতে কার কতটুকু লাভ হবে জানি না, তবে চন্দ্রকূপের যে বিশেষ ক্ষতি হবে তাতে আর সন্দেহ নেই। শান্তিতে থাকুক বেঁচে বাহেড়ারা দুনিয়ার এই শেষ প্রান্তে। তাদের নামে যে বিভীষিকা এই চন্দ্রকূপকে ঘিরে রয়েছে তার মূল্য কম নয়। ভয় আর ভক্তি এ দুটি হচ্ছে যমজ ভাইবোন। একটিকে হারালে অপরটির তেজও কমতে থাকে সঙ্গে সঙ্গে।

বাহেড়া-কাহিনী রাত শেষ করে আনলে। চন্দ্রকূপের ন্যায় চূড়ার উপর পিছন থেকে আলো এসে পড়ল। আকাশের গায়ে তখনও দু-একটা নক্ষত্র জ্বলজ্বল করে জ্বলছে।

আমরা প্রস্তুত হলাম।

আগে দুজনে চলে গেল রূপলালের সঙ্গে স্নান করে আসতে। ওরা লোট বয়ে নিয়ে যাবে।

তারা স্নান করে এলে আমরা সকলে যাত্রা করলাম। উট নিয়ে গুলমহম্মদরা চলল চন্দ্রকূপের উত্তর ধার দিয়ে ঘুরে। দর্শন করে নেমে গিয়ে আমরা ওদের সঙ্গে মিলব।

নারকেল গাঁজা কলকে ইত্যাদি পূজা-উপাচার সঙ্গে নিলে সবাই। কুঁজোও বাদ গেল না। পাহাড়ের তলায় কুঁজো রেখে উপরে চড়তে হবে। অনেকে এক টুকরো লাল সালু সঙ্গে নিলে। চন্দ্রকূপের মাটি বেঁধে আনবে ওই কাপড়ে।

দণ্ড খাটার ভক্ত দু-জন খাটতে খাটতে চলল। ভেবে পেলাম না ওই ভাবে ওই পিছল পাহাড়ের গা বেয়ে উঠবে কি করে ওরা।

কুন্তীর বাঁ হাতের কবজি মজবুত করে ধরে একরকম তাকে টানতে টানতেই নিয়ে চললেন ভৈরবী। শুকনো মুখ, কোটরে-বসা চোখ, রুক্ষ চুল, এই সব মিলে কুন্তীকে ভয়াবহ করে তুলেছে। তার চোখের দৃষ্টিও অস্বাভাবিক। নীচেকার ঠোঁট কামড়ে ধরে আছে। জ্বালাময়ী দৃষ্টিতে সে একভাবে চেয়ে আছে চন্দ্রকূপের দিকে।

আরম্ভ হল ছোট খাটো মাটির নৈবেদ্যগুলি। কোনে-কোনোটি আমাদের কোমর বা বুক পর্যন্ত উঁচু। সকলের মাথা চ্যাপটা, এক রকমের গড়ন, উপরটা শুকনো। মা ধরণীর অঙ্গ ফুটো হয়ে কিছুদিন ক্লেদ রক্ত নির্গত হয়েছিল, এখন বন্ধ হয়ে গেছে। ক্রমে আরও বড় বড়

অগুনতি সেই সব মাটির ঢিবির মধ্যে আমরা ঢুকতে লাগলাম। গাছপালা ঝোঁপঝাড় কিছু নেই। এ হচ্ছে মাটির ঢিবির জঙ্গল। এর মাঝে কেউ যদি হারায় তবে যুগ-যুগান্তর খুঁজেও তাকে বার করা যাবে না। ক্রমে উঁচুতে উঠতে লাগলাম আমরা। ঢিবিগুলিকে টপকে ডিঙিয়ে ঘুরে ঘুরে। শেষে পাওয়া গেল একটি ক্ষীণ জলধারা। সেটি এই ঢিবি-জঙ্গলের ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে আবার ঘুরে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেছে।

এখন একটি বাঁধ দিতে হবে।

কোদাল ঝোড়া কিছুই লাগল না, পঁচিশ-ত্রিশ জোড়া হাত আছে কি করতে! ডেলা ডেলা মাটি তুলে এনে ফেলা হল দুটো ঢিবির মাঝখানে। জলাধারাটির গতি রোধ হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘটি ডোববার মতো ব্যবস্থা হয়ে গেল।

তখন স্নান দান মন্ত্রপাঠ পিতৃপুরুষের তর্পন এই সব তীর্থকর্ম সমাপন করা গেল। পণ্ডিত রূপলাল মন্ত্রপাঠ করালেন, দক্ষিণা গ্রহণ করলেন। সর্ববিধ অনুষ্ঠান সাড়ম্বরে শেষ করে আমরা পাহাড়ে চড়া আরম্ভ করলাম। আর কিছুক্ষণ এ-ঢিবির ডান পাশ দিয়ে ও-ঢিবির বাঁ পাশ দিয়ে ঘুরে ঘুরে এগিয়ে মূল চন্দ্রকূপের অঙ্গ স্পর্শ করা গেল। প্রত্যেকে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করলে। নিজে নিজের নাক-কান মললে। এইবার আরোহণের পালা।

প্রথমে কিছুক্ষণ কোনও কষ্টই হল না। এখানে-ওখানে পা রেখে লাফিয়ে লাফিয়ে বেশ খানিকটা ওঠা গেল, তারপর অবস্থা সাংঘাতিক হয়ে দাঁড়াল। ক্রমশ ঢালু মসৃণ চন্দ্রকূপের অঙ্গ বেয়ে ওঠা অত সহজ ব্যাপার নয়। দু'জোড়া হাত-পায়ের সাহায্য নিতে হল। বলা যায় দলসুদ্ধ সবাই একরকম দণ্ড খাটতে খাটতেই উঠতে লাগলাম। হাত-পা আটকাবার মতো খাঁজ খাঁজ যেখানে একটু পাওয়া গেল সেখানে একটু থেমে দম নিয়ে আবার চার হাত পায়ে আরোহণ। তবে বেশি সময় লাগল না। এক ঘণ্টার মধ্যে আমরা যথাস্থানে গিয়ে পৌঁছলাম।

সেখানেও দাঁড়াবার উপায় নেই। প্রচণ্ড ঝড় বইছে, দাঁড়ালে উল্টে নীচে গড়িয়ে পড়তে হবে চন্দ্রকূপের গা বেয়ে। সেই কাদায় কূপের কিনারায় আমরা পাশাপাশি মাটি আঁকড়ে বসে পড়লাম।

এবং এতক্ষণে চোখ মেলে ভালো করে দেখবার ফুরসত পেলাম।

যা দেখলাম তা রূপলালের বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে গেল। এ-পাড় থেকে ও পাড়-মাঝখানের মাপ একশ' হাতের কম নয়-সুডৌল গোল একটি কালো থকথকে কাদার পুকুর। বহু জায়গায় পাড়ের উপর দিয়ে উপচে সেই কাদা গড়িয়ে নামছে নীচে। আর হাঁ-মস্ত মস্ত ধামার মতো বুদবুদদ হরদম উঠছে সেই কাদায়, সঙ্গে সঙ্গে সাদা বাষ্পও। জীবন্ত, একেবারে ষোল আনা প্রাণময় এই চন্দ্রকূপ।

সেইদিকে চেয়ে থাকতে থাকতে বার বার সর্বশরীর শিউরে উঠল।

পিছনে ফিরে তাকিয়ে দেখলাম, যতদূর দৃষ্টি যায়- হাজার হাজার চন্দ্রকূপের বংশধরেরা স্থির নিশ্চল হয়ে ধ্যান করছে। বাঁ দিকেও তাই। ডান দিকে বিছানো রয়েছে একখানি ধূসর রঙের চাদর, একেবারে সেই আকাশের সীমা পর্যন্ত। আর ওই–ওই চলেছে দুটি উট আর দুটি মানুষ। ওরা চন্দ্রকূপ ঘুরে আমাদের সামনে অদৃশ্য হয়ে গেল।

এইবার চেয়ে দেখলাম আশেপাশে কে কি করছে। কিছুই করছে না কেউ। সবাইকার চোখ প্রায় কপালে উঠেছে। দু-হাতে মাটি আঁকড়ে ধরে সবাই চেয়ে রয়েছে সেই মাটির বুদবুদগুলির দিকে। সেগুলি অনবরত উঠছে আবার তৎক্ষণাৎ ভেঙে মিলিয়ে যাচ্ছে। আমাদের সামনে দু হাত দূরেই কাদার আরম্ভ। আমাদের পায়ের তলার মাটিও বেশ নরম। যদি দৈবাৎ কেউ ওই কাদার মধ্যে পড়ে তবে-। তবে কি হবে তা ভাবতে গিয়ে সভয়ে চোখ বন্ধ করতে হল।

আমার ডান পাশের পাঁচ-ছ জনের ওধারে বসেছেন ভৈরবী। তখনও তিনি এক হাতে কুন্তীর একখানা হাত ধরে রয়েছেন। কুন্তী বসেছে তাঁর পিছনে। ভৈরবীর এদিকে বসেছে মণিরাম আর ওদিকে কে বসেছে তার মুখ দেখতে পেলাম না। ওইদিকেই সকলের শেষে বসেছে রূপলাল। তার সামনে সেই নতুন চাদরখানা পেতে তার উপর লোট রাখা হয়েছে।

লোটের পাশে পোঁতা হয়েছে হিংলাজের ছড়ি। সেই ঝড়ে বহু কষ্টে একগোছা ধূপকাঠি জ্বালিয়ে মাটিতে পুঁতলে রূপলাল। এইবার সে তার ঝোলা থেকে আরও সব কি কি জিনিস বার করতে লাগল।

সকলের থেকে দূরে আলাদা হয়ে পোপটলাল প্যাটেল বসেছেন। তাঁর স্তিমিত চোখ দিয়ে গণ্ড বেয়ে অশ্রু গড়িয়ে নেমেছে, ঠোঁট দু'খানি নড়ছে। এইবার চরম বোঝাপড়া করছেন তিনি চন্দ্রকূপ স্বামীর সঙ্গে।

আমার ঠিক পিছনেই আমার দুই কাঁধ ধরে দাঁড়িয়ে আছে সুখলাল। ধরে না থাকলে হাওয়ার চোটে উড়েই যাবে অতটুকু ছেলে।

ওধারে মন্ত্রপাঠ শুরু হল, যার একবর্ণও কারও কানে ঢুকল না। হাওয়ায় উড়িয়ে নিয়ে গেল পণ্ডিত রূপলালের মন্ত্র আর তার গলার স্বর-উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে খাস চন্দ্রকূপনাথের কর্ণেই পৌঁছে দিল বোধ হয়।

মন্ত্র পড়তে পড়তে রূপলাল এক এক চাপড়া ভেঙে নিতে লাগল সেই মস্ত বড় পোড়া আটার ডেলাটার গা থেকে আর ছুঁড়ে ছুঁড়ে ফেলতে লাগল চন্দ্রকূপে। সভয়ে দেখলাম ধীরে ধীরে তলিয়ে গেল কাদার মধ্যে সেই চাপড়াগুলো। শেষে একটি নারকেলও ফেললে রূপলাল। সেটিরও ওই গতি হল। তারপর এক একটা করে দশ বারোটা কলকেতে গাঁজা ভরে আগুন দিয়ে ছুঁড়লে রূপলাল সেই কাদার মধ্যে। সেগুলিও সব আস্তে আস্তে তলিয়ে গেল। কি জ্যান্ত দেবতা রে বাবা, সব কিছুই চোখের উপর গ্রাস করলে!

পাণ্ডার নিজের পূজা শেষ হলে পর, এল আমাদের যাত্রীদের পূজার পালা। প্রথমেই দণ্ড খাটা দু'জনের হাত ধরে খাড়া করলে রূপলাল। তারা একে একে উচ্চৈঃস্বরে নাম বাপের নাম ইত্যাদি ঘোষণা করে আরও কত কি বলে গেল যার বিন্দুবিসর্গও কারও কানে ঢুকল না হাওয়ার জন্যে। তারপর নারকেল কলকে গাঁজা সব ছুঁড়ে ছুঁড়ে অর্পণ করলে দেবতাকে। দু-হাত সামনে থেকে কাদা তুলে নিয়ে বেশ করে তাদের কপালময় লেপে দিল রূপলাল। তখন ওরা দক্ষিণা দিয়ে পাণ্ডার পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলে। রূপলাল তাদের পিঠ চাপড়ে দিলে। শেষে ওরা নিজেদের হাতে এক এক থাবা কাদা তুলে নিয়ে ওপাশে গিয়ে বসল।

এইভাবে একের পর এক নাম ডাকতে লাগল রূপলাল আর এক একজনে উঠে গিয়ে যথাকর্তব্য করে আসতে লাগল। গড়গড় করে বেশ চলতে লাগল পূজা দেওয়া। কোনো বাধা-বিঘ্ন ঘটল না। ওধারে ধোঁয়াও উঠছে আর বুজকুড়িও কাটছে সমানে চন্দ্রকূপময়। সেই দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে অন্যমনস্ক হয়ে ভাবছিলাম-আমার নাম ডাকা হলে কি কি বলব গিয়ে দাঁড়িয়ে। এ পর্যন্ত কত রকমের কত পাপই যে করেছি, তার তো ঠিক ঠিকানা নেই। ভাগ্যে সব গুলি পাপের ফিরিস্তি এখানে দিতে হবে না, তা হলে আমারগুলো আওড়াতে আওড়াতেই সন্ধে হয়ে যেত। ভৈরবীর কথা মনে হল-বেচারি ওখানে দাঁড়িয়ে ঠিক ওর লক্ষ্মীহত্যার পাপই কবুল করবে। আর কুন্তী? কুন্তী বলবে কি? করবে নাকি কবুল যে থিরুমলের মৃত্যুর জন্যে ও-ই দায়ী? কুন্তীর জন্যে একটা নারকেলও সঙ্গে এনেছে ভৈরবী। তার কলকে গাঁজার জন্যে নাকি মূল্য ধরে দিলেই চলবে।

পূজার পালা শেষ করে ফিরে এসে আমার পাশেই বসে পড়লেন পোপটলাল। তাঁর মুখে চোখে যেন জোয়ার এসেছে। এখান থেকে নেমে পোপট নিশ্চয়ই সেই আগের মানুষটি হয়ে যাবেন, সেই সদা হাসি-খুশি প্রাণখোলা সহৃদয় লোকটি।

ও কি! ও কি হল?

চন্দ্রকূপের সেইদিকেই চেয়ে ছিলাম। হঠাৎ দেখি আর একটি ও বুজকুড়ি উঠছে না। সমস্ত জায়গাটা একেবারে প্রাণহীন নিস্পন্দ নিথর। যেন জুড়িয়ে একেবারে ঠাণ্ডা হয়ে গেল চন্দ্রকূপ, নীচেকার আগুন নিবে গেল আচম্বিতে। সেই সঙ্গে সেই প্রচণ্ড ঝড়ও একেবারে স্তব্ধ।

মুখ ফিরিয়ে দেখি রূপলাল উঠে দাঁড়িয়েছে আর তার পাশে দাঁড়ানো লোকটির হাত চেপে ধরেছে। রূপলালের দুই চোখ দিয়ে আগুনের হলকা বেরুচ্ছে।

কে ওই লোকটা?

সুন্দরলাল।

সুন্দরলাল বাজোরিয়া কাথিওয়াড়ের লোক নয়। গোয়ালিয়রের মানুষ সুন্দরলাল। প্রায় চল্লিশ বছর হবে তার বয়স, ওর বাবা রাজকোটে ব্যবসা করে প্রচুর টাকা আর খানকয়েক বাড়ি রেখে গেছেন। গোটাতিনেক বিয়ে করেও যখন বংশরক্ষা হল না তখন একমাত্র উপায় মা হিংলাজ দর্শন। হিংলাজ দর্শন করে এলে মায়ের দয়ায় তার বংশরক্ষা হবে।

কিন্তু এখন বংশরক্ষার চেয়ে নিজের প্রাণরক্ষাই বড় কথা হয়ে দাঁড়াল যে! রূপলাল তার হাতখানায় ঝাঁকানি দিতে দিতে গর্জন করতে লাগল- "বলো- বলো তুমি জলদি-কি অন্যায় কাজ করে এসেছ তুমি এখানে। কবুল করো, স্পষ্ট করে স্বীকার করো যদি বাঁচতে চাও—"

সুন্দরলাল চুপ। মাথা হেঁট করে দাঁড়িয়ে আছে। তার হাতে মোচড় দিতে দিতে আবার ধমক দিয়ে উঠল রূপলাল। ডুকরে কেঁদে উঠল সুন্দরলাল। না-সে সজ্ঞানে একটিও স্ত্রীহত্যা বা ভ্রূণ হত্যা করেনি।

"তবে বন্ধ হল কেন বুদবুদ কাটা-বাবা চন্দ্রকূপ কিসের জন্য নারাজ হলেন তোমার বেলায়?"

উত্তর নেই সুন্দরলালের মুখে। শুধু কান্নায় ফুলে ফুলে উঠছে তার সর্বশরীর। একেবারে বলির পাঁঠার মতো অবস্থা তার। ব্যাপার দেখে ভয় হল-লোকটাকে যদি ধাক্কা মেরে ফেলে দেয় রূপলাল! চন্দ্রকূপের ভিতর বার যে ধারেই হোক—ধাক্কা মেরে ফেলে দিলে আর রক্ষা নেই। সকলের পিছন দিয়ে সাবধানে পা ফেলে পৌঁছিলাম ওদের কাছে। গিয়ে সুন্দরলালের কাঁধে হাত রেখে দাঁড়ালাম। সে মুখ তুলে চাইলে আমার দিকে। বললাম- "সুন্দরলাল, ভ্রূণহত্যা তুমি না করতে পারো, কিন্তু তোমার কি মনে পড়ে এমন কোনো ব্যাপার যে, তোমার দ্বারা কোনো মেয়ের গর্ভ হয়েছিল, যে-মেয়ে তোমার স্ত্রী নয়!"

দপ্ করে আলো জ্বলে উঠল সুন্দরলালের চোখে। চিৎকার করে উঠল সে-"হাঁ হাঁ মহারাজ, এইবার আমার মনে পড়েছে। কিন্তু তাকে আমার মা বাড়ি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিল। তারপর তার কোনো খবরই পাইনি আমি।"

বললাম, "খবর আর নাওনি ভালোই করেছ। নিলে জানতে পারতে যে, সেই মেয়ে তোমাদের কাছ থেকে গিয়ে গর্ভ নষ্ট করেছে কিংবা সে নিজেই মরে সব বিপদের হাত থেকে উদ্ধার পেয়েছে। আর এ দুটির যেটিই ঘটে থাকুক, তার জন্যে তুমিই দায়ী। এইটুকুই বাবার কাছে কবুল করে ক্ষমা চাও। তাহলেই বাবার দয়া হবে।"

ঘুরে দাঁড়াল সুন্দরলাল চন্দ্রকূপের দিকে। দু হাত জোড় করে বলে গেল সেই মেয়ের নাম আর তার সঙ্গে যা যা ঘটেছিল আগাগোড়া সেই কাহিনী। সঙ্গে সঙ্গে বার বার নিজের নাক-কান নিজের দু হাতে মলতে লাগল।

আবার একটি-দুটি করে বুজকুড়ি কাটতে আরম্ভ হল চন্দ্রকূপে। আবার হাওয়া বইতে লাগল। সুন্দরলালের হাতে নারকেল কল্কে গাঁজা তুলে দিয়ে রূপলাল মন্ত্রপাঠ শুরু করলে। সবাই বার বার জয়ধ্বনি দিতে লাগল, "জয় বাবা চন্দ্রকূপ স্বামী মহারাজ, জয়!"

আবার পা টিপে টিপে নিজের জায়গায় ফিরে চললাম। নাম ডাকলে উঠে আসব।

"হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ-হা হা-"

সমস্ত শরীরের ভিতর দিয়ে যেন বিদ্যুৎ খেলে গেল। মুখ তুলে চেয়ে দেখি—ওই— যে সে এসে দাঁড়িয়েছে, একেবারে ঠিক আমাদের সামনা সামনি চন্দ্রকূপের ওপারে।

দু-হাতে নিজের মাথায় দু-পাশের চুল মুঠি করে ধরে আবার সেই উৎকট হাসি হেসে উঠল বিরুমল-"হাঃ হাঃ হাঃ-হা-হা-!"

প্রাণপণে চিৎকার করে উঠলাম, "থিরুমল, হুঁশিয়ার আর এক পা এগিও না, খবরদার-আর এক পা-"

আমার কথা শেষ হল না। থিরুমল প্রচণ্ড বেগে লাফিয়ে উঠল উপর দিকে।

পরমুহূর্তেই তার দেহটা নামল এসে সামনে চন্দ্রকূপের মধ্যে। বহু উঁচুতে ছিটকে উঠল

কাদা। কি জানি কেন সেই মুহূর্তেই চোখ বন্ধ করলাম, কিংবা সম্পূর্ণ অনিচ্ছায় আর অজ্ঞাতে দু চোখ বুজে গেল আমার।

তৎক্ষণাৎ খুলেও গেল চোখ। দেখতে পেলাম আকাশের দিকে উঁচু করা দুখানি পা মাত্র। দম বন্ধ করে চেয়ে রইলাম সে পা দুখানির দিকে। কাঁপতে কাঁপতে পা দুখানি কাদার তলায় তলিয়ে গেল।

পালাচ্ছি।

পাণ্ডা পুরুত যাত্রী যজমান মহাপাপী আর মহাপুণ্যবান সবাই পালিয়ে যাচ্ছি প্রাণ নিয়ে। রইল পূজা করা, রইল ভোগ নিবেদন করা, রইল বাকি অনেকের নারকেল গাঁজা আর কল্কে ছোঁড়া। হুড়মুড় করে ছুটে পালাচ্ছি সবাই। যাদের তখনও নিজমুখে নিজেদের মহাপাপ কবুল করা হয়নি, যারা তখনও দেবতার কৃপাভিক্ষা করে হুকুম নিতে পারেনি, তারাও পালাচ্ছে। আর দরকার নেই, কারও মনের কোণে আর তিলমাত্র আকাঙ্ক্ষা নেই এই দেবতার করুণা ভিক্ষা করবার। দেবতা এ নয়-দেবতার আরবরণে নৃশংস দানব। প্রাণের মায়া ত্যাগ করে বুকের জ্বালা জুড়াবার জন্যে যার কাছে আমরা ছুটে এসেছি-সে ছদ্মবেশী পিশাচ। ওর নির্লজ্জ উলঙ্গ পরিচয় মর্মে মর্মে পেয়েছি আমরা। ভুল আমাদের ভেঙেছে—ক্ষমা কৃপা অনুকম্পা সমবেদনা এ সবের জন্যে ওর কাছে মাথা খোঁড়বার আর লেশমাত্র প্রবৃত্তি নেই আমাদের। দোষ ত্রুটি পাপ অপরাধ যা-কিছুই করে থাকি এ জীবনে, করেছি মানুষের কাছেই। সে-সবের মার্জনা পাবার জন্যে মানুষের পায়েই মাথা খুঁড়তে হবে। দেবতার কাছেও না, মনিবের কাছেও না। ওরা দুজনেই একই বস্তুর এপিঠ আর ওপিঠ। নিজেদের শক্তির দম্ভে ওরা এতদূর উন্মত্ত যে, মানুষের বুক-নিংড়ানো সুখ দুঃখ হাসি কান্না ওদের কাছে নিতান্ত তুচ্ছাতিতুচ্ছ ব্যাপার, মানুষের স্তবস্তুতি দয়াভিক্ষা ওদের কাছে নগণ্য পরিহাসযোগ্য পাগলের প্রলাপ।

চোখ বুজে পালাচ্ছি।

প্রকাণ্ড হাঁ করে পিছনে তেড়ে আসছে রাক্ষস। ধরতে পারলে টপ করে ফেলে দেবে সেই হাঁ-এর মধ্যে। চিবোবেও না একবার-একেবারে গ্রাস করবে চক্ষের নিমেষে। পিছন ফিরে তাকাবার সাহসও নেই কারও, সে প্রয়োজনও নেই। স্পষ্ট পায়ের শব্দ শোনা যাচ্ছে কানে। শুধু পায়ের শব্দ কেন, ওর উৎকট নির্লজ্জ হাসি কানের মধ্যে ঢুকছে, মাথার মধ্যে হাতুড়ির ঘা মারছে, সেই হাসি শুনে বুকের রক্ত যাচ্ছে শুকিয়ে। শরীরের প্রতিটি তন্ত্রী থরথর করে কাঁপছে-সেই প্রেতের হাসি অনবরত ছোটাছুটি করছে পায়ের নখ থেকে মাথার তালু পর্যন্ত-"হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ-হা-হা-"

ঊর্ধ্বশ্বাসে পালাচ্ছি।

কেউ কারও দিকে ফিরেও তাকাচ্ছি না। কে রইল পিছনে পড়ে আর কেইই বা গেল দানবের গ্রাসের মধ্যে সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই কারও। দরকারও নেই। কোনো রকমে দূরে চলে যাওয়া দূরে, আরও দূরে আরও অনেক দূরে-যেখান থেকে নজরও পড়বে না ওই রাক্ষসের মুখের হাঁ। চোখ বুজেও দেখতে পাচ্ছি কালো থকথকে পুঁজ রক্ত ক্লেদ। বিরাট মুখব্যাদান করে আছে মহাপিশাচ, টগবগিয়ে ফুটছে সেই পুঁজ রক্ত ক্লেদ তার হাঁ-র মধ্যে। যুগ-যুগান্ত ধরে যাদের গ্রাস করেছে, ওই ঘন কালো রক্ত তাদের। হজম হয়নি। অত রক্ত হজম করার কথা নয়, তাই উপচে পড়ছে ওর মুখগহ্বরে। তবুও ওর ক্ষুন্নিবৃত্তি হয়নি। কোনো কালে তৃপ্তি হবে না ওর নৃশংস লালসার। কোনও মহাবলি দিয়েই তুষ্ট করা যাবে না ওই দুর্দান্ত শত্রুকে। পালাও পালাও, যে ভাবে হোক যে করে হোক আগে বীভৎস দৃষ্টির আড়ালে লুকিয়ে ফেলো নিজেকে। তারপর হিসেব করা যাবে-কে রইল কে কে গেল।

সবই পড়ে রইল সেখানে। তন্ত্রমন্ত্র দানদক্ষিণা নারকেল গাঁজা কলকে আর সেই মস্ত বড় পোড়া আটার ডেলাটা। কোনও কিছুর দিকেই ফিরে চাইলাম না আমরা। সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্য-আকাশের দিকে উঁচু করা হাঁটু থেকে পাতা পর্যন্ত দু-খানা পা! থরথর করে কাঁপছে পা দু-খানা-কাঁপতে কাঁপতে অদৃশ্য হয়ে গেল কাদার মধ্যে। ঠিক সেইখানে উঁচু হয়ে উঠল একটা ধামার মতো বুজকুড়ি, আবার সেটাও ঠিক সেইখানে ভেঙে মিলিয়ে গেল। কয়েকটা মুহূর্তের মধ্যেই ঘটে গেল ব্যাপারটা এতজোড়া চোখের সামনে। কিছুই করতে পারলাম না আমরা, একটি আঙুলও তুলতে পারলাম না। পাষাণ হয়ে চেয়ে রইলাম সেই ভয়ঙ্কর দৃশ্যের দিকে।

একটা প্রাণফাটা চিৎকার করে উঠল কুন্তী। সেই দিকে আমাদের সজোরে ধাক্কা মারলে। ধাক্কা খেয়ে সবাই ছিটকে পড়লাম পিছন দিকে, তার ফলে সেই মাটির পাহাড়ের গড়ানে গা বেয়ে গড়িয়ে হড়কে হুড়মুড় করে সকলে এসে পৌঁছে গেলাম নীচে। হাড়গোড় ভাঙল-চুরল কিনা সেদিকে কারও খেয়াল নেই। উঠে দাঁড়িয়েই আবার দৌড়। উঁচুনিচু ঢিবি-টিলা, খাল-খন্দ টপকে ডিঙিয়ে ছুটতে লাগলাম সবাই।

আর কিছু খেয়াল নেই। কী ভাবে কেমন করে যে উটের কাছে গিয়ে পৌঁছলাম আর তারপর সামনের কুয়োর ধারে কখন গিয়ে উপস্থিত হলাম-সে সব কিছুমাত্র মনে নেই। শুধু মনে আছে, সেখানে পৌঁছেই চাদর মুড়ি দিয়ে একটা গাছতলায় আমি শুয়ে পড়ি।

যথাসময়ে সেই সর্বনাশের অশুভ দিনটা যথাস্থানে গড়িয়ে চলে গেছে, এসেছে সর্বদুঃখহারিণী রাত্রি। এসে গায়ে মাথায় সর্বাঙ্গে শীতল হাত বুলিয়ে সেই কালনিদ্রা থেকে জাগিয়ে তুললে। চাদর ফেলে চোখ মেলে উঠে বসলাম। কি হয়েছে, কোথায় ছিলাম, এখন কোথায় এসেছি, এ-সব কোনো কিছুই খেয়াল করতে পারলাম না। মাথার ভিতরটা যেন ফোঁপরা হয়ে গেছে। বেশ কিছুক্ষণ লাগল নিজেকে নিজে খুঁজে ফিরে পেতে। একটু একটু করে সবই আবার উদয় হল মনে। তখন চতুর্দিকে চেয়ে দেখলাম।

একটিমাত্র মূর্তি স্থির যে বসে ছিল মাথার কাছে। আর বাকি সবাই চারিদিকে ঘিরে শুয়ে পড়েছে। রাত যে তখন কত তা ঠিক ঠাওর করতে পারলাম না। উপর দিকে চেয়ে দেখলাম সন্ধ্যাতারাটা প্রায় মাথার উপর এসে পড়েছে।

আমাকে ঘেঁষে আমার ডানপাশে যে শুয়ে ছিল সে তড়াক করে লাফিয়ে উঠে বসল। সবিস্ময়ে দেখলাম, সুখলাল-আমাদের ছোট ঠাকুরমশাই, পণ্ডিত সুখলাল পাণ্ডা, হিংলাজকা ছড়িওয়ালে। এতক্ষণে মনে পড়ে গেল, সেখানেই সে চন্দ্রকূপের মাথায় আমাকে জড়িয়ে ধরে শ্রীমান ভিরমি খায়। তারপর তাকে বুকে তুলে নিয়ে যে কেমন করে আমি নীচে এসে পৌঁছই সে-কথা কিছুতেই মনে করতে পারলাম না। উটের কাছে পৌঁছে তাকে বুড়ো গুলমহম্মদের হাতে দিয়ে তার কথা একবারে ভুলেই গিয়েছিলাম। সুখলাল আমার একখানা হাত তার ছোট্ট দুহাতে চেপে ধরে মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে বসে রইল। একটি কথাও বেরুল না তার মুখ দিয়ে, শুধু তার কালো চোখ দুটো অন্ধকারের মাঝে জ্বলজ্বল করে জ্বলতে লাগল।

ছেলেটার একমাথা কোঁকড়া চুলের মধ্যে নিঃশব্দে আঙুল চালাতে লাগলাম। তখন চাদর মুড়ি দিয়ে বসা মূর্তিটি নড়ে উঠল। চাদরের ভিতর থেকে চাপা গলায় শোনা গেল–"গুহ্যাতিগুহ্যগোপত্রী ত্বং গৃহাণাস্মৎকৃতং জপং।" মন্ত্রপাট সমাপ্ত করে চাদর খুলে ভৈরবী মালা-ঝুলি গলায় ঝুলিয়ে পাশের আলোটা উসকে দিলেন। সেই আলো তাঁর মুখে পড়াতে ভালো করে দেখতে পেলাম তাঁর মুখ। মনে হল তাঁর ঠোঁট থরথর করে কাঁপছে আর অবাধ্য ঠোঁটের কাঁপুনি তিনি কামড়ে ধরে থামবার চেষ্টা করছেন।

ততক্ষণে সুখলাল হাত ধরে টানাটানি জুড়ে দিয়েছে। এখনই কুয়োর কাছে যেতে হবে। সে জল তুলে দেবে আর সেই জলে আমি স্নান করে আসব।

গলাটা কেশে পরিষ্কার করে নিয়ে ভৈরবী বললেন- "জল ওখানে তোলা আছে।"

বলে আলোটা হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়ালেন।

বললাম, "আমায় জাগওনি কেন?"

কোনো উত্তর নেই।

আবার জিজ্ঞাসা করলাম, "খেয়েছে সবাই?"

উত্তর দিলে সুখলাল-"আর সকলের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে, আপনি আর মাতাজি শুধু বাকি।"

ভৈরবী একভাবে আলোর দিকে চেয়ে আছেন।

উঠে পড়লাম। শরীর বেশ ঝরঝরে বোধ হচ্ছে। মাথাটাও বেশ হাল্কা হয়ে গেছে। বললাম-"তোমাদের যেতে হবে না। কুয়োটা কোনদিকে?"

সুখলাল হাত ধরে টানতে লাগল—"চলুন দেখিয়ে দিচ্ছি।" বিনা বাক্যব্যয়ে ভৈরবী আলোটা হাতে করে পিছু পিছু চললেন।

কাছাকাছি ঘেঁষাঘেঁষি সবাই শুয়ে ঘুমুচ্ছে। একটু দূরে উট দুটো বসে আছে। ওদের কাছ দিয়ে যাবার সময় বুড়ো একবার উঠে বসল, নিজের কপালে হাতটাও ঠেকালে-কিন্তু মুখে কোন সম্ভাষণ নেই।

হঠাৎ একটা কথা মনে পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে দুটো পা আড়ষ্ট হয়ে গেল, কই-সে কই? ৷

পিছন থেকে ভৈরবী বললেন, "কি হল আবার দাঁড়ালেন কেন?"

"কুন্তী-কুন্তী কই?" কোনো রকমে কথাটা বেরুল গলা দিয়ে।

ভৈরবী বললেন, "ভালোই আছে। ওই ওধারে একলা শুয়েছে আজ। মেয়ে জাত—সহজে মরে না।

"কিন্তু খাওয়া দাওয়া? খেয়েছে ও কিছু?"

সুখলাল উত্তর দিলে-"একখানা রুটি খেয়েছে। পোপটলাল জোর করে খাইয়েছেন।"

অনেকটা নিশ্চিন্ত হয়ে আবার পা চালালাম। কুয়োটা বেশ দূরে কয়েকটা বড় বড় গাছের আড়ালে। সেখানে পৌঁছে দেখা গেল উট ছাগলের জল খাবার কাঠের ডোঙাটা পরিষ্কার করে ধুয়ে জল ভরতি করে রাখা হয়েছে। সুখলাল আর ভৈরবী গাছতলায় বসল আলো নিয়ে, আমি স্নান-টান সেরে নিলাম।

ফিরে আসতে আসতে ভৈরবী বললেন-"চা খেতে খেতে ভাত হয়ে যাবে, আধ ঘণ্টাও লাগবে না। আজ দু-দুটো দিন ত পেটে কিছু পড়েনি।"

"সে কি! এখনও রান্না হয়নি তোমাদের!"

ভৈরবী চুপ করে রইলেন। সুখলাল বকবক করতে লাগল। তার কথা থেকে এইটুকু বুঝলাম যে, এখানে পৌঁছে সেই যে ভৈরবী মুখ বন্ধ করে চাদর মুড়ি দিয়ে বসেছেন আর এই এতক্ষণে মুখে খুললেন। কারও সঙ্গে একটি বাক্যলাপ পর্যন্ত করেননি, কেউ আসেওনি ওঁকে ঘাঁটাতে। সন্ধ্যার সময় একবার মাত্র উঠে গিয়েছিলেন স্নান করে আসতে,-ফিরে এসে আবার ঠিক সেই এক জায়গাতেই বসেন চাদর মুড়ি দিয়ে। আমি উঠে বসতে তবে চাদরের ভিতর নড়ে উঠেছেন।

হাসি পেল। আরাম করে পড়ে ঘুমিয়েছি আমি আর একজন ঠায় বসে কাটিয়েছে একভাবে, জল পর্যন্ত মুখে না দিয়ে। খামকা দুর্ভোগ ভোগা আর কাকে বলে!

উট দুটোর এ-পাশে এসে দেখা গেল গাছতলায় আগুন জ্বেলে কে যেন কী চড়িয়েছে! ভৈরবী বললেন, "এখন আবার কার কি রান্নার দরকার হল ওখানে?"

আরও কাছে এসে দেখা গেল চুলো জ্বালিয়ে তার উপর ডেকচিটা বসানো হয়েছে আর তার সামনে দু হাঁটুতে মুখ গুঁজে যে বসে আছে সে অন্য কেউ নয়-কুন্তী।

কাছে গিয়ে ভৈরবী বললেন, "তুই আবার উঠে এলি কেন? দুটো ভাত তো আমি রেধে নিতেই পারতাম।"

কুন্তী খিল খিল করে হেসে উঠল। হাঁটুতে মুখ গোঁজা অবস্থাতেই জবাব দিলে, "কেন—হয়েছে কি আমার? আমি রান্না করে দিলে আপনারা খাবেন না নাকি?"

সেই হাসি কানে যেতে চমকে উঠলাম। সত্যিই তাহলে কিছুই হয়নি ওর? সবই সম্ভব-সৃষ্টিকর্তার আজব সৃষ্টি হচ্ছে মেয়েরা।

একে একে উঠে এল রূপলাল পোপটভাই গুলমহম্মদ আরও অনেকে। ওরা তাহলে কেউই ঘুমোয়নি। শুধু মটকা মেরে পড়েছিল এতক্ষণ। সবাই একে একে এসে বসল সামনে। কিন্তু মুখে কারও কথাটি নেই।

বিশ্রী কাণ্ড। এতগুলো লোক মুখোমুখি বসে আছি কিন্তু একটি কথা নেই কারও মুখে। শেষে গুলমহম্মদকে জিজ্ঞাসা করলাম, "কি শেখ সাহেব, আর কদিন লাগবে হিংলাজ পৌঁছতে?"

এতক্ষণে পরে শেখ সাহেবের তন্দ্রা ছুটে গেল। 'জি হুজুর' বলে কপালে হাত

ঠেকালে। আবার সেই একই প্রশ্ন করলাম তাকে, এবার মগজের মধ্যে ঢুকল কথাটা। একবার সকলের মুখের উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে আরম্ভ করলে-"এই ধরুন না, কাল আমরা যেখানে পৌঁছব সেখান থেকে আমার বাড়ি বেশিদূর নয়। রাতে গিয়ে আবার ভোরবেলায় ফিরে আসা যায়-"

রূপলাল তেরিয়া হয়ে উঠল, "তা বলে আমরা একদিনও দেরি করতে পারব না সেখানে। সোজা চলে যাব হিংলাজ। এবার আর ও-সমস্ত আবদার চলবে না তা আগেই বলে রাখছি।"

বুড়ো একেবারে চুপ করে গেল। রূপলাল এবার আমার কথার জবাব দিলে।

'কাল বেলা থাকতে থাকতে এখান থেকে ওঠা যাবে। বেশি রাত হবে না সামনের কুয়োর কাছে পৌঁছতে। সেখানে রাতটা ঘুমিয়ে ভোরবেলা আবার চলতে আরম্ভ করলে বেলাবেলি যেখানে পৌঁছব আমরা, সেখান থেকেই উট ছেড়ে দিতে হবে। তারপর

এবার পোপটভাই থামালেন তাকে-'এবার থামো। আগে উঠি এখান থেকে, তারপর যা হবার তখন হবে।"

কে একজন জিজ্ঞাসা করলে, "আজ ভোররাতে এখান থেকে ওঠা হবে না কেন?"

রূপলাল খিঁচিয়ে উঠল-"দেখতে পাচ্ছ না একটা লোক অসুস্থ, কাল সকালে যাওয়া যায় কি করে?"

বেশ ঘাবড়ে গেলাম। আবার আর একজন পড়ল নাকি! লোকটি কে?

গুলমহম্মদ খাড়া হয়ে বসে এতক্ষণ পরে আবার কথা বললে, "জরুর আলবাত! যতক্ষণ না বাবার তবিয়ৎ ঠিক হচ্ছে ততক্ষণ এখান থেকে উঠছে কে?"

এবার সত্যিই আশ্চর্য হয়ে গেলাম।

"তার মানে? কার তবিয়ৎ খারাপ? কার জন্যে কাল সকালে যাওয়া বন্ধ থাকবে?"

একান্তে বিনীত ভাবে পোপটভাই জবাব দিলেন, "আজ্ঞে, আপনার কথা আমরা ভাবছিলাম।"

এতক্ষণ পরে সমস্ত বুঝতে পেরে হো হো করে হেসে উঠলাম।–"আমার হয়েছে কি যে তোমরা মাথা ঘামাচ্ছ? সারাদিন ঘুমিয়ে এখন আমি এমন চাঙা হয়েছি যে, বলো তো এখনই রওনা দিতে পারি। আচ্ছা মুশকিল যা হোক-আমার জন্যে তোমরা এমন মন মরা হয়ে আছ!"

এইবার রূপলালও চাঙা হয়ে উঠল। হঠাৎ সেই অর্ধেক রাত্রে এক বিরাট হুঙ্কার দিয়ে উঠল সে-"জয় হিংলাজ মাতা রানি কি –"

যারা শুয়েছিল তারাও লাফিয়ে উঠে বসে উত্তর দিলে-"জয়!"

তারপরে ওরা কলকে ধরালে, আর সুখলাল এসে ডাক দিলে-ভাত বাড়া হয়ে গেছে।

খেতে বসলাম-সুখলালকে নিয়ে। সে তো কিছুতেই খাবে না। একবার সন্ধ্যার সময় রুটি খেয়েছে যে। ভৈরবী তাকে জোর করে বসালেন। সন্ধ্যা কেন, দিনের বেলাতেও কিছু খায়নি ছেলেটা, ঠায় আমার গা ঘেঁষে শুয়ে ছিল। পোপটলাল জোর করে বোধ হয় একখানা রুটি খাইয়েছেন।

পরিবেশন করছে কুন্তী। অনেকদিন পরে আজ আবার সে মাথা ঘষে স্নান করেছে। রুক্ষ চুল শুকনো মুখের দু-পাশ দিয়ে এসে পড়েছে তার বুকের উপর। লালপাড় শাড়িখানা আবার পরেছে আবার আজ। আধা-অন্ধকারে চলছে ফিরছে, কাজকর্ম করছে। লক্ষ করে দেখলাম যেন কোনো কিছুই হয়নি তার। এতটুকু আড়ষ্ট ভাব বা অবসাদ নেই তার চলাফেরার। যত দেখছি ততই একটা চিন্তা মাথায় আসছে আমার-এই স্বচ্ছন্দ চলাফেরার আড়ালে অন্য কিছু নেই তো? এই হাসিখুশি ভাবটার ঠিক তলায়-একটা অন্তঃসলিলা বিষের নদী বইছে না তো? 'যাক বাঁচা গেল' বলে কুন্তী কি তার মন থেকে সেই মর্মান্তিক ছবিটা মুছে ফেলতে পেরেছে? কি জানি-মেয়েরা হচ্ছে বিধাতার আজব সৃষ্টি!

তারপর ভৈরবী কুন্তীকে নিয়ে খেতে বসলেন।

সবাই শুয়ে পড়েছে। আমার মাথার কাছে কম্বল বিছিয়ে শুয়েছেন ভৈরবী। চাপাগলায়

তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, “আচ্ছা এখান থেকে ফেরবার কি কোনো উপায় নেই?”

এ আবার কি কথা! জিজ্ঞাসা করলাম, “কোথায়?”

“একেবারে করাচী।”

“তার মানে?”

“মানে আর এক পা এগোবার ইচ্ছে নেই আমার। মা হিংলাজ মাথায় থাকুন। এখন ভালোয় ভালোয় ফিরতে পারলে বাঁচি।”

কেন? আমাদের কোন ক্ষতিটা হয়েছে? এ পর্যন্ত মা হিংলাজের দয়ায় গায়ে আঁচড়টুকু পর্যন্ত লাগেনি। যার কপালে যা ঘটবার ঘটেছে, তাতে আমাদের কি?”

“এইবার আমাদের কপালেও ঘটবে। দরকার নেই আর তীর্থ করে। কাল সকালে উটওয়ালাদের বলুন যে, একটা উট নিয়ে আমাদের করাচী পৌঁছে দিক। একটা উটের ভাড়া তো আমরাই দিয়েছি।”

“আমার তো আর মাথা খারাপ হয়নি যে, হিংলাজের দরজায় এসে মাকে দর্শন না করে ফিরে যাব! আর তা ভিন্ন দু-দুটো মেয়েমানুষ নিয়ে এই পথ দিয়ে মাত্র একজন লোকের সঙ্গে যাওয়া-এত বড় বুকের পাটাও আমার নেই।”

একটু চুপ করে থেকে ভৈরবী বললেন, “তবে আগে মাথাটা খারাপ হোক ষোলআনা তখন ফেরা যাবে। দু-দুটো মেয়ে মানুষ আবার কে? আমরা কাকেও সঙ্গে করে আনিনি, কারও ভার দায়িত্বও নেই আমাদের কাঁধে। যেতে হয় কাল আমরা দুজনেই যাব ফিরে। ডাকাতে মারে রাস্তায় সেও ভালো, তবুও এ যাত্রা আর এক পা ও আমি যাচ্ছি না। ওই আপদের হাত থেকে রেহাই না পেলে সর্বনাশ হয়ে যাবে, এ আমি আজই ভালো করে বুঝেছি।”

আবার একটু চুপ করে থেকে ভৈরবী আরম্ভ করলেন, “মাথা খারাপ হয়নি-আর হবার বাকি আছে কতটুকু? সারাটা দিন হুঁশ ছিল কোথায় আপনার? দলসুদ্ধ সবাইকে ডেকে জিজ্ঞাসা করুন না, সকলের প্রাণ উড়ে গিয়েছিল আপনার অবস্থা দেখে। একজন মাথা খারাপ হয়ে যেখানে যাবার গেছে, এবার আপনার পালা। ওই সর্বনেশে মেয়ে যার কাঁধে ভর করবে, তারই সর্বনাশ হবে এ আমি বলে রাখলুম।”

কাঠ হয়ে শুয়ে শুয়ে শুনছি। বলে কি! এবার কুন্তীকেও ফেলে যাবে নাকি?

একটু দম নিয়ে আবার বলতে লাগলেন ভৈরবী, “সারাটা দিন এক আসনে বসে জপ করেছি আর মাকে জানিয়েছি। মা একবার মুখ তুলে চেয়েছেন। দলসুদ্ধ সবাই, এমনকি উটওয়ালারা পর্যন্ত একেবারে আশা ছেড়ে দিয়েছিল অবস্থা দেখে। সুস্থ মানুষ, কারও সঙ্গে কথাও বলে না, কোনো দিকে চেয়েও দেখে না, এতখানি পথ ঘুমোতে ঘুমোতে চলে এল-ঠিক এই রকম অবস্থাই হয়েছিল সেই ছোঁড়ার। সারাটা পথ আমি হাত ধরে নিয়ে এলাম আপনাকে, একবারের জন্যে আমাকেও চিনতে পারলেন না। মাথা খারাপ হতে আর বাকি আছে কতটুকু আপনার?”

ততক্ষণে আমি উঠে বসেছি। বসে হাঁ করে শুনছি সব কথা। এবার একটু একটু মনে হতে লাগল–আজ সারাদিন আমি কি করেছি, কি দেখেছি, কি শুনেছি। কিছু না, কিছুই করিনি, দেখিনি বা শুনিনি-সুখলালকে গুলমহম্মদের হাতে দিয়ে স্রেফ ঘুমিয়ে পড়েছি। হাঁ, হাঁ-এইবার সব মনে পড়েছে। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখেছি। শুধু আমার মাকে। একেবারে ছোটবেলাকার সব ঘটনা। বেদম দুরন্তপনা করছি। দুটো ছাগলছানা নিয়ে বাড়িঘর তোলপাড় করে বেড়াচ্ছি। মা এসে ধরলেন। ধরে বেঁধে রাখলেন খাটের পায়ার সঙ্গে দুখানা গামছা পাকিয়ে। কাঁদতে কাঁদতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছি। ঘুম ভাঙতে দেখি মা’র কাছে শুয়ে আছি, তখন অনেক রাত। ভয় পেয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে আঁতকে উঠলাম। মা বললেন-পাজি ডাকাত-সারাদিন দস্যিপনা করে যখন জ্বালাস আমাকে, তখন মনে থাকে না রাতের কথা? অন্ধকার হয়েছে কি, ছেলে একেবারে আলাদা মানুষ হয়ে গেল। আঁচলের তলায় ঢুকে একেবারে কত ভালোমানুষটি এখন। যা না যা, ছাগলছানা নিয়ে দৌড়াদৌড়ি করে সব

ভেঙেচুরে তছনছ করগে যা।”

আমার মায়ের মুখখানি চোখের উপর ভেসে উঠল। সেই আধ হাত চওড়া লালপাড় শাড়ির ঘোমটার ভিতর এত বড় সিন্দুরের টিপ। সেই চোখ দুটি। যখন আমায় শাসন করতেন মা, তখনও সেই চোখ দুটির দৃষ্টি আমার গায়ে মাথায় সর্বাঙ্গে সে কি মিষ্টি স্পর্শ বুলিয়ে দিত। চোখ বুজে মনে করলে আমার মায়ের সেই দৃষ্টির পরশ আজও সর্বাঙ্গে অনুভব করি। আজও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি মায়ের দু কানের, ওপর থেকে নীচ পর্যন্ত অনেকগুলো সোনার মাকড়ি, আর একমুখ পানসুদ্ধ মায়ের সেই হাসি।

ভৈরবীর কথায় আর কান ছিল না। মাকে চাক্ষুস দেখতে দেখতে কোথায় কতদূরে চলে গিয়েছিলাম। স্পষ্ট, একেবারে সুস্পষ্ট মা'র গলার আওয়াজ কানে গেল। বলছেন, “এতদূর এসে তুই আমাকে দেখা না দিয়ে ফিরে যাবি?”

হঠাৎ তন্দ্রা ছুটে এল। চিৎকার করে উঠলাম, “গুলমহম্মদ, গুলমহম্মদ!”

চিৎকার শুনে অনেকে উঠে বসল ৷ বুড়োও ওধার থেকে চিৎকার করে সাড়া দিলে। রূপলাল সামনে এসে দাঁড়াল।

আকাশের পশ্চিম দিকে চেয়ে দেখলাম “ জ্বলজ্বল করে জ্বলছে বড় তারাটা। জ্বলুক- আর দেরি করা কাজের কথা নয়। বললাম, রূপলাল, দশ মিনিটের মধ্যে তৈরি হও সবাই। ওদের বলো, মালপত্র তুলুক। এখনই যাত্রা আরম্ভ হবে। আর এক মিনিটও কোথাও দেরি করা চলবে না। একেবারে সোজা চলো হিংলাজ!”

একসঙ্গে অনেকে চিৎকার করে উঠল, “হিংলাজ মায়ী কি একমাত্র আমিই শেষ করলাম কথাটি, “জয়!” সোজা চলো হিংলাজ!

কিন্তু হিংলাজের পথ সোজা নয়। সোজা নয় মা'র কোলে ওঠা, সহজ নয় মায়ের মুখের হাসি দেখা। তখন সবই সোজা সবই সহজ ছিল যখন নির্বিচারে দুষ্টামি করে মাকে সারাদিন জ্বালিয়েছি বিরক্তি করেছি-আবার ভয় পেয়ে দৌড়ে গিয়ে মাকেই আঁকড়ে ধরেছি। সে সময় এ-সমস্ত সহজ ছিল, সোজা ছিল। তারপর জ্ঞানবুদ্ধি বাড়তে লাগল– মাতৃভক্তি সম্বন্ধে ভালো রচনা লিখে স্কুলে ভালো নম্বর পেলাম, বেশ করে শিখলাম কি ভাবে মায়ের সঙ্গে ব্যবহার করলে লোকে নিন্দে করবে না। মা'র সঙ্গে মেপেজুখে হিসাব করে কথা বলতে শিখলাম। খুবই সাবধান হয়ে চলতে শিখলাম যাতে মায়ের মর্যাদায় আঘাত দিয়ে না ফেলি। আর সেই সঙ্গে এও শিখলাম যে ভয় পেলে মাকে গিয়ে আঁকড়ে ধরা কতখানি লজ্জার কথা। তার চেয়ে ঢের ভালো, ঢের বড় কথা হচ্ছে-মা'র কাছ থেকে দূরে সরে গিয়ে নিজের বিচার বুদ্ধি ক্ষমতার উপর নির্ভর করে চলা। তাই-ই এতকাল করেছি, এড়িয়ে চলেছি মাকে, মাকে লুকিয়ে মায়ের চোখে ধুলো দিয়ে অনেক দূরে চলে এসেছি। কাজেই আর কিছু সহজ নয়, কিছুই সোজা নয়। সবই গোলমেলে বাঁকাচোরা গোলকধাঁধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। বিদ্যে-বুদ্ধি হয়েছে যে, জ্ঞানবিচার করতে শিখেছি কিনা–তাই মাও নিশ্চিন্ত হয়ে একেবারে হাল ছেড়ে দিয়েছেন; নিজের ভালোমন্দ বুঝতে শিখেছি কিনা, তাই আর গামছা পাকিয়ে খাটের পায়ার সঙ্গে বেঁধে রাখার প্রয়োজন নেই মায়ের। 'চরে খেতে শিখেছে, এবার চরেই খাক, বলেই জননী নিশ্চিন্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে বসেছেন।

তাই হাতড়ে বেড়াচ্ছি-কোনটা ভাল আর কোনটি মন্দ, কোনটা ভাল আর মন্দ, কোনটা পথ আর কোনটা বি-পথ। পথ দেখাবার, ভালোমন্দ চিনিয়ে দেবার ভার যাঁর উপর, সেই মা-ই নিশ্চিন্ত হয়ে মুখ ফিরিয়ে বসেছেন। সোজা পথ আর সোজা নেই, বেঁকতে বেঁকতে করাচীর হাব নদী পার হয়ে এত বড় মরুভূমিটা ডিঙিয়ে অঘোর নদীর কিনারায় গিয়ে শেষ হয়েছে।

নদীর নাম অঘোর।

সেই নদী পার হলেই মায়ের স্থানে। সেই নদীর এপারে সবই ঘোর সবই ভীষণ, সবাই বেহুঁশ সবাই অশান্ত। ওপারে শান্তিময়ী মায়ের স্থান। শান্তিময়ী জননী এপারে নেই-অঘোর নদীর ওপারে আছেন। সেই অঘোর নদীতে স্নান করে এপারের ধুলো ময়লা সব ধুয়ে ফেলে তবে মায়ের স্থানে গিয়ে উঠতে হবে।

কিন্তু এখনও অঘোর নদী বহুদূর।

পুব দিক ফর্সা হয়ে উঠেছে। পুবমুখোই চলেছি আমরা। বালির মধ্যেও চাষ আবাদ চলেছে। বেঁচে থাকার তাগিদে চেষ্টার ত্রুটি করছে না মানুষ। বালি সরিয়ে মাটি বার করছে। কুয়ো খুঁড়ে জল বার করছে। পায়জামা হাঁটুর উপর তুলে নিচু হয়ে কোদাল চালাচ্ছে। উট দিয়ে আর যাই ই হোক, লাঙল টানানো যায় না নিশ্চয়ই। একানে ওখানে চাষ তো চলেছে দেখছি–একজোড়া উটকে লাঙল টানতে দেখলাম না কোথাও। উট ত আর গোরু নয়, লাঙল টানলে উটের মর্যাদায় আঘাত লাগবে হয়তো।

লাঙল না টানুক, কিন্তু দুধ দেয়। কয়েক ঘর লোকের বসতির পাশে এক কুয়া। তার ধারে এক মস্ত বড় তেঁতুলগাছ। পরে অবশ্য বুঝেছিলাম ওগুলো তেঁতুলগাছ নয়, ঠিক তেঁতুলপাতার মতো ছোট ছোট পাতাওয়ালা আর এক জাতের গাছ। সেই গাছ তলায় থামা হল চা বানাবার জন্যে আর কলকে সাজাবার জন্যে। এক কলসি দুধ নিয়ে এক থুখড়ে বুড়ি উপস্থিত। এক কলসি উটের দুধ। দাম এক সের আটা। জলের মতো পাতলা দুধ। কেনা হয়ে গেল। কিন্তু তারপর? দুধ নেওয়া হবে কীসে? একটা কুঁজো খালি করে দুধ নেওয়া হল। সামনের আস্তানায় পৌঁছে জ্বাল দেওয়া হবে।

এধারের মানুষ কণ্টকগৃহে বাস করে না। করাত চালিয়ে কাঠ চিরে তাই দিয়ে ঘর বানিয়েছে। দেওয়ালে চাল কাঠ সব কাঠের তৈরি। কণ্টকগৃহ না হোক, আদর্শ জতুগৃহ বললে অন্যায় হবে না।

চাষ-আবাদ গৃহকর্ম করতে করতে অনেকেই গুলমহম্মদের সঙ্গে 'সালাম আলেকুম' সারতে লাগল। হেঁকে হেঁকে ওদের মধ্যে আলাপ করতে লাগল। কি বলছে ওরা? দিলমহম্মদ বুঝিয়ে দিল যে, ওরা প্রত্যেকেই আমাদের সবাইকে আজকে মতো এখানেই বিশ্রাম করতে সাদর আহ্বান জানাচ্ছে। তার হেতুটি কি তাও খুলে বললে রূপলাল।

"এত আদর-অভ্যর্থনা কেন জানেন তা-এখানে থেমে যদি আমরা রুটি পাকাই তো ব্যাটারা সকলের কাছ থেকে একখানা করে রুটি আদায় করবে। ব্যাটারা একেবারে ছিনে জোঁক। রুটির জন্যে এমন ঝামেলা জুড়বে তখন যে প্রাণ নিয়ে পালানো হবে দায়।"

হই চই করতে করতে চলছে সবাই। রাস্তা নেই কোথাও-কোথাও মাটি, কোথাও বালি, কোথাও কাঁটা, কোথাও কাদা। সব রকম উঁচু-নিচু খানাখন্দ সোজা পার হয়ে চলেছে উট। চষা জমি–তাই, তাই সই। জমির চারধারে কাঁটার বেড়া দিয়ে সীমানা নির্দেশ করা হয়েছে-কুছ পরোয়া নেই। সোজা চলল উর্বশীর মা, তার পিছন পিছন উর্বশীও। বেড়া ভেঙে রাস্তা করে চলেছে। তাদের পিছন পিছন আমরাও। কেউ কিছু বলেও না। আহা, কি দেশ! আর আমাদের ওখানে? চাষের পর আল থেকে খেতে নামলে কি আর রক্ষে আছে! একেবারে রামদা সড়কি লাঠি সব বেরুবে।

মানুষের বসতি চারিদিকে। মানুষের চেয়ে ঢের বেশি অবশ্য ছাগলের বসতি। ছাগল সর্বত্র-রাবণ-ছাগল। আমাদের দেশে যাদের আমরা রামছাগল বলি তাদের তিনগুণ বড়। সুতরাং এরা হচ্ছে রাবণ-ছাগল। এর এক জোড়ার কাঁধে লাঙল জুড়লে অনায়াসে চাষ করা চলে। পালে পালে রাবণ-ছাগলরা ঘুরে ঘুরে কাঁটাগাছের ঝোঁপ চিবোচ্ছে।

কুন্তী চিবোচ্ছে কুল-সুখলাল তার সহকারী। যেতে যেতে যে কুলগাছগুলো হাতের কাছে পড়ছে তা থেকে নিজেই দুহাতে ছিঁড়ে নিচ্ছে কুন্তী, আর দূরের গাছগুলো থেকে দৌড়ে গিয়ে ছিঁড়ে আনছে সুখলাল। একলা কুন্তী নয়, আরও অনেকের মুখ নড়ছে। শ্রাবণ-ভাদ্র মাসে এখানে কুল ফলে। একটায় এক কামড় দিয়ে দেখলাম-না টক, না মিষ্টি–শুধু কষাটে। উটের উপর থেকে ভৈরবী ওদের ধমক দিলেন। অত কাঁচা কুল খেলে পেট কামড়ে মরবে যে। তৎক্ষণাৎ দিলমহম্মদ সে কথার প্রতিবাদ করলে, "না-বহুত হজমি জিনিস। এ ফল খেলে বোখারা পর্যন্ত ছুটে যায়।" কাজেই কুল চিবানো চলতেই লাগলো।

কিন্তু আরও আগে আরও ভাল ফল পাওয়া গেল। সাদা সাদা ফুটি। দশ-বারোটি কিশোর কিশোরী ছুটতে ছুটতে এসে উপস্থিত। তাদের প্রত্যেকের হাতে দুটি তিনটি করে ওই

ফল। সব কটি কিনতে হবে। প্রায় আধ ক্রোশ দূর থেকে ছুটে আসছে তারা। গুলমহম্মদ দেখিয়ে দিলে, ওই যে ডানধারে উঁচু বালির পাহাড়টা দেখা যাচ্ছে ওটার ওধারে নেমে গেলে এদের গ্রাম পাওয়া যাবে। সেখান থেকেই আসছে ওরা ওই ফল নিয়ে। কি করে সংবাদ পৌঁছল ওদের কাছে যে, একদল হিংলাজ-যাত্রী আসছে? নিশ্চয়ই কেউ ওই বালির টিলার উপর থেকে আমাদের দেখতে পেয়েছে। আমরা তো আর ওদের গ্রামের পাশ দিয়ে যাব না- কাজেই আধ ক্রোশ ছুটতে ছুটতে এসে ওরা আমাদের পাকড়াও করেছে।

তখন দরদস্তুর করা চলতে লাগল। চলতে চলতেই অবশ্য চলতে লাগল দরদস্তুর করা। আরও মাইল খানেক পথ তারা এল আমাদের সঙ্গে সঙ্গে। মাল গছাতে গেলে আসতেই হবে। কারণ, আমরা তো আর থামব না। তারা যা চায় আমরা তা বুঝতে পারি না। তাদের হিসেব খুব সোজা-সবাইকে এক আনা করে দাও তাহলেই সকলে মাল দিয়ে ফিরে যাবে। কিন্তু আমরা এত সহজে মাল কিনি না। কুন্তী দর করছে। ছোটগুলো এক পয়সা করে, বড়গুলো দু-পয়সা করে আর তার চেয়ে যে-কটা বড় তার দাম তিন পয়সা। কিন্তু তাতে হচ্ছে মহা গণ্ডগোল, মানে বিক্রেতারা সবাই সমান পাচ্ছে না। দুটি ছোট ফল যে এনেছে সে পাচ্ছে মাত্র দু-পয়সা আর যে এনেছে দুটো বড় ফল সে পাচ্ছে ছ-পয়সা। কাজেই ওদের মুখ আরও লাল হয়ে উঠছে। আরও বেশ করে মাথার সোনালি চুল দু-হাতে চুলকোতে লাগল ওরা। শেষ পর্যন্ত ওদের মধ্যে চার-পাঁচটি মেয়ে কুন্তীর কাপড় টেনে ধরল। একটা নিষ্পত্তি না হলে আর পা বাড়াতে দেবে না।

তখন পোপটভাই এগিয়ে গিয়ে মধ্যস্থতা করে দিলেন। ওদের প্রত্যেককে এক আনা করে দিয়ে কিছুতেই আমরা কিনব না তাদের মাল। আমাদের হিসেব আরও সোজা। আমরা সবাই এক আনা করে দেব। ইচ্ছে হয় ওদের মাল দিক, আর না-হয় আবার দৌড়াক এই এক ক্রোশ পথ ওদের মাল নিয়ে।

কিন্তু তাতে বাধল আরও ফ্যাসাদ। আমাদের সবাই-এর কাছ থেকে এক আনা করে নিয়ে হল মোট চৌত্রিশ আনা। কিন্তু ওরা হচ্ছে তেরোজন। পোপটভাই চৌত্রিশ আনা ওদের একজনের হাতে দিতে গেলে তা সে কিছুতেই নেবে না। সবাই-এর হাতে সমান করে ভাগ করে দাও। সহজে কিছুতেই কোনো মীমাংসা হয় না। ওরা কুন্তীকে প্রাণপণে বোঝবার চেষ্টা করছে, এর চেয়ে ঢের সোজা সবাই-এর হাতে এক আনা করে দেওয়া। কুন্তীর কাপড় ধরে টানাটানি করছে। শেষে সুন্দরলাল আরও পাঁচ আনা দিলেন। তখন কুন্তী তিন আনা করে ভাগ করে দিয়ে তবে ছাড়া পেল। হাতের ফলগুলো কুন্তীর সামনে ফেলে চক্ষের নিমেষে তারা অদৃশ্য হয়ে গেল। ওদের বোকামি দেখে তো সুখলাল হেসে লুটোপুটি!

দিলমহম্মদ বললে "ফেরবার সময় আমরা ওদের গ্রামের ওপাশ দিয়ে ফিরব। তখন আবার ওরা এসে পাকড়াও করবে।"

সুন্দরলাল বললেন-"সে সময় আমরা এক রাত ওদের সঙ্গে থাকব।"

ভৈরবী আর পোপটভাই একবাক্যে সুন্দরলালকে সমর্থন করলেন। ছেলেমেয়েগুলিকে দেখে ওদের নেশা চড়ে গেছে। অমন রূপ, অমন স্বাস্থ্য, সোনালি চুল, টকটকে মুখ আর কটা-কটা চোখ, আর সেই চোখের দৃষ্টিতে মরুভূমির সরলতা-সব কিছু একসঙ্গে করলে যা হয় তা আমরা আমাদের সভ্য জগতের শহুরে ছেলেমেয়েদের কাছে পাই না। তেরো আনার চেয়ে চৌত্রিশ আনা ঢের বেশি এ তারা হামাগুড়ি দিতে-দিতেই শেখে। শিখে যখন পায়ে হেঁটে চলতে আরম্ভ করে, তখন তের আনার ঢের কম, মাত্র সাত আনা হাতে পেলেই দুপুরবেলা সিনেমার সামনে গিয়ে লাইনে দাঁড়ায়

এতক্ষণ আমরা গাছপালা ঝোঁপজঙ্গলের ভিতর দিয়ে চলছিলাম। এবার আবার ফাঁকায় বেরিয়ে এলাম, আরম্ভ হল মাঠ। বীরভূমের সব চেয়ে বড় মাঠ যেগুলি, পাঁচ ক্রোশ জমি ভাঙলে যে সব মাঠ পার হয়ে ওপারের গ্রামে গিয়ে ওঠা যায় সেই রকমের সব মাঠ। শুধু বালি আর বালি। মস্ত বড় বড় ঢেউ তুলেছে সেই বালির সমুদ্র। একটা ঢেউ-এর মাথায় উঠে গুলমহম্মদ দেখালেন-ওই যে ওই কালো-মতো এতটুকু দেখা যাচ্ছে, ওই বস্তিতে গিয়ে উঠব

আমরা। ওখানে পৌঁছেই আজকের মতো বিরতি। তার মানে এই মাঠখানা ভাঙতে আরও আধঘণ্টা চারেকের ধাক্কা। তা হোক, আজ আর কারও দেহে-মনে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি নেই শ্রান্তি নেই। সবাই-এর মুখ জ্বলজ্বল করছে। সবাইকে মাতিয়ে নিয়ে চলেছে একলা কুন্তী। গোমড়ামুখো গোকুলদাসও মাঝে মাঝে সবাই এর সঙ্গে হাস্যপরিহাসে যোগ দিচ্ছে। অন্যদিন কুন্তী ভৈরবীর উটের পাশে হাঁটে। আজ ভোর থেকেই সে চলেছে দলের সঙ্গে অনেক আগে হই-চই করতে করতে। তার হাঁটাচলা কথাবার্তা হাস্যপরিহাস সব কিছুই সহজ সরল এবং স্বাভাবিক। অনেক পিছন থেকে দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললাম।

তবু একবার পিছন ফিরে চেয়ে দেখলাম সেই উঁচু কালির ঢেউটার মাথা থেকে নেমে যাবার আগে। চেয়ে রইলাম সেইদিকে-আকাশ যেখানে বালির সঙ্গে মিশেছে সেইখানটায়। কিছু দেখা গেল না। শুধু আকাশ আর বালি, বালি আর আকাশ ভিন্ন কিছুই চোখে পড়ল না। দশ-পনেরো ক্রোশ-হয়তো আরও বেশি—পিছনে ফেলে এসেছি সেই মস্ত বড় চ্যাপটা মাথা মাটির নৈবেদ্যটাকে, আর-আর তার পেটের মধ্যে তাকে যাকে আরও ক্রোশ আষ্টেক পিছনে এক পাহাড়ের মধ্যে দলসুদ্ধ আমরা সবাই ঢিল ছুঁড়ে ছুঁড়ে তাড়িয়েছিলাম। পা থেমে গেল, চোখ বুজে গেল, আচম্বিতে চোখে উপর ভেসে উঠল আকাশের দিকে উঁচু করা হাঁটু পর্যন্ত দুখানা পা। পা দুখানা থরথর করে কাঁপছে। কাঁপতে কাঁপতে তলিয়ে গেল কাদার মধ্যে।

দিলমহম্মদ হাত ধরে টান দিল। চোখ মেলে দেখলাম-উটের উপর থেকে ভৈরবী তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে চেয়ে আছেন আমার দিকে।

বললাম, “চোখে আবার কি পড়ল” বলে চোখ রগড়াতে রগড়াতে উর্বশীর পিছু পিছু নেমে গেলাম।

অনেকটা জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে বসা হয়েছে। বেশ একটা বড় ডোবার চারপাশে গাছের ছায়া। ভাগে ভাগে গাছগুলোর তলায় রান্না চাপানো হল। ডোবাটায় জল নেই, আছে শুধু বালি। জল আনা হল খানিকটা দূরে এক কুয়ো থেকে। কুয়াওয়ালা এসে লোক গুনে গেল। যতগুলো লোক ততখানা রুটি। আধ পোয়া ওজনের ভালো সেঁকা রুটি চাই। উটওয়ালারা দুজন আর পাণ্ডা দুজন এই চারজনের বাদ দিলে মোটমাট দাঁড়ায় ত্রিশখানা। একবার দু-বার তিনবার গুনলে সে আমাদের। তিনবার তিনরকম ফল বেরুল-আটাশ, ত্রিশ, তেত্রিশ। হাল ছেড়ে দিয়ে গুলমহম্মদের শরণাপন্ন হল। গুলমহম্মদ তখন খাঁটি কথা বললে। দলের দুজন মরে কমেছে, সুতরাং এখন রুটি পাবে মাত্র আটাশখানি। আদায়ের ভার গুলমহম্মদের উপর দিয়ে সে চলে গেল।

এল তার গিন্নী মুরগির আণ্ডা বেঁচতে। দিলমহম্মদ দশটা নিলে, নিয়ে বাপবেটা দুজনে কাঁচা সেগুলোকে খেয়ে ফেললে। দশটা মুরগির ডিমের মূল্য আরও চারখানা রুটি অথবা আধসের আটা, রুটি বানানো হলে চারখানা রুটিই দেবে এই বলে দিলমহম্মদ তাকে বিদেয় করলে।

কিন্তু রুটি সেদিন তাদের ভাগ্যে জুটল না। জুটল কয়েক মুঠো ভাত। অন্যদিন রুটি বানিয়ে দেয় কুন্তী। সে বেঁকে বসল। আর সে আমাদের সঙ্গে সে খাবে না, আমাদের জিনিসপত্র সে ছোঁবে না, সে ভিক্ষা করবে সকলের কাছে এক এক টুকরো রুটি। কতটুকুই বা তার প্রয়োজন। জনকতক তাদের রুটি থেকে একটুকরো করে ছিঁড়ে দিলেই তার দিন চলে যাবে।

অন্যদিনের মতো ভৈরবী নিশ্চিন্তে স্নান করে এসে চাদর মুড়ি দিয়ে জপে বসলেন। তিনি জানেন কুন্তীই রান্নাবান্না করবে, সুখলাল করবে তাকে সাহায্য। উটওয়ালার দু জন আর আমরা চারজন একসঙ্গে খাব। জপ থেকে উঠে তিনি দেখলেন—উনুন জ্বলেনি, রান্না চড়েনি। ওই ওধারের এক গাছতলায় কুন্তী শুয়ে আছে একলা-আর সুখলাল তার দাদার সঙ্গে কাছের বস্তিতে গেছে বেড়াতে।

তাড়াতাড়ি তিনি গেলেন কুন্তীকে দেখতে। আবার অসুখ-বিসুখ হল না তো? কুন্তীর কাছে গিয়ে তার গায়ে-মাথায় হাত দিলেন। কই! কিছুই হয়নি তো। ডাকাডাকিতে কুন্তী চোখ

মেলে উঠে বসল, আর জানাল যে, সে আর আমাদের সঙ্গে খাবে না, আমাদের জিনিসপত্র ছোঁবে না, সকলের কাছ থেকে ভিক্ষা করে নেবে তার রুটি। সকলের উচ্ছিষ্ট খেয়েই তার দিন চলে যাবে।

রাগে অভিমানে ক্ষোভে ভৈরবীর বাকরোধ হয়ে গেল। তিনি খানিকক্ষণ ওর হাত ধরে ওর মুখের দিকে চেয়ে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন-তারপর ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন। তবুও কুন্তীর মন গলল না। সে কিছুতেই উঠে এল না। তখন চোখ মুছতে মুছতে ফিরে এসে ভৈরবী আমাকে জানালেন ব্যাপারটা। বললেন

"এই জন্যে আজ দশ-দশটা দিন আর রাত ওকে বুক দিয়ে আগলাচ্ছি, এই জন্যে দু'হাতে ওর গা থেকে রক্ত ধুয়ে দিয়েছি, এই জন্যে নিজের মুখের গ্রাস ওকে খাওয়াচ্ছি! এত বড় বেইমান যে সব ভুলে গেল!"

কি বলব? আর বলবারই বা আছে কি? কুন্তীর উপর জোর খাটাবার কোন অধিকার আছে আমাদের? জোর করতে গেলে উল্টো উৎপত্তি হবে, একবার তা হয়েও ছিল। শেরদিলের আড্ডায় কুন্তীকে থিরুমলের জন্যে রেখে আসতে চেয়েছিলাম বলে এতগুলি হিন্দু সন্তানের মুখপাত্র হয়ে রূপলাল চোখ রাঙিয়ে দাঁড়িয়েছিল। কুন্তী তো শুধু আমার উপর নির্ভর করে যাচ্ছে না। সব কটি হিন্দু সন্তানের উপর নির্ভর করে সে যাচ্ছে। দলসুদ্ধ সব কটি হিন্দু সন্তানই তার অভিভাবক। সুতরাং চুপ করে রইলাম।

ভৈরবী কাঁদতে কাঁদকে ভাত চড়াতে গেলেন। গুলমহম্মদ দিলমহম্মদ সুখলাল সবাই ভাতই খেল। ভৈরবীও খেতে বসলেন। কিন্তু চোখের জলে ভাতে মিশে এমন একাকার হয়ে গেল, সে ভাত আর তাঁর গলা দিয়ে নামল না। দূর থেকে লক্ষ করলাম, কুন্তী, দু-তিন জনের কাছ থেকে দু-তিনখানা রুটি ভিক্ষে করে নিলে, কিন্তু কখন খেলে তা আর দেখতে পেলাম না।

রাতের আঁধার আগেই ঢুকে পড়ল গাছতলায়। বহুদিন পরে কুকুরের ঘেউ ঘেউ কানে এল। কাছাকাছি মানুষের বাস আছে। এখান থেকেই খুব কাছে গুলমহম্মদের বাড়ি, এক রাতের ভিতর যাওয়া-আসা যায়। কিন্তু ওরা আর সে কথা তুলতে সাহস পেল না। আমিই বুড়োকে কাছে ডেকে বললাম, ফেরবার পথে আমাদের সবাইকে তার বাড়ি নিয়ে যেতে হবে। বুড়ো বারকতক "আলবত" আর "জরুর" বলে মাথা নাড়লে।

শুয়ে পড়লাম সবাই। কুন্তী তার শাড়ির আঁচল পেতে শুয়ে রইল ওধারের গাছতলায়। বুড়ো গুলমহম্মদ গিয়ে তাকে বোঝাবার চেষ্টা করলে যে, একলা ওভাবে শোওয়া উচিত নয়, উঠে গিয়ে মাইজির কাছে শুয়ে ঘুমাও। কুন্তী উত্তরও দিলে না। চোখ বুজে পড়ে রইল।

চাদর মুড়ি দিয়ে আমিও পড়ে রইলাম। মাথার কাছে ভৈরবী শুলেন সুখলালকে নিয়ে। অনেকক্ষণ ফোঁস ফোঁস শব্দ শুনতে পেলাম তাঁর চাদরের ভিতর থেকে, তারপর আস্তে আস্তে তাঁর নাক-ডাকা আরম্ভ হল। দু দিন দু রাত পরে তিনি ঘুমোলেন।

ভয়ানক হাসি পেতে লাগল। অনর্থক ভৈরবী দুঃখভোগ করছেন। যেচে মান আর কেঁদে সোহাগ আদায় করা যায় না, উল্টে গাল বাড়িয়ে চড় খেতে হয়। ভালবাসার মর্মান্তিক বিয়োগান্ত একটা দিক আছে। তা হচ্ছে-যাকে নিজের গরজে ভালোবাসলাম তার কাছ থেকেও ভালোবাসার আশা করা। সে আমার মনের মতো হয়ে চলুক, একমাত্র আমার উপরই নির্ভর করুক, আমাকে ছাড়া সে যেন অন্য কিছু না জানে, এই রকমের সব দুরাশা মনে মনে পোষণ করলে তার অনিবার্য ফল হাতে হাতে পেতেই হবে। তখন চোখের জলে নাকের জলে ভাসতে ভাসতে মাথা খোঁড়া আর চুল ছেঁড়া ভিন্ন গত্যন্তর নেই।

ভাবতে ভাবতে কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুম ভাঙল কিল-চড়-ঘুষো এই সমস্তর শব্দে। তার সঙ্গে চাপা গলায় শাসন- "খবরদার, টু শব্দটি করেছিস একেবারে মেরে ফেলব!" ডোবটার ওপারে ঘটছে ব্যাপারটা। দিলমহম্মদের গলার আওয়াজ পেলাম। সবাই চুপি চুপি কাজ সারছে। আর একজনের গলাও কানে এল, "যদি এতটুকু জানতে পারেন স্বামীজি মহারাজ, তাহলে তোকে এখানে পুঁতে ফেলব বালির মধ্যে" আবার গোটাকতক কিল-চড়-

ঘুষোর শব্দ কানে এল।-কি ব্যাপার!

চাদরটা মুখের উপর থেকে সামান্য সরিয়ে নজর করে দেখবার চেষ্টা করলাম। একটা গাছের আড়াল পড়ায় কিছুই দেখা গেল না। কিন্তু আবার কানে এল দিলমহম্মদের চাপা গলার আওয়াজ। সে হুকুম করলে, "যাও, এখনি গিয়ে শুয়ে পড়ো মাইজির কাছে।" আবার গোটাকতক চড় থাপ্পড়ের শব্দ কানে এল। এবার শুনতে পেলাম পোপটলালের গলা-"যা ব্যাটা, মুখ বুজে শুয়ে থাক গে যা। খুব সাবধান, সাধু মহারাজের এখন মাথার ঠিক নেই, এ সময়ে যদি তিনি এসব কথা শুনতে পান, তবে আবার অসুস্থ হয়ে পড়বেন।"

অন্ধকারে মধ্যে চেয়ে দেখলাম, ডোবার ওধার দিয়ে ঘুরে কে আসছে এদিকে। যে এল সে ভৈরবীর ও-পাশে হাঁটুতে মুখ গুঁজে বসে রইল। ওধারের কথাবার্তা চড় চাপড়ে আওয়াজ থেমে গেল। কান খাড়া করে শুয়ে রইলাম, শেষে শোনা গেল শোঁ শোঁ শব্দ। বড় কলকেয় টান দেওয়া হচ্ছে।

টান টান হয়ে মড়ার মতো পড়ে রইলাম। কি দরকার আমার জানবার কি ঘটে গেল ওখানে। যে ব্যাপার এত যত্ন করে আমার কাছে লুকোবার চেষ্টা করা হচ্ছে তা না-জানাই না হয় রইল আমার। সহযাত্রীরাও মানুষ, পাছে আমার মনের শান্তি নষ্ট হয় এই জন্যে ওরা এত সচেষ্ট। ওদের বুদ্ধি-বিবেচনা আর আমার ওপর ভক্তিশ্রদ্ধার পূর্ণ মর্যাদা দিতে গেলে আমি কিছুই জানতে পারিনি এইটুকুই দেখানো উচিত। বড় যে সে চিরকালই বড় থাকতে পারে যদি না সব ব্যাপারে নাক গলাবার চেষ্টা করে। অনকে সময় দেখেও না দেখা, জেনেও না জানা, এই দুটি মিথ্যা ভান সংসারে বহু অশান্তির হাত থেকে রেহাই দেয়।

পরদিন বেশ বেলায় গুম ভাঙল কুন্তীর ডাকাডাকিতে। চোখ চেয়ে দেখলাম কে গেলাস চা হাতে নিয়ে সে দাঁড়িয়ে আছে। এত সকালেই সে স্নান করে ফেলেছে। ভিজে চুলে আর ভিজে চোখে তার মুখ বর্ষণমুখর বলে মনে হচ্ছে। একবার মাত্র তার মুখের দিকে চেয়ে গেলাসটা হাতে নিলাম। একটিও কথা বললাম না তাকে, পাছে তার জোর করে আটকে রাখা চোখের জল বাঁধ ভেঙে ছোটে।

চায়ের গেলাসটা হাতে করে উঠে গেলাম ডোবার ওধারে। সবাই উঠে পড়েছে। বড় কলকেয় আগুন চড়েছে। সকলকেই দেখতে গেলাম, শুধু একজন তখনও চাদর মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। কে ও? এখনও শুয়ে কেন?

রূপলাল একান্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে জবাব দিলে-"ও হচ্ছে লম্বুষ গোকুলদাস। কাল রাত্রে অন্ধকারে গাছের ডালের সঙ্গে ওর মুখের ধাক্কা লাগে। উঁচু তো কম নয়। মাথা হেঁট না করে অন্ধকারে চলাফেরা করবার ফল। মুখ একেবারে থেঁতলে গেছে ব্যাটার। তাই চাদর মুড়ি দিয়ে পড়ে আছে।"

আর সকলের মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম। কেউই আমার দিকে চোখ তুলে চায় না। পোপটলাল আকাশের দিকে চেয়ে আধখানা সিঁড়িতে কষে টান দিচ্ছেন। গুলমহম্মদ যথারীতি পাগড়ির মধ্যে আঙুল চালিয়ে উকুন খুঁচছে। দিলমহম্মদ একটা গাছের ডাল নিয়ে তার উপর টাঙি দিয়ে সূক্ষ্ম কারুকার্য করতে ব্যস্ত।

আর দাঁড়ালাম না। রূপলালকে বললাম- "যাও ওখানে গুলমহম্মদকে নিয়ে চা খেয়ে এসো তোমরা।" বলে চলে গেলাম কুয়োর ধারে।

কথা ছিল আজ ভোরবেলা যাত্রা আরম্ভ হবে, কিন্তু তা হল না। সেখান থেকে আমরা উঠলাম দিনের অর্ধেকটা পার করে। খাওয়া-দাওয়ায় দেরি হয়ে গেল। কুন্তী আমাদের সঙ্গেই খেল, কাজকর্মও সব করলে। ভৈরবীর মনে আর কোনো দুঃখ নেই। কারও মনেই কিছুই নেই। আগের মতোই সব ঠিক চলছে। তবে গোকুলদাস অত্যধিক লম্বা মানুষ বলে গাছের ডালের সঙ্গে অন্ধকারে ঠোক্কর খেয়ে মুখ ঢেকে বেড়াচ্ছে। লোকে গায়ে ঠোক্কর খায়, গোকুলদাস খেয়েছে মুখে। ওই একই কথা। কিন্তু অতগুলো গাছের ডাল কি পর পর ঝুলে আছে কোথাও? গোকুলদাসের মুখের দিকে চেয়ে মনে হল, অন্তত পনেরো-বিশ বার ঠোক্কর না খেলে তার সারা মুখখানা অমনভাবে ফুলে কালশিটে পড়ে যেত না। কিন্তু গোকুলদাসকে

তো কিছু জিজ্ঞাসা করা যায় না। সে সবাইকে এড়িয়ে ঘোমটা টেনে চলেছে একা একা নিজের কুঁজো নিয়ে। কি জানি কেন তার একান্ত অনুগত চিরঞ্জীও আজ তাকে এড়িয়ে চলেছে।

সেই কথাই হচ্ছিল পোপটলালের সঙ্গে। বললাম, "পোপটভাই, আমি থাকলে অতগুলো ঠোক্কর কিছুতেই খেতে দিতাম না গোকুলদাসকে, ওর উঁচু মাথা নিচু করিয়ে মুখখানা বাঁচিয়ে দিতাম। মানুষেই ভুল করে, অন্যায় করে, পাপ করে, আবার মানুষেই এই দুনিয়ায় কত ভালো কাজ করছে। কিন্তু ভুল অন্যায় বা পাপ করলেই যদি সেই মানুষটাকে খতম করে দেওয়া হয়, তবে দুনিয়ার ভালো ভালো কাজগুলো করবার জন্যে শেষে যে আর একজনকেও খুঁজে পাওয়া যাবে না।"

মিনিটখানেক পোপটলাল আমার মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন। তারপর একটা ঢোক গিলে বললেন- "ও ব্যাটার কথা ছেড়ে দিন। ও একটা আস্ত জানোয়ার। নিজের কর্মফল হাতে হাতে পেয়েছে, বেশ হয়েছে।"

বললাম, "তাদের ভাগ্য ভালো যারা হাতে হাতে কর্মফল পায় না। তা যদি সবাই পেত তবে গোকুলদাসের মতো জানোয়ারকে কর্মফল দেবার জন্যে একখানা হাতও খুঁজে পাওয়া যেত না।"

পোপটলাল কিছুক্ষণ নির্নিমেষ নেত্রে চেয়ে রইলেন আমার মুখের দিকে। তারপর ভেবেচিন্তে জবাব দিলেন, "কিন্তু হাতে হাতে ফল পেলে একটা কাজ হয়, যখন তখন ভেবেচিন্তে যেখানে সেখানে হ্যাংলামো করবার দুঃসাহস থাকে না।"

হেসে ফেললাম। তারপর একটি বিড়ি দিলাম পোপটভাইকে। দুজনের বিড়ি ধরানো জলে ধোঁয়া ছেড়ে বললাম, "ঠিক বলেছেন-যখন-তখন যেখানে সেখানে দুঃসাহসিক কিছু যদি কেউ না দেখায় তাহলেই হল। আর একেবারে কস্মিনকালে কোথাও যাদের কোনো কিছু করবার সাহস নেই তাদের তো আমরা মাথায় তুলে নাচি। লোকলজ্জা সমাজ পুলিশ আইনকানুন পাপ-পুণ্যের জ্ঞান আর সব চেয়ে মারাত্মক যেটি, ঠোক্কর খেয়ে হাড় গুঁড়ো হবার ভয়-এই এতগুলো শক্ত লাগাম কষে টেনে ধরে যে ভাগ্যবান তার ছ-ঘোড়ার রথখানাকে ওপারে নিয়ে পৌঁছতে পারল, তাকেই আমরা বাহবা দিই। তখন তার একটা সাদা পাথরের মূর্তি গড়িয়ে চৌরাস্তার মোড়ে বসিয়ে সেই পাথরের মানুষের গলায় ফুলের মালা ঝোলাই। কিন্তু যতকাল সে ছিল রক্তমাংসের গড়া মানুষ, ততক্ষণ বিন্দুমাত্র সহানুভূতি তাকে দেখাই না। আহা, বেচারা অতগুলো লাগাম টানতে টানতে আজীবন দগ্ধে ম'লো, এ কথা একবারও আমাদের মুখ দিয়ে বেরোয় না। বরং একটিবারের জন্যেও যদি তার হাতের মুঠি শিথিল হয় তাহলে আর রক্ষে নেই। ঠোক্কর মারতে মারতে তার অবস্থা এমন করে ছাড়ি যে, তখন বেচারির নিজের পায়ে খাড়া হবারই সামর্থ্য থাকে না ত সে বাগিয়ে লাগাম টানবে কি করে!"

পোপটভাই মাথা নিচু করে হাঁটতে লাগলেন। অনেকক্ষণ পরে তিনি বললেন, "ঠিক তাই, সাহস দুঃসাহস এর একটাও যে সারাজীবনে দেখাল না সে-ই হয়তো সব চেয়ে সাংঘাতিক পাপী। শুধু মৃত্যু পর্যন্ত ভিতরে ভিতরে জ্বলে পুড়ে ম'লো।"

বললাম, "আবার এমন অনেকে রয়েছেন যে সারাজীবন হেসে-খেলে কাটিয়ে গেলেন। তাঁদের কিছুতেই লকলকে জিব দিয়ে লাল গড়াল না। সাহস দুঃসাহস এসব কোনো কিছুই দেখবার তাঁদের দরকারই হল না।"

পোপটলালের কপালের পাঁচ-পাঁচটা রেখা পরস্পর জড়িয়ে গেল। তাঁর ডাগর চোখ দুটো কুঁচকে এতটুকু হয়ে গেল। তিনি হঠাৎ ঘুরে দাঁড়িয়ে আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন-"কিন্তু তাঁদের চেনা যায় কি করে? দেখছেন তেমন একজনকে যাঁর ওই বিষের জ্বালা নেই?"

বিড়িতে শেষ টানটা দিয়ে বললাম, "দেখেছি প্যাটেল, তেমন লোক অনেক আমার চোখে পড়েছে। শুধু ঐ হ্যাংলামো ব্যাধিটিই যে তাঁদেরই নেই তা নয়, তাঁদের রাগদ্বেষও নেই। নিজে যা করতে পারছি না অপরে তা করে ফেললে তাঁরা হিংসেয় খেপে ওঠেন না।

উল্টে দুঃখে তাঁদের চোখ দিয়ে জল গড়ায়। 'আহা রে, ও বেচারা নিজেকে সামলাতে পারলে না', এই ভেবে তাঁরা তখন তাঁকে সাহস দিয়ে অভয় দিয়ে বললেন-"ভাই, ঘাবড়ে যাসনে, চেষ্টা কর, আরও চেষ্টা কর—একদিন তুই ওই হ্যাংলাপনা ব্যাধিটা থেকে মুক্তি নিশ্চয়ই পাবি।' তখন সেই হতভাগাকে ঘুষিয়ে কিলিয়ে থেঁতো না করে তার হাতে ধরে তাকে পাঁকের ভিতর থেকে টেনে তোলেন তাঁরা। নিজেরা ব্যাধিমুক্ত, তাই তাঁরা অপরকেও ব্যাধিমুক্ত করতে পারেন।'

পোপটলাল আবার ঘাড় হেঁট করে কি ভাবতে লাগলেন। উটের উপর থেকে ভৈরবী চেঁচিয়ে বললেন-"আবার পাহাড় দেখা যাচ্ছে!"

আবার পাহাড়! শুনেই মনটা কেমন হয়ে গেল। চারিদিকে নজর করে দেখলাম কুন্তী কোথায়। ওই যে চলেছে সুখলালের সঙ্গে। আঁচল জড়িয়ে নিয়েছে কোমরে। মাথায় ঘোমটা নেই। পিঠের উপর পড়ে আছে লম্বা বেণী। রংচঙে জামাটা গায়ে দিয়েছে, পরেছে ওর ছাপানো শাড়িখানা। পিছন থেকে ওদের দুজনকে দেখে মনে হল দুটি ভাইবোন-নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক দুটি স্কুলের ছেলেমেয়ে আপন মনে গল্প করতে করতে আর কি চিবোতে চিবোতে চলেছে।

ভৈরবী উপর থেকেই চেঁচিয়ে ধমকাচ্ছেন ওদের-"আর খাসনে ওগুলো হজম হবে না। যেমন হয়েছে ছেলেটা তেমনি মেয়েটা-একটাও যদি কথা শোনে!"

তাঁর গলার আওয়াজ শুনে মনে হল ওরা যে তাঁর বারণ শুনছে না এতেই তিনি খুশি। ওরা ফিরেও চাইলে না। সুখলালের পকেটে হাত ঢুকিয়ে কুন্তী আবার কি বার করে নিলে।

রূপলাল আরও সামনে থেকে চেঁচিয়ে বললে-"আমাদের বোন নেই, সেজন্যে আমাদের মা-বাপের দুঃখের অন্ত নেই। ভেবেছিলাম ফিরে গিয়ে মা'র কাছে বলব, "এই দেখো মা, একটা বোন নিয়ে এসেছি এবার হিংলাজ থেকে, কিন্তু দেখছি তা আর হবে না। কাঁচা কুল খাইয়ে খাইয়ে সুখলাল বোনটাকে মেরে ফেলবে।"

সুখলাল তৎক্ষণাৎ তীব্র প্রতিবাদ করলে, 'কুল নয়, আখরোট।" মণিরাম, সুন্দরলাল, আরও পাঁচ-সাতজন একসঙ্গে গোলমাল করে উঠল-'কুন্তী বহিন-তুমি একলা তোমার ছোট ভাইটিকে নিয়ে আখরোট খাচ্ছ আর আমরা কি তোমার ভাই নই? আমাদের কথা ভুলে গেলে কি করে?"

পোপটভাই বললেন- "যে বহিন ভাইদের না দিয়ে খায় তাদের কি বলে?" সবাই হই হই করে একসঙ্গে কি বললে বোঝা গেল না।

কুন্তী দৌড়ে ফিরে এল ভৈরবীর উটের পাশে। বললে, দাও তো মা ঝোলাটা নামিয়ে। ভাইদের না দিলে ওরা আমাকেই চিবিয়ে খেয়ে ফেলবে যে।"

ভৈরবী ঝোলাটা নামিয়ে দিলেন। দিলমহম্মদ সেটা ধরে নিয়ে কুন্তীর হাতে দিয়েই নিজে হাত পেতে দাঁড়াল। তার হাতে একমুঠো দিয়ে কুন্তী ছুটল সামনে, তার সব ভাই-কটিকে ভাগ করে দিতে।

বেশ খানিকটা সামনে দৌড়ে গিয়ে তবে কুন্তী তার ভাইদের পাকড়াও করলে। তারপর ওরা কাড়াকাড়ি করে কুন্তীর কাছ থেকে আখরোট বাদাম নিয়ে খেতে খেতে চলল। পিছন থেকে দেখলাম অতগুলো ভাই-এর একটিমাত্র বোন হওয়া সহজ কথা নয়-অতগুলো ভাই-এর আবদার অত্যাচার হাসিমুখে সহ্য করতে হয়। তা কুন্তী সে কাজটি সুশৃঙ্খলে করছে। কাউকে ধমকে, কাউকে চোখ রাঙিয়ে, কারও হাতের উপর চড় মেরে সবাইকে শান্ত করছে। দেখতে দেখতে কেন জানি না আমার দু-চোখ জলে ভার উঠল। ওদের হাসি ওদের ঝগড়া পিছনে ভেসে এসে কানে ঢুকছে আর ভাবছি অনেকগুলো বছর পিছনে ফেলে আসা দিনগুলির কথা। না, আর একবার এ জীবনে কারও ভাই হবার যোগ্যতা একেবারে হারিয়েছি। বাবা, স্বামীজি মহারাজ, এই পদবীগুলি পাবার লোভে সে যোগ্যতা অনেকদিন আগে বলিদান দিয়ে এসেছি। এখন লোকে ভয় করে, ভক্তি করে, হয়তো সম্মানও করে, কিন্তু ভাই বলে কেউ আর ভালোবাসতে সাহস করে না।"

ভৈবরী বললেন-"এইভাবে হেসে-খেলে মেয়েটা করাচী পর্যন্ত গিয়ে পৌঁছায় তো বাঁচি।"

বললাম– "কেন? আমরা কাকেও সঙ্গে করে আনিনি, কারও দায়-দায়িত্ব নেই আমাদের কাঁধে। করাচী আমরা দু-জনই ফিরে যাব। যা হয় হোক ওর "

ভৈবরী মুখঝামটা দিয়ে উঠলেন, "থামুন তো! অমন অলুক্ষণে কথা মুখে আনবেন না।"

সুতরাং মুখ বন্ধ করে একটি বিড়ি ধরালাম।

সূর্যদেব অস্তাচলে বিশ্রাম নিতে গেলেন। পাঁচদিন আগে সে সূর্যদেব আসতেন যেতেন, এ তিনি নন। আজ আর কাল যে সূর্যদেবের সঙ্গে আমাদের পরিচয় হল, ইনি যেমন ভদ্র তেমনি নিরীহ। এঁকে "আবার এসো" বলতে সাহস হয়। ইনি হলেন সেই বাবু-শ্রেণীর সূর্যিঠাকুর যিনি হুগলী চব্বিশ পরগনা নদীয়া জেলাগুলির উপর ঘোরাফেরা করেন।

আরও ঘণ্টাখানেক পরে অনেকগুলো কুকুর ঘেউ ঘেউ করে তেড়ে এল। আবার ঘেউ ঘেউ করতে করতে ফিরেও চলল আমাদের সঙ্গে। তারপর "সালাম আলেকুম" আর "আলেকুম সালাম" কানে এল। মানে গুলমহম্মদ উর্বশীর মায়ের নাকের দড়ি ধরে ঠিক জায়গায় পৌঁছে গেছে। অন্ধকারের ভিতর চলতে চলতে আমরাও এসে দাঁড়ালাম এক গৃহস্থের উঠানে। গৃহকর্তা অন্ধকারের মধ্যেই সকলকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন, অনেকের সঙ্গে হাতে হাত মেলালেন। সেই উঠানেই আমরা কম্বল পাতলাম।

কাল সকালে আমরা চলে যাব অঘোর নদীর পারে। এখান থেকে ঘণ্টা তিনেকের পথ। কিন্তু উট আর যাবে না। উট এখানেই থাকবে মালপত্র সমেত। এর আগে উট নিয়ে যাবার হুকুম নেই সরকারের। হিংলাজ দর্শন করে এখানে ফিরে এসে তবে আবার মালপত্র উট, কুঁজো সব পাওয়া যাবে। মা হিংলাজের পূজার উপাচার আর সেখানে নিজেদের পরবার জন্যে একখানা করে নতুন কাপড় সঙ্গে যাবে। তবে ইচ্ছে করলে একদিনের খাওয়ার মতো আটাও নেওয়া যায় সঙ্গে। কে নেবে? কেউ নিলে না কিছু। সারা দিনরাত নিরম্বু উপোস করে ভোররাতে ব্রাহ্মমুহূর্তে মাতৃদর্শন। তারপর মায়ের প্রসাদ মুখে দিয়ে এখানে ফিরে আসতে বেলা বারোটাও বাজবে না। সুতরাং কে আবার আটা বয়ে নিয়ে যাবে মায়ের স্থানে!

সে রাত্রেও আমাদের আর রান্না করতে হল না। শেঠ সুন্দরলাল নিমন্ত্রণ করলেন আমাদের ছ-জনকে।

মায়ের স্থানে নিয়ে যাবার পূজা-উপাচার গুছিয়ে রেখে সুন্দরলালের ডালরুটি আর চাটনি খেয়ে যখন শুলাম, তখন মাথার মধ্যে গুনগুন করে যে গানের সুরটি বাজতে লাগল তা হচ্ছে এই

"দুঃস্বপন কোথা হতে এসে
জীবনে বাধায় গণ্ডগোল,
কেঁদে উঠে জেগে দেখি শেষে–
কিছু নাই, আছে মা'র কোল
ভেবেছিনু আর কেহ বুঝি,
ভয়ে তাই প্রাণপণে যুঝি,
তবে হাসি দেখে আজ বুঝি
তুমিই দিয়েছ মোরো দোল।
এ জীবন সদা দেয় নাড়া–
লয়ে তার সুখ দুখ ভয়;
কিছু যেন নাই গো সে ছাড়া,–
সে-ই যেন মোর সমুদয়।
এ ঘোর কাটিয়া যাবে চোখে
নিমেষেই প্রভাত-আলোকে,
পরিপূর্ণ তোমার সম্মুখে,
থেমে যাবে সকল কল্লোল।"

— গীতাঞ্জলি

তখন প্রভাত হতে অনেক দেরি।

আমাদের সব-শেষের পথটুকু শেষ করবার জন্যে আমরা তৈরি হলাম। এইবার আমাদের পথ দেখাবে আমাদের ছড়িওয়ালা। তার কাঁধের ছড়ির উপর লক্ষ রেখে আমরা চলব তার পিছু পিছু। অতি পবিত্র হিংলাজের ছড়ি, নানা রঙের কাপড়ের ফালি ঝুলছে সেই ছড়িতে। ছড়ির মাথাটা ত্রিশূলের মতো আর ডগডগে করে সিন্দুর মাখানো তাতে।

কারও কাঁধে কুঁজো নেই। তার বদলে ঝুলছে ঝুলি প্রত্যেকের কাঁধে। মায় আমাদের সুখলালের কাঁধে পর্যন্ত। তাকে সাজিয়ে দিলে তার দাদা। আরও কয়েকটা বছর পরে এই ছোট্ট সুখলাল বড় হয়ে কত যাত্রীকে এখানে নিয়ে আসবে। এখান থেকে তাদের পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে হিংলাজের গুহায়, মন্ত্র পড়বে, পিঠ চাপড়ে সুফল দান করবে, আশীর্বাদ করবে। আজ হচ্ছে তার প্রথম হাতেখড়ি। বড়ভাই ছোটভাই-এর ঝুলিতে গুছিয়ে দিলে ওদের নিজেদের সব পূজার সামগ্রী। লাল সালু, সিন্দুর, মাটির প্রদীপ, তেল-সলতে, ধূপ-ধুনা, ঘি, নারকেল, শুকনো মেওয়া, মিছরি আর দু-ছড়া পাথরের মালা। এই পাথরের মালা দু-ছড়া করে কিনে আনতে হয়েছে প্রত্যেক যাত্রীকে করাচী থেকে। এই জিনিসটিই হচ্ছে বিখ্যাত হিংলাজের ঠোংরা। ছোট্ট ছোট্ট লালচে পাথর। এক জাতের বেঁটে লালচে চাল হয় বীরভূম, বর্ধমানে, পাথরগুলো অনেকটা সেইরকম দেখতে। একগাছি সরু সুতো যেতে পারে এই রকম ছেঁদা করে সেই মালা গাঁথা হয়। অতটুকু পাথরে কি যন্ত্র দিয়ে এই রকম সরু ছেঁদা করে তা ভেবে আশ্চর্য হতে হয়। মা হিংলাজের গুহা থেকে বেরিয়ে এসে তবে ওই মালা গলায় ধারণ করতে হবে। তার আগে গলায় দিলে নাকি মুখ দিয়ে রক্ত ওঠে। আরও বহুরকমের বিধিনিষেধ আছে, অনেক ব্যাপার করতে হয় এই মালা ধারণ করবার আগে। কিন্তু সে সব করা হবে কাল, ব্রহ্মময়ীর ব্রহ্মরন্ধ্র মহাপীঠে জ্যোতিঃদর্শন করে বেরিয়ে আসবে যখন, তখন। এখন খুব সাবধান, আরও একবার না হয় ভালো করে দেখেশুনে নাও- কারও কিছু সঙ্গে নিতে ভুল হল কি না। সব নেওয়া হয়েছে তো? মা হিংলাজের ভোগের জিনিসপত্র আটা ঘি চিনি কিশমিশ পেস্তা বাদাম নারকেল মেওয়া মিছরি সবই তো আলাদা করে পবিত্রভাবে আনা হয়েছে? ঠোংরার মালা দু-গাছা আর নতুন কাপড়খানা? স্নান করে নতুন কাপড় পরে হিংলাজের গুহায় ঢুকতে হবে। কাঁচের বোতল একটা করে সকলেই সঙ্গে এনেছে। এটাও যেন ভুল না হয়। হিংলাজ দর্শনের পর আকাশগঙ্গায় গিয়ে সেখানকার পবিত্র জল ভরে নিতে হবে ওই বোতলে।

গুলমহম্মদ আর তার ছেলে বার করে দিলে ওদের নিজেদের পূজার সামগ্রী।

একখানা লাল সালু, একগোছা মহাসুগন্ধি ধূপবাতি আর অনেকগুলো লম্বা মোমবাতি। তার সঙ্গে আতর, এলাচদানা আর নগদ পাঁচসিকা। নানী-কি-হজে চড়াতে হবে। ওরা তো আর যাবে না, ওদের শিন্নি রূপলালই চড়াবে।

ভৈরবী সাজিয়ে দিলেন কুন্তীকে। একখানা নতুন গামছা দিয়ে ঝুলি বানানো হল কুন্তীর। তার ভিতর কুন্তীর জন্যে সব কিছু আলাদা করে দিয়ে দেওয়া হল, এমনকি দু-ছড়া মালা পর্যন্ত। কুন্তী আপত্তি করলে, তাকে দু-ছড়া মালা দিলে আমাদের যে কম পড়বে! বললাম, "আমি সন্ন্যাসী মানুষ-আমাকে ও মালা গলায় দিতে নেই।"

"তবে সঙ্গে এনেছেন কেন চার ছড়া মালা?"

"কি করি বলো-যে শেঠজি আমাদের জিনিসপত্র দিয়েছেন তিনি কিছুতেই ছাড়লেন না। "কাজেই চারগাছা সঙ্গে এসেছে।"

দক্ষিণের পাঁচসিকে পয়সাও দিতে ভুললেন না ভৈরবী কুন্তীর ঝুলিতে। তারপর নিজের ঝুলি নিজের কাঁধে ঝুলিয়ে কুন্তীর হাত ধরে তৈরি হয়ে দাঁড়ালেন।

এমন সময় কুন্তীর মনে পড়ে গেল বোতলের কথা। কই, বোতল নেওয়া হল না তো? আকাশগঙ্গার জল আসবে কিসে?

ভৈরবী তখন বুঝিয়ে বললেন কুন্তীকে। জল বয়ে নিয়ে গিয়ে আমাদের লাভ কি?

আমাদের তো ঘরবাড়ি কোথাও কিছুই নেই। জল নিয়ে গিয়ে আমরা রাখব কোথায়? সবাই ফিরে যাবে নিজের নিজের বাড়িতে। বাড়িতে নিয়ে ওই বোতলভরা জল পবিত্রভাবে রেখে দেবে হয়তো ঠাকুরঘরের কোণে। হিংলাজ থেকে ফিরে আসব আমরা ঘরে ফেরবার জন্যে নয়, পথে ঘোরবার জন্যে। পথ আর পথ। পথই আমাদের ঘর, পথই আমাদের সম্বল। আকাশগঙ্গার জল যত পবিত্রই হোক তা বোতলে ভরে নিয়ে কাঁধের ঝুলিতে করে চিরকাল বয়ে বেড়ানো সম্ভব নয়।

কুন্তী সত্যই আশ্চর্য হয়ে গেল। শুধু আশ্চর্য হল না, আমাদের কোথাও ঘর না থাকার দুঃখটা এমন করেই বাজল তার বুকে যে প্রায় কেঁদেই ফেলল। আবার সাহসই দিলে আমাদের। কুছ পরোয়া নেই। আর আমাদের ঘরের দুঃখ থাকবেই না। এখান থেকে ফিরে সে নিয়ে যাবে আমাদের তার বাবার কাছে। কুন্তীর বাবা মাটির মানুষ, আর তাঁর দয়াধর্মও খুব বেশি। আমাদের নিয়ে গিয়ে কুন্তী তার বাবাকে বলবে আমাদের একটা আশ্রম করে দিতে। দ্বারকায় বৃন্দাবনে জুনাগড়ে-যেখানে আমরা পছন্দ করব সেইখানেই জমি কিনে দেবে কুন্তীর বাবা। সেই জমিতে আশ্রম বাঁধব আমরা। কুন্তীও চিরকাল থাকবে কিনা সেই আশ্রমে সন্ন্যাসিনী হয়ে। সেই হবু আশ্রমের পূজার ঘরের এক কোণে পবিত্র আকাশগঙ্গার জল নিয়ে গিয়ে টাঙিয়ে রাখতে পারবে না বলে কুন্তীর আপশোসের অন্ত রইল না।

একটা আলোও সঙ্গে নেওয়া ঠিক হলো। আর সঙ্গে নেওয়া হল নিজের নিজের লোটা। ব্যাস, এইবার চলো সকলে।

"জয় শ্রীহিংলাজ মহারানি কি—"

"জয়!"

উঠলো ছড়ি রূপলালের কাঁধে। তার সামনে আলো হাতে চলল গুলমহম্মদ, খানিকটা এগিয়ে দিয়ে সে ফিরে আসবে। পথ ভুল হবার কোনো সম্ভাবনা নেই। সোজা পুবমুখো গেলেই নদী। রূপলাল আগে অন্তত বিশবার যাওয়া-আসা করেছে।

মুখ বুজে সবাই চলেছি। গাছপালার ভিতর থেকে বেরিয়ে এসে চাষের জমিতে পড়া গেল। তখন গুলমহম্মদ ফিরল একজনের হাতে আলো দিয়ে। বত্রিশ ঘণ্টার মধ্যেই আমরা আবার ফিরে আসব এখানে। তবুও বুড়োর গলায় একটা করুণ বিচ্ছেদের সুর বেজে উঠল, তখন সে বার বার আমাদের সকলকে সাবধান করে দিয়ে বিদায় নিলে।

আমরা চললাম।

চাষের জমি শেষ হল। তখন হাড়ে হাড়ে টের পেলাম, কি জন্যে উট নিয়ে নদীর ধার পর্যন্ত যাওয়া যায় না। হোঁচট হোঁচট আর হোঁচট, সেই ভোররাতে আরম্ভ হল পদে পদে হোঁচট খাওয়া। শুধু অজস্র অফুরন্ত নোড়া-নুড়ি ঢিল-পাটকেল। তার উপর দিয়ে একবার খানিকটা উঠছি আবার নেমে যাচ্ছি অনেকটা। তখনও বেশ আঁধার রয়েছে। ভালো করে দেখাও যাচ্ছে না কিছু। একে অপরের ঘাড়ের উপর গিয়ে পড়ছি। সামনে থেকে রূপলাল চেঁচাচ্ছে, "হুঁশিয়ার, হুঁশিয়ার!' আর ঠিক তার পরমুহূর্তে যেই পা ফেললাম অমনি পায়ের নীচ থেকে কতকগুলো নুড়ি গেল গড়গড় করে গড়িয়ে। সঙ্গে সঙ্গে গিয়ে পড়লাম সামনের কারও পিঠের উপর। তারপর আরম্ভ হল আলগা নুড়ির উপর দিয়ে উপর দিকে ওঠা। সে আরও কঠিন ব্যাপার। পা ফেললেই খানিক পিছিয়ে নেমে আসতে হয়।

এই করতে করতে সকাল হল। চতুর্দিকে স্পষ্ট পরিষ্কার দেখতে পাওয়া গেল তখন। দেখে একেবারে তাজ্জব বনে গেলাম। এত নোড়া-নুড়ি কি উদ্দেশ্যে জড়ো করা হয়েছে এখানে? পৃথিবীসুদ্ধ মানুষ মনের সাধ মিটিয়ে টেবিলের উপরের কাগজ চাপা কুড়িয়ে নিয়ে যেতে পারে এখান থেকে। রঙে আকারে গঠনবৈচিত্র্যে একটির সঙ্গে অপরটির কিছুমাত্র মিল নেই। এক রকমের একজোড়া কাগজ-চাপা খুঁজলেই মুশকিল, তা কিছুতেই মিলবে না এখানে।

সকলেই একটা-দুটো কুড়োতে লাগল। নিতে নিতে বোঝা ভারী হয়ে উঠল। তবুও বন্ধ হয় না নুড়ি কুড়োনো। কি করবে, এইমাত্র যেটি নজরে পড়ল সেটি যে আগেরগুলোর চেয়ে

আরও অদ্ভুত ধরনের। টক করে তুলে না নিয়ে উপায় কি! তারপর আবার দু-পা না এগোতেই ওই আর একটি। আহা, এটি আরও অদ্ভুত। যেমন রং তেমনি জ্বলজ্বল করছে, সেটিকেও তুলে নিতে হল। এই করতে করতে শেষ পর্যন্ত সব কটি দিতে হল আঁচল থেকে ফেলে। কারণ তার পরেও যেগুলো চোখে পড়ছে, সেগুলো না নেওয়া একান্ত অন্যায় হবে। আবার ভরে উঠল আঁচল। কিন্তু আরও সামনে যেগুলো দেখতে পাওয়া গেল, তার কাছে আগের কুড়োনোগুলো সত্যিই একেবারে যাচ্ছেতাই বাজে জিনিস। সুতরাং আবার আঁচল খালি করবার দরকার হল।

হঠাৎ নুড়ির জগৎ গেল শেষ হয়ে। আরম্ভ হল বালি। ঝকঝকে তকতকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন এক নম্বরের সাদা বালি। রূপলাল তখন হাত তুলে দেখিয়ে দিলে, ওই ওখানে ওই পাহাড়ের কোল দিয়ে বয়ে যাচ্ছে অঘোর নদী, আর নদীর ওপারে ওই পাহাড়েই মা হিংলাজের গুহা।

এবার পাহাড় দেখে কেউ জয়ধ্বনি দিলে না। সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করতে শুয়ে পড়ল না কেউ। দণ্ড খাটতে খাটতে চললও না কোনো ভক্ত। উল্লাস-উচ্ছ্বাস লম্ফঝম্ফ কিছুই নেই। নীরবে সকলে নেমে পড়লাম সেই বালির সমুদ্রে। শেষবারের মতো এটাকেও পার হতে হবে। ওই দেখা যাচ্ছে কূল। এতদিনে কূল দেখা গেল। দাঁতে দাঁত চেপে সাঁতরে চললাম আমরা সে বালির সমুদ্রে।

চোখে পড়ল জল। তরতর করে বয়ে যাচ্ছে কূলে কূলে ভরা এক নদী। ডান দিক দিয়ে নেমে এসে বাঁ দিকে চলে যাচ্ছে। এপারে বালি ওপারে পাথর। সেই পাথরের পাড় উপর দিকে মেঘ ভেদ করে চলে গেছে অনন্ত আকাশের মধ্যে।

এই নদীর নাম অঘোর। ওপারের ওই পাহাড়ের কোথাও আছে মা হিংলাজের গুহা। একান্ন মহাপীঠের প্রথম আর মহাপীঠ ওই পাহাড়ের মধ্যে, সেখানে বিষ্ণুচক্রে খণ্ডিত হয়ে সতীর ব্রহ্মরন্ধ্র পড়েছে। এই মহাপীঠ দর্শন করে ভগবান রামচন্দ্র ব্রহ্মহত্যার পাতক থেকে মুক্ত হন।

নদীর পাড়ে বালুর মধ্যে পোঁতা হল হিংলাজের ছড়ি। কাঁধের ঝোলা নামিয়ে আমরাও বসে পড়লাম তার পাশে। চোদ্দ দিন চোদ্দ রাত পরে সত্যিই ফুরিয়ে গেল পথ। সেই সঙ্গে নিঃশেষ কোথায় মিলিয়ে গেল এই চোদ্দ দিনের উদ্যম-উৎসাহ আর পথের বিভীষিকা। এখন আমাদের কাছে পেরিয়ে-আসা পথের মূল্য এক কানাকড়িও নয়। বোধ হয় পথের কাছে আমাদেরও আর কানাকড়ির মূল্য নেই। হাব নদী থেকে অঘোর নদী-এই চোদ্দটা দিন আর রাত মনের অন্ধিসন্ধি জুড়ে ছিল এই পথ। হঠাৎ ফাঁকা হয়ে গেল মনটা। পথ খতম-আমরাও যেন খতম হয়ে গেলাম সেই সঙ্গে।

বসে আছি নদীর দিকে চেয়ে। কানে যাচ্ছে নদীর স্রোতের কলকল ছলছল ধ্বনি। মন দিয়ে শুনছি কি বলছে নদী। হাঁ, বলছে-এইবার বেশ বুঝতে পারছি নদীর ভাষা-বলছে না শুধু; গাইতে গাইতে চলেছে

“নদীপারের এই আষাঢ়ের
প্রভাতখানি
নে রে, ও মন, নে রে আপন
প্রাণে টানি ৷
সবুজ নীলে সোনায় মিলে,
যে সুধা এই ছড়িয়ে দিলে
জাগিয়ে দিলে আকাশ তলে
গভীর বাণী—
নে রে, ও মন, নে রে আপন
প্রাণে টানি ৷
এমনি করে চলতে পথে

ভবের কূলে,
দুই ধারে যা ফুল ফুটে সব
নিস রে তুলে।
সেগুলি তোর চেতনাতে
গেঁথে রাখিস দিবস রাতে
প্রতি দিনটি যতন করে
ভাগ্য মানি—
নে রে, ও মন, নে রে আপন
প্রাণে টানি।"
— গীতাঞ্জলি

"এই নিন আপনার দাঁতন।"

গানের উপর খাঁড়ার কোপ পড়ল। সুরের রেশটুকু কটাং করে দাঁত দিয়ে কেটে দিলে কে। কে আবার? কুন্তী ৷ দু-গাছা দাঁতন হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে।

"দাঁতন! দাঁতন কেন? বেশ তো চলছিল এতদিন বালি ঘষে দাঁত মাজা।"

'এখানে তা চলবে না। এখানকার নিয়ম দাঁতন করা। ওই দেখুন সকলে দাঁতন ভাঙছে।"

নদীর পারে একেবারে জল ছুঁয়ে দাঁড়িয়ে আছে কতকগুলো ডাঁটা। পাতা নেই বললেই হয়। সেইগুলো সবাই দুটো করে ভেঙে আনছে। একটা দিয়ে দাঁতন করবে আর একটা পুঁতে দেবে সেইখানে। এটিও একটি তীর্থকর্ম, অবশ্য পালনীয় কর্তব্য।

অবশ্যপালনীয় কর্তব্য এই একটিই নয় এখানে, আরও অনেক রকমের কর্তব্য রয়েছে। মন্ত্র পড়ো, তর্পণ করো পিতৃপুরুষের, দান-দক্ষিণা দাও। এখানকার দান দক্ষিণা সব ওই ওঁর প্রাপ্য। ওই যে এসে দাঁড়িয়েছেন, ছাতার কাপড়ের আলখাল্লা পরে, বুক পর্যন্ত দাড়ি, হাতে জপের মালা—উনি হচ্ছেন হিংলাজের পুরোহিত, নানী কি-হজের পীরসাহেব, এই মহাপীঠের মোহন্ত মহারাজ। মহাতপা নাগনাথের গদির বর্তমান অধীশ্বর বাবা ধর্মনাথ মহারাজ। কিন্তু ওই ধর্মনাথ নাম উনি নিজেও বহুকাল ভুলে গেছেন। ভুলতেই হবে। ব্যবহার না করলে যত বড় ধারালো অস্ত্রই হোক না কেন তাতে মরচে ধরবেই। তেমনি নামের বেলাতেও। ঠাকুর্দা শিবভক্ত। নাতির নাম রাখলেন পঞ্চানন। অতি মহৎ উদ্দেশ্য। নাতিকে ডাকবেন আর ঠাকুরের নামও নেওয়া হবে। পিসি সেই পঞ্চাননকে আদর করে পাঁচু বলে ডাকতে লাগলেন। সঙ্গে সঙ্গে দেশসুদ্ধ লোক বললে পেঁচো। ওই পেঁচোই টিকল, পঞ্চাননকে সবাই গেল ভুলে।

হিংলাজের মোহন্ত মহারাজের বেলাও ঠিক তাই হয়েছে। কান ফাটিয়ে-নাথ সম্প্রদায়ের সাধুদের কানে ছেঁদা করে একটা কিছু পরতে হয় কানে-গেরুয়া পরে লম্বা কলকে সম্বল করে, মাত্র আটাশ বছর বয়সে নাথ সম্প্রদায়ের এক সন্ন্যাসী হিংলাজ দর্শনে এসে আর ফিরতে চাইলেন না এখান থেকে। রয়ে গেলেন এই অঘোর নদীর কূলে। তাঁর সঙ্গে যাত্রীরা আর ছড়িওয়ালা তাঁর পায়ে মাথা খুঁড়েও তাঁকে সঙ্গে নিয়ে যেতে পারলে না। একটা মানুষকে এই জনমানবহীন জায়গায় ফেলে রেখে তাঁরা কাঁদতে কাঁদতে ফিরলেন করাচী। করাচীতে নাগনাথের আখড়ায় সবাই হায় হায় করতে লাগল। আহা, লোকটা না খেতে পেয়ে শুকিয়ে মরবে কিংবা বাম বাহেড়া বা নেকড়েতে খেয়ে ফেলবে! তারপর সবাই গেল সন্ন্যাসীর কথা ভুলে।

ছ-মাস পরে আবার ছড়ি এল করাচী থেকে। এল একদল যাত্রী আর ছড়িওয়ালা। এসে এইখানে এই অঘোর নদীর কূলে যখন বসেছে, তখন সামনে আবির্ভূত হল এক মূর্তি। আপাদমস্তক নগ্ন এক নরকঙ্কাল। তাকে দেখে তো সবাই-এর ভিরমি লাগাবার যোগাড়। তখন সেই মূর্তি কথা বললেন, অভয় দান করলেন। বললেন, "আমিও তোমাদের মতো মানুষ, মা হিংলাজের সেবায়েত। মা হিংলাজের আদেশে এখানে বাস করছি।"

সেই দিন এই নদীর কূলে সেই ভাগ্যবান যাত্রীদল আর তাদের ছড়িওয়ালা চিৎকার করে উঠেছিল, "জয় মোহন্ত মহারাজ কি জয়!" সেই যাত্রীদলই সর্বপ্রথম পূজা করল মোহন্ত মহারাজের। তারা যা দান-দক্ষিণা করলে এখানে, তাদের ছড়িওয়ালা তা আর নিলে না; মোহন্ত মহারাজের পায়ের কাছে নামিয়ে দিয়ে ঘোষণা করলে যে, এখন থেকে অঘোর নদীর কূলে যাত্রীরা যা দেবে সে সমস্তই হবে মহারাজের প্রাপ্য। এসব ব্যাপার ঘটে অন্তত ষাট বছর আগে। কিন্তু সে নিয়ম আজও চলে আসছে। অঘোর নদীর কূলে যাত্রীরা হিংলাজের মোহন্তর হাতেই দান-দক্ষিণা করেন।

কিন্তু এই ষাট বছরে অনেক কিছু বদলেছে। ষাট বছর আগেকার আটাশ বছরের সন্ন্যাসী বাবা ধর্মনাথ নিজের নামটিও বোধ হয় ভুলে গেছেন। লাসবেলা রিয়াসতের সর্বত্র এখন ইনি 'কোটরী পীর' বলে বিখ্যাত। আর করাচীর নাগনাথের আখড়ায় ছড়িওয়ালারা ডাকে 'অঘোরী বাবা' বলে। এখানকার সরকার প্রতি বছর এঁকে নজরানা দেন। তাতেই সারা বছর এঁর বেশ সচ্ছল অবস্থায় চলে। কোটরী পীরের অসীম ক্ষমতা। এখানকার লোকে বিশ্বাস করে যে ইনি মড়া বাঁচাতে পারেন। এমনকি এঁর মুখের কথায় সরকার মৃত্যুদণ্ড পর্যন্ত মুকুব করে দেন। অঘোর নদীর এপারে আরও ডানদিকে খানিকটা গেলে অঘোরী বাবার আস্তানা পাওয়া যাবে।

বসে বসে দাঁতন ঘষছি দাঁতে আর অঘোরী বাবার কাহিনী শুনছি রূপলালের কাছে। ওধারে একে একে সবাই স্নান করে গিয়ে অঘোরী বাবার হাতে দান-দক্ষিণা করছে। মেওয়া, মিছরি, আর নগদ টাকা-পয়সা। বাবা সকলের মাথায় হাত রেখে আর্শীবাদ করছেন। দূর থেকে দেখতে পাচ্ছি একমুখ সাদা চুলদাড়ির ভিতর তাঁর চোখ দুটি। চোখ দুটি দিয়ে যেন হাসি উথলে উঠছে। জগতে সবচেয়ে দুর্লভ বস্তুটির নাম কি? আমাকে এ কথা জিজ্ঞাসা করলে আমি বিনা দ্বিধায় উত্তর দেব-"বস্তুটির নাম অনাবিল প্রসন্নতা।" বস্তুটি এতই দুর্লভ যে অনেকের ভাগ্যে সারা জীবনে ও জিনিসের দর্শনই মেলে না। কখনো কারও ভাগ্যে যদি দৈবাৎ মিলে যায় ওর সাক্ষাৎ, তখন ওর ছোঁয়া লেগে তার মন-প্রাণও ছলছলিয়ে ওঠে। সেদিন অঘোর নদীর কিনারায় অঘোরী বাবার দুই চোখ দিয়ে যে অমৃত ঝরে পড়ছিল তাতে স্নান করে দলসুদ্ধ সবাই-এর যেন মন-আত্মা জুড়িয়ে গেল।

সকলের শেষে স্নান করে বাবার সামনে গিয়ে দাঁড়ালাম। চোখ তুলে চেয়ে বাবা হাত পাতলেন। বললাম, "বাবা, আমার তো কিছুই নেই এ দুনিয়ায় যা তোমার হাতে দিতে পারি। আমি নিজেই ভিখারী। একমাত্র আমি নিজেকেই দিতে পারি তোমার পায়ে। নাও তুমি আমাকে যদি তোমার কোনো কাজে লাগে।" বলে বাবার দু পায়ে হাত দিলাম। বাবা হো হো করে হেসে উঠলেন। বললেন, "যা —নদী পার হয়ে মায়ের স্থানে চলে যা। ব্রাহ্মমূহূর্তে আবার দেখা হবে।"

কাঁধের ঝোলাঝুলি পুঁটলি বেঁধে মাথায় তুলে সকলে জলে নামলাম। এধারে বৃষ্টি হয়ে গেছে। নদীর জল বেড়েছে। ভয়ানক টান। জল আমাদের কোমর ছাড়াল। শ্রীমান ছোট পাণ্ডা বাবাজির ছাড়াল গলা। তখন ভৈরবীর পুঁটলি এল আমার মাথায়। সুখলালকে পিঠে করে ভৈরবী অবলীলাক্রমে সাঁতার দিয়ে একেবারে ওপারে চলে গেলেন। আমরাও অনেক হেঁটে পার হয়ে এলাম। জল নদীর মাঝখানে আমাদের গলা পর্যন্ত পৌঁছল। এপারে এসে কানে এল কুন্তীর গলা। গলা-জলে দাঁড়িয়ে কুন্তী চিল-চেঁচাচ্ছে। স্রোতে তাকে টেনে নিয়ে যেতে চায়। একলা পোপটভাই তার হাত টেনে ধরে নদীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন। আবার ঝাঁপিয়ে পড়লেন ভৈরবী। সাঁতরে গিয়ে ধরলেন কুন্তীর হাত। কুন্তীর মাথা থেকে পুঁটুলিটা পোপটভাই নিলেন। অমনি একটানে কুন্তীকে এধারে এনে কোমর-জলে দাঁড় করিয়ে দিলে ভৈরবী। কুন্তী নাকানি-চোবানি খেয়ে ঢোক-দুই জল গিললে। বরিশাল না থাকলে রাজস্থান টানের চোটে ভেসেই যেত। শুকনো ডাঙ্গায় সব কারবারই চলতে পারে কিন্তু জলে না নামলে সাঁতার শেখা যায় না।

কূলে উঠে কাপড় নিংড়ে নিয়ে ভিজে কাপড়েই ঢুকলাম আমরা মা'র খাসমহলে। ভিজে

কাপড় শুকোতে ক-মিনিটই বা লাগবে এখানে! সকলের কাছে আর একখানি করে নতুন কাপড় আছে, যা পরে ভোরবেলা মাকে দর্শন করতে হবে।

তারপর নীরবে নিঃশব্দে মহলের পর মহল পার হয়ে চললাম আমরা। শুধু দুই চোখ দিয়ে গিলছি সেই রহস্যপুরীর অদ্ভুত দৃশ্য আর অপরূপ সাজসজ্জা। মা'র রত্ন ভাণ্ডারের রক্ষক হচ্ছেন যক্ষরাজ কুবের। এ সেই কুবেরের পুরী, মা'র কাছে পৌঁছতে হলে আগে এই যক্ষপুরী পার হতে হবে।

ডাইনে বাঁয়ে পাহাড়, যক্ষপুরীর গগনস্পর্শী পাষাণ-প্রাচীর। নিজেদের খেয়াল-খুশি মতো গড়েছে এ পুরী যক্ষরা। যক্ষদের নিজস্ব নির্মাণকৌশল, তার উপর যক্ষ পদ্ধতির উন্মত্ত রঙের খেলা। রঙের উপর রং ঢেলে দিয়েছে, মিলল কি মিলল না যক্ষ-পদ্ধতিতে সে-সবের বাছ বিচার নেই। শুধু রূপে বর্ণে আলোয় আঁধারে এমনটি হওয়া চাই যা একই সঙ্গে আনন্দ বিস্ময় আর আতঙ্ক সৃষ্টি করতে পারে, যা দেখে বাহ্যজ্ঞান পর্যন্ত লোপ পায়। তবেই হবে যক্ষ শিল্পকলার চরম সার্থকতা।

এ পুরী গড়া হয়েছে বেশ সোজা কায়দায়। নানা রঙের পাথর গলিয়ে শুধু ঢেলেছে আর ঢেলেছে। সেই গলা পাথর ইচ্ছেমতো গড়িয়ে গড়িয়ে মিশেছে, একাকার হয়ে কিম্ভূতকিমাকার রূপ গ্রহণ করেছ। বহু ঊর্ধ্বে আকাশ রঙের ছাত, সেখান থেকে নেমে এসেছে দু-পাশের পাষাণ-প্রাচীর। পায়ের তলার মাঝেও নানা রঙের গলানো পাথরে তৈরি। একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে ঘুরে ঘুরে চলেছি তো চলেছিই। মোড় ঘুরলেই সব যাচ্ছে পালটে, দু-পাশের পাষাণ-প্রাচীরের গায়ে আরও ভয়ঙ্কর নব চিত্র ফুটে উঠেছে। সেই সমস্ত অমানুষিক নকশার না আছে কোনো অর্থ না কোনও ছাঁদ-ছন্দ। গলানো পাথরের তৈরি সেই সব অতিকায় মূর্তি যে কাদের তা কল্পনা করাও দুঃসাধ্য।

এদের কারও হাত নেই, কারও পা নেই, কারও মাথাটা নেই। কেউ ঝুলছে, কেউ বসে আছে, কেউ বা দাঁড়িয়ে আছে। কোনোটা হাতির মতো, কোনোটা কুমিরের মতো, কোনোটা প্রকাণ্ড তালগাছের মতো। বিকটাকার দানব আর রাক্ষস সব পাষাণ হয়ে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছে দু-পাশের গগলস্পর্শী পাষাণ-প্রাচীরের গায়ে। আর মাঝখানের ফাঁকটি জুড়ে রয়েছে নিরেট নিশ্ছিদ্র নিস্তব্ধতা। সেই প্রাণহীন নিস্তব্ধতার মধ্যে আমরা ঘুরে বেড়াতে লাগলাম।

চলতে চলতে মনে হতে লাগল হয়তো এই মুহূর্তেই যক্ষাধিপতির অদৃশ্য অঙ্গুলিসঙ্কেতে এই সব পাষাণ-মূর্তিরা নড়েচেড়ে উঠবে। পাষাণ-প্রাচীরের গা থেকে নেমে এসে দাঁড়াবে আমাদের পথ জুড়ে। কিংবা জুড়ে দেবে নিজেদের মধ্যে হিংস্র উদ্দাম হাতাহাতি। তখন? তখনকার অবস্থা কল্পনা করতে গিয়ে ভয়ে চোখ বুজে ফেললাম।

চোখ বুজে চলতে চলতে বার বার মন দিয়ে শোনবার চেষ্টা করছি এই পাষাণ প্রাচীরের অন্তরালে বসে কাঁদছে নাকি কোনো বিরহিণী যক্ষপ্রিয়া! কিংবা বাজছে নাকি কোথাও যক্ষরমণীর পদ-শিঞ্জিণী বীণা মৃদঙ্গ মুরলীর তালে তালে। বার বার মনে হতে লাগল এই যক্ষপুরীর রক্ষকেরা অন্তরীক্ষ থেকে আমাদের উপর নজর রাখছে। অনেকে আবার চলেছেও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে। কিন্তু আমরা তাদের দেখতে পাচ্ছি না। এ চোখ দিয়ে তাদের দেখা যায় না। শিপ্রা নদীর তীরে মহাকালকে তপস্যায় তুষ্ট করে কালিদাস যে দৃষ্টিলাভ করেছিলেন, সেই দৃষ্টি লাভ করলে যক্ষ-যক্ষণীদের চাক্ষুষ দেখা যায়। আর তখন যক্ষপুরীর এমন বর্ণনাই করা যায়-যা শুনে লোকে সেখানে না গিয়েও সেই যক্ষপুরীর প্রত্যক্ষ ধারণা করে আনন্দলাভ করতে পারে।

একসময় ডান পাশের দেওয়াল পিছু হটে সরে যেতে লাগল। পায়ের নীচে দেখা দিল মাটি, ভিজে নরম মাটি। রোদ আর ছায়া, ছায়া আর রোদের লুকোচুরি খেলা চলতে লাগল। দেখা দিল দূর্বাঘাসের সবুজ চাপড়া, সব শেষে মস্ত বড় বড় রক্তকরবীর ঝাড়। সেই রক্তকরবীর ঝাড়ের ওপাশে একটি ক্ষীণ নির্ঝরিণী কুলকুল করে বয়ে চলেছে।

জলের ধারে পৌঁছেই রূপলাল চিৎকার করে উঠল, "শ্রীহিংলাজ মহামায়া কি—"

মায়ের সব-কটি সন্তান সমবেত কণ্ঠে উত্তর দিলে, "জয়!"

সামনেই হিংলাজ।

দু-তিন হাত চওড়া জলাধারটির অপর পারে আর একটি খাড়া পাহাড়। সেই পাহাড়ের কোলে ঠিক আমাদের সামনেই এক বিরাট গহ্বর। মুখের দিকটা অন্তত তিনতলা সমান উঁচু। ছাত ক্রমে ভিতর দিকে নেমে গেছে। নীচে কি আছে দেখা গেল না। জলের ওপরেই কয়েক ঝাড়া করবী গাছের আড়াল পড়েছে।

কাউকে বলে দিতে হল না এই হিংলাজের গুগা। প্রকৃতিদেবী স্বহস্তে সাজিয়ে দিয়েছেন মায়ের স্থান। সাজিয়েছেন অতি অল্প উপাচারে। তরতর করে বয়ে চলেছে একটি ক্ষীণ নির্ঝরিণী, আর কয়েক ঝাড় রক্তকরবীর গাছ। টকটকে লাল ফুল রয়েছে গাছে। বইছে শীতল হাওয়া। এতক্ষণে যে সরু পথটা দিয়ে ঘুরে ঘুরে এলাম তার মধ্যে এতটুকু হাওয়া ছিল না। দুপাশে পাহাড় তেতে ভিতরের হাওয়া আগুন হয়ে উঠেছিল। অঘোর নদী থেকে উঠে ভিজে কাপড়ে আমরা ঢুকেছিলাম পাহাড়ের মধ্যে। কাপড় শুকিয়ে কখন খরখরে হয়ে গেছে তা টেরও পাইনি। এতক্ষণে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। হিংলাজের শীতল স্পর্শে দেহ মন প্রাণ জুড়িয়ে গেল। এখানে এলে সকলের জ্বালা সকল জুড়োবেই। স্বয়ং দক্ষকন্যা পতিনিন্দার জ্বালা জুড়োবার জন্যে এখানে এসে লুকিয়েছেন। ত্রিতাপ-জ্বালা জুড়োবার এর চেয়ে উপযুক্ত স্থান আর কোথাও আছে নাকি!

তখন রূপলাল কাঁধ থেকে ছড়ি নামিয়ে সেখানে পুঁতলে। ছড়ি আর যাবে না। ছড়ির ওপারে যাওয়া নিষেধ। ছড়ি পুঁতে জলে নামল রূপলাল। তার পিছন পিছন আমরাও।

জল পায়ের গোছ পর্যন্ত উঠল। কিন্তু সাবধানে পা টিপে টিপে পার হতে হল। পাথরের উপর শেওলা পড়েছে। পা ফেললেই পিছলে যায়। অপর কূলে পা দিয়েই আবার রূপলাল চিৎকার করে উঠল-জয় শ্রীহিংলাজ মহামায়ী কি আবার সকলে একযোগে জয়ধ্বনি দিলে। এবার কিন্তু সেই ধ্বনি তখনই মিলিয়ে গেল না। গুম গুম করে ছুটে বেড়াতে লাগল গুহার মধ্যে। সেই জয়ধ্বনি শতগুণ হয়ে ফিরে এল আমাদের কানে। রূপলালের পিছু পিছু দু-ঝাড় রক্তকরবীর মাঝখানের সরু পথ দিয়ে গিয়ে আমরা দাঁড়ালাম একটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন আঙিনায়। মুখ তুলে দেখলাম অনেক উঁচুতে লালচে পাথরের ছাত ঝুলে আছে আঙিনার উপর। সামনে কয়েক থাক সিঁড়ির মতো উপরদিকে উঠে গেছে, তারপর অন্ধকার গুহা। তখন সেই আঙিনার উপর সবাই সাষ্টাঙ্গে লুটিয়ে পড়ল।

অবশেষে সত্যিই পৌঁছলাম।

দুঃখ-কষ্ট, লাভ-লোকসান, এমনকি প্রাণের মায়া পর্যন্ত তুচ্ছ করে যার ডাকে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম মরুভূমির বুকে, যার বলে বলীয়ান হয়ে এই এক পক্ষ দিনরাত অহরহ যুঝেছি মরণের সঙ্গে, যার দুর্নিবার আকর্ষণ এই অসম্ভব সম্ভব করলে, তার চরণতলে পৌঁছে এতটুকু উত্তেজনা উচ্ছ্বাস নেই মনের কোণেও। বরং একটা পরম নিশ্চিন্ত ভাব যেন পেয়ে বসল। হাত-পা সর্বাঙ্গ এলিয়ে পড়ল। কাঁধের ঝুলিটা একপাশে নামিয়ে গুহার সিঁড়িতে হেলান দিয়ে বসে পড়লাম।

অত বড় মহাতীর্থে পৌঁছে একটি অতি সাধারণ সহজ সরল ঘটনা মনে পড়ে মনকে একেবারে আচ্ছন্ন করে ফেললে। একবার অনেকদিন পরে বাড়ি গিয়েছি! বাড়ি যাবার জন্যে মা বার বার চিঠি দিচ্ছিলেন। কিন্তু ছুটি পাচ্ছিলাম না। হঠাৎ ছুটি পেলাম, পেয়েই রওয়ানা। স্টিমার থেকে নেমে নৌকা পেলাম না। তাতে বড় বয়েই গেল। সাঁতার কেটেই মেরে দিলাম ক্রোশ তিনেক পথ। বাড়িতে ঢুকে কাকেও দেখতে পেলাম না। মা বোধহয় তখন ঘাটে গিয়াছেন-কিংবা ওপাশের রান্নাঘরে কিছু করছেন। তা আর ডাকাডাকি করব কি, দাওয়ায় উঠে নিশ্চিন্তে শরীর এলিয়ে দিলাম। মা আসবেনই এধারে, এখনই। হঠাৎ তন্দ্রা ছুটে গেল। মাথার চুলের মধ্যে আঙুলের স্পর্শ পেলাম কার। মটকা মেরে পড়ে রইলাম। এ স্পর্শ অন্য কারও হতেই পারে না। এ আমার মায়ের হাতের স্পর্শ। এইটুকুর লোভেই এতটা পথ ছুটে এসেছি। ভিটকিলিমি করে চোখ বুজে পড়ে আছি, তখন কানে এল মায়ের গলার স্বর, “কখন এলি বাবা? একটা খবর দিয়ে আসতে হয়-ঘাটে নৌকো পাঠাতাম।” তবু চোখ বুজে

চুপটি করে শুয়ে আছি। যতক্ষণ এভাবে থাকব, ততক্ষণ মা মাথায় কপালে হাত বুলিয়ে দেবেন।

আবার কানে এল, শরীর ভালো আছে তো-রে খোকা? এসেই দাওয়ার উপর শুধু মাটিতে এভাবে শুয়ে পড়েছিস!" চাপা উৎকণ্ঠা মা'র গলায়। আর থাকতে পারলাম না, তড়াক করে উঠে বসে মায়ের পা দু-খানিতে হাত বুলিয়ে কপালে মাথায় ঠেকালাম। বললাম, 'ভয়ানক শরীর খারাপ হয়েছে মা, পেটের ভিতর বলে যাচ্ছে। তোমার ছেলের সারা শরীরের মধ্যে ওই একটা জায়গাতেই যা কিছু খারাপ ভালো হয়-আর তখন খালি তোমার কথা মনে পড়ে। দাও আগে কি খেতে দেবে দাও, নয়তো অনর্থ বাধিয়ে বসব।"

মা হেসে ফেললেন। আমার নিজস্ব সম্পদ আমার মায়ের মুখের সেই হাসি, যার সঙ্গে দুনিয়ার আর কারও মায়ের হাসি মেলেই না। হেসে ফেলে মা বললেন, "তবে উঠে পড় না, হাত মুখ ধুয়ে নে। সেই তো কাল সকালে ভাত খেয়েছিলি, এতটা পথ হেঁটে এলি, খিদে পাবে না!"

তবু উঠছি না, জ্বলুক পেটে, তবু যতক্ষণ মা'র কাছে বসে থাকা যায়।

অনেকদিন পরে আজ আবার চোখ বুজে শরীর এলিয়ে দিয়ে পড়ে আছি নিশ্চিন্ত হয়ে। মন আচ্ছন্ন হয়ে আছে একটি প্রত্যাশায়। আজ আবার মা এসে পাশে বসে মাথায় কপালে হাত বুলিয়ে দেবেন। আমার মা'র চাপা কণ্ঠস্বর শুনতে পাব, "কখন এলি বাবা, শরীর খারাপ করে নি তো?" তখন চোখ মেলেই মায়ের মুখের হাসিটি দেখতে পাব, যে হাসির সঙ্গে অন্য কারও মায়ের হাসি মেলেই না, যে হাসি আমার একান্ত নিজস্ব সম্পদ।

"নিন, বিড়ি নিন একটা।"

চোখ চাইতে হল। মায়ের হাসি কোথায় মিলে গেল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, "দাও।"

বিড়ি ধরানো হলে রূপলাল বললে, "একটা মহা অন্যায় করলাম। অঘোরী বাবা ভয়ানক চটে যাবেন।

আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, "কেন, কি হল আবার?"

একমুখ ধোঁয়া ছেড়ে রূপলাল বললে, "এই যে সোজা আপনাদের এনে তুললাম মায়ের স্থানে, এইটেই অন্যায় হয়ে গেছে। নিয়ম হচ্ছে, দিনের বেলা ঝরনার ওপারে থাকতে হবে। লক্ষ করেননি বোধ হয়, খানিকটা রাস্তার ধারে জঙ্গলের মধ্যে একখানা পাথরের ঘর আছে। ওখানেই সন্ধ্যা পর্যন্ত আমাদের থাকতে হবে। সেখানে রান্না খাওয়া সেরে সন্ধ্যার পর ঝরনা পার হওয়া হচ্ছে নিয়ম। আর ভোররাতে ব্রাহ্মমুহূর্তে মায়ের গুহা থেকে বেরিয়ে এসে তৎক্ষণাৎ ঝরনা পার হয়ে ওপারে চলে যেতে হবে।

বললাম, "তা নিয়ে গেলে না কেন আমাদের সেই জঙ্গলের মধ্যেকার ঘরে? বেশ তো, সন্ধ্যা পর্যন্ত না হয় আমরা সেখানেই কাটিয়ে আসতাম। কি দরকার ছিল বেআইনী কাজ করবার?"

রূপলাল একান্ত তাচ্ছিল্যের সঙ্গে উত্তর দিলে, "আরে রেখে দিন আপনার আইন কানুন। এবারের যাত্রায় চন্দ্রকূপে সব নিয়ম আমরা বিসর্জন দিয়ে এসেছি। নিয়ম হচ্ছে চন্দ্রকূপ বাধা দিলে আর এগোনো যাবে না। কতকগুলো লোকের ত পূজোই হল না সেখানে, বাবার হুকুমও নেওয়া হল না। তা কাউকে কি আমরা ফেলে এসেছি নাকি ওখানে? অঘোরী বাবাকে চন্দ্রকূপের ঘটনা বলে জিজ্ঞাসা করলাম, এখন কি করা উচিত? সবাই কি যেতে পারবে ওধারে? বাবা বললেন, 'আলবত পারবে। সোজা সবাইকে নিয়ে যা মায়ের স্থানে। তুই ব্যাটা কালকের বাচ্চা, তুই নিয়মের কি বুঝবি?' তখন সবাইকে নিয়ে অঘোর নদী পার হয়ে চলে এলাম। কিন্তু দিন থাকতেই যে মায়ের গুহায় চলে এলাম, এতে হয়তো অঘোরী বাবা ভয়ানক চটে যাবেন।" বললাম, "তা বেশ তো এখন আবার চলো, সবাই চলে যাই সেই পাথরের ঘরে; আবার সন্ধ্যার পর আসা যাবে।"

রূপলাল বললে, হ্যাঁ, এখন আবার কেউ যেতে রাজি হবে নাকি সেখানে। সেখানে গিয়ে ঘর পরিষ্কার করতে করতেই সন্ধে হয়ে যাবে। তার চেয়ে এক কাজ করুন, অঘোরী

বাবা যদি জিজ্ঞাসা করেন, কেন দিনের বেলা এলি এখানে, তখন আপনাকে আমি দেখিয়ে দেব, বলব কি করব, এই দলের মোহন্ত যদি জেদাজেদি করেন দিনের বেলা এখানে আসবার জন্যে, তখন আমি ছড়িদার পাণ্ডা মানুষ-আমি কি করতে পারি। তারপর আপনি সামলাবেন।"

কিছুক্ষণ চুপ করে ছোকরার মুখের দিকে চেয়ে রইলাম। তারপর বললাম, "বেশ, তাই হবে। অঘোরী বাবাকে আমি সামলাব। তুমি তোমার যাত্রীদের সামলাও। ঝরনার এপারে কেউ যেন থুতুও না ফেলে। যার যা দরকার হবে ওপারে গিয়ে করে আসবে।"

রূপলাল উঠে গেল সবাইকে সাবধান করতে। সুখলাল এসে বললে, "চলুন আবার ঝরনার ওপারে। ওখানে চা বানানো হয়ে গেছে।

"এখানেও চা বয়ে এনেছ তুমি?"

সুখলাল প্রসন্ন হাসি হেসে বললে, "শুধু চা কেন, মায়ীজি কিশমিশ খেজুর আখরোট সব এনেছেন চিরঞ্জীলালের ঘাড়ে চাপিয়ে। সবাই ওপারে চলে গেছে, সেখানে জল খেয়ে তবে আবার আসবে।"

উঠে দাঁড়িয়ে চারিদিকে চেয়ে দেখি একটি প্রাণীও নেই। শুধু ঝুলিগুলি পড়ে আছে। সুখলালের হাত ধরে শেওলা-পড়া পাথরের উপর সাবধানে পা ফেলে আবার সেই তিন হাত জল পার হলাম।

এপারের একটা পরিষ্কার জায়গায় কুন্তী চা চড়িয়েছে ছোট ডেকচিটায় ৷ তার পাশে ভৈরবী আঁচল পেতে শুয়ে পড়েছেন। আর সবাই চারিদিকে ঘিরে বসেছে। বড় কলকেয় আগুন দেয়া হয়েছে। বেশ খানিকটা নিশ্চিন্ত ভাব সবাই-এর চোখে মুখে ফুটে উঠেছে—যেন ছুটির দিনে চড়ুইভাতি করতে এসেছে সবাই। পোপটভাই সাদর অভ্যর্থনা করলেন—"আসুন আসুন বসে পড়ুন এধারে।" বললাম, "তবে যে শুনেছিলাম আমরা আজ উপোস করে থাকব? শুয়ে শুয়েই ভৈরবী উত্তর দিলেন "কেন? উপোস করে মরতে যাব কেন গুষ্টিসুদ্ধ সবাই মায়ের স্থানে এসে? আজ ভালো করে খাওয়া-দাওয়া করবার দিন। কিছু নেই সঙ্গে, তা আর কি করা যাবে। যা আছে তাই এক এক মুঠো খেয়ে জল খাওয়া যাক। সেই ভোররাতে দর্শন, ততক্ষণ না খেয়ে শুকিয়ে থেকে কি লাভ।

উপোস করে থাকলে কি লাভ হয় আমিও জানি না; উপোস-তত্ত্ব সম্বন্ধে জ্ঞান আছে ডাক্তারদের, যাঁরা পঞ্জিকা ছাপান তাঁদের, আর দেশের সরকারি কর্তাদের। প্রথম দল বলেন, উপোস করলে রোগ সারে। দ্বিতীয় দল বিধান দেন, উপোসে পাপ কমে। আর তৃতীয় দল আইন বানান, কম খাও, উপোস করো, মুখ বুজে উপোস করে মরো, পেট ভরে খেতে চাওয়া আইনত দণ্ডনীয় অপরাধ। তা আমি ওই তিনদলের কোনো দলে স্থান পাব না। কাজেই মাথা চুলকোতে লাগলাম।

শ্রীমতী কুন্তীদেবী একাই একশ। কোমরে আঁচল জড়িয়ে ছুটোছুটি করছে। একে আরও দুটো খেজুর, ওকে কিশমিশ একমুঠো বেশি, আবার কাউকে বা শুধু মিষ্টি ধমক দিয়ে সন্তুষ্ট করছে। শুয়ে শুয়েই ভৈরবী সাবধান করে দিলেন, "সব দিয়ে ফেলিস না, সুখলালের জন্য কিছু যেন থাকে। রাতে আবার ওকে খাওয়াতে হবে।"

চায়ের গেলাস হাতে করে বসে বসে দেখছি আর ভাবছি, ফিরে গিয়ে কোথাও আশ্রম ফাঁদলে এ মেয়ে বেশ চালাতে পারবে। শুধু এ মেয়ে নয়, পৃথিবীসুদ্ধ মেয়েরাই এই একটিমাত্র কাজ সহজে সুশৃঙ্খলে অবলীলাক্রমে সমাধা করতে পারে, আর তা করে তৃপ্তিও পায়। যদি বলি গৃহের মধ্যে গৃহিণীপনা করাতেই নারীজীবনের চরম সার্থকতা, তাহলে আমারও যেমন বাড়াবাড়ি করা হবে, তেমনি অবিলম্বে লগুড় হাতে তেড়ে আসবেন আর একদল, যাঁরা কায়মনবাক্যে কামনা করেন যে ভবিষ্যৎ হাওড়া পুলের মাথাটা যখন জোড়া হবে, তখন সেখানে উঠে ঝুলতে ঝুলতে হাতুড়ি-ঠোকা কর্মটি দাড়িওয়ালা পাঞ্জাবী ভ্রাতাদের বদলে বেণী-ঝোলানো মেয়েরাই করবে। তা করুক, আর তাতে যদি মেয়ে-পুরুষের সমান অধিকার নিয়ে বিটকেল খেয়োখেয়িটা ঠাণ্ডা হয় তো হোক। তবু সবিনয়ে নিবেদন করব যে, যতদিন

না সারা দুনিয়ার সবাই হোটেলে খেতে আর সরাইখানায় শুতে শুরু করছে ততদিন গৃহ থাকবেই। তখন গৃহ বাঁধলেই প্রয়োজন হবে গৃহিণীর। ওর একটিকে ছেড়ে অপরটির কোনো সার্থকতা নেই।

দেশময় বড় বড় হোটেল আর প্রসূতিভবন বানাতে পারলে রান্নাঘর আর আঁতুরঘরের হাত থেকে রেহাই পেয়ে আমরা হাঁফ ছেড়ে বাঁচব এ কথা আমিও মানি। ঘর-থেকে-মুক্তি-পাওয়া মেয়েরা কামান বন্দুক এরোপ্লেন চালিয়ে কত বড় বড় বীরত্ব দেখাচ্ছেন সে সব কাহিনী শুনতে শুনতে আমারও সর্বশরীর রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। তখনকার গার্গী-মৈত্রেয়ী আর এখনকার অনারেবল মিনিস্টার শ্রীমতী লক্ষ্মীহীরা সুব্রহ্মণ্য আয়ার এম ডি, ডি টি এম, ডি এস-সি, পি এইচ ডি-এঁদের সকলের কাছেই আমি শ্রদ্ধায় মাথা নত করি। সঙ্গে সঙ্গে তাঁদের কথাও ভুলতে পারি না, যাঁরা কোটি কোটি গৃহের মধ্যে মা বোন স্ত্রী কন্যা রূপে নীরবে নিঃশব্দে সারাজীবন কাটিয়ে দিচ্ছেন শুধু এত বড় মনুষ্যসমাজকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে। এঁরা ঘরে বন্ধ রয়েছেন এই দুঃখে কত ঘটি চোখের জল যে এ পর্যন্ত পড়েছে এবং ভবিষ্যতে আরও কত ঘটি পড়বে তার ইয়ত্তা নেই। তবু ভেবে পাই না এঁরা সবাই যেদিন ঘর ছেড়ে পথে নেমে দাঁড়াবেন, সেদিন ঘরের প্রাণ থাকবে কেমন করে! মা বোন স্ত্রী কন্যা এঁদের কাছে যা আমরা চাই আর পাই তা তখন পাওয়া যাবে কোথায়? এত বড় প্রয়োজনের দাবি সেদিন মেটাব কি দিয়ে? হাওড়া পুলের মাথায় দাড়ির বদলে বেণীকে হাতুড়ি ঠুকতে দেখেই কি তখন আমরা ঘরের অভাব ভুলতে পারব?

চায়ের গেলাসে চুমুক দিতে দিতে সেই কথাই ভাবছিলাম। ভাবছিলাম আমাদের এই পুণ্যকামী দলটিতে একটি কুন্তী বহিনের অভাব সত্যিই ছিল। ভাগ্যক্রমে কুন্তী এসে জুটেছিল আমাদের সঙ্গে। তা না হলে এই মায়ের স্থানে এসে আজ আমরা গোমড়া মুখ করে কলকে হাতে নিয়ে আত্মচিন্তায় ডুবে থাকতাম, কিংবা কখন রাতটা শেষ হবে আর মায়ের গুহা থেকে বেরিয়ে এসে আমরা এ স্থান থেকে বিদায় নেব সেই চিন্তায় ছটফট করতাম। তাতে তীর্থস্থানের মর্যাদা হয়তো ষোল আনাই রক্ষা পেত, কিন্তু এত দুঃখ কষ্ট সহ্য করে এখানে পৌঁছে কতটুকু শান্তি আর আনন্দ লাভ করতাম আমরা তা কে বলতে পারে। ওই যে ওই মেয়েটিকে ঘিরে বসে ছেলেমানুষের মত "কুন্তী বহিন, আমায় আরও দুটো খেজুর দাও, আমায় আরো দুটো আখরোট দাও" বলে হই-চই করছে সকলে, ও না এলে এ সমস্ত তো কিছুই হত না এখানে। বিজ্ঞ লোকে বলেন- "যদি ওই সমস্তই চাও, তবে অত কষ্ট করে অত বড় মহাতীর্থে কেন গেলে বাপু? লেকের ধারে গেলেই তো পারতে।" তাঁদের চেয়ে বিজ্ঞ যাঁরা, যাঁরা বলেন 'নারী নরকের দ্বার', তাঁরা নাক সিঁটকে বলে উঠবেন, 'ছি ছি ছি, ওখানে গিয়েও ওই সব হ্যাংলামো গেল না?' এঁদের কথা মাথা নিচু করে মেনে না নিয়ে উপায় নেই। কিন্তু এই যে আজ এতগুলি সন্তানের হাসি চিৎকার আনন্দ উল্লাসে মায়ের স্থানটি গমগম করছে, জগৎজননীর কাছেও কি এর কোনো মূল্য নেই? মা কি সত্যই এ কামনা করেন যে, তাঁর প্রতিটি ছেলেমেয়ে অযথা জ্ঞানার্জন করে গোমড়ামুখো কাঠগোঁয়ার হয়ে উঠুক, হয় জননীর জাতকে ঘৃণা করতে শিখুক, নয় বিলাসের উপকরণ বলে মনে করুক? আমরা আজ আনন্দময়ী মায়ের স্থানে এসেও যদি একবার প্রাণ খুলে না হাসতাম, শুধু 'ব্রহ্ম সত্য জগৎ মিথ্যা' ইত্যাদি বড় বড় তত্ত্ব আলোচনায় চুল ছেঁড়াছিঁড়ি করে সময়টুকু কাটিয়ে দিতাম, তাহলে কি সত্যই জননী খুশি হতেন?

মা যে কিসে খুশি হন আর কিসে হন না এ এক সমস্যা বটে। সেই রাত্রেই হিংলাজের আঙিনায় শুয়ে বোধ হয় এ মহাসমস্যার একটা সহজ সমাধানও পেয়েছিলাম।

চাদর মুড়ি দিয়ে সকলেই শুয়ে পড়েছে মা'র আঙিনায়। শেষরাতের দিকে অঘোরী বাবা যখন আসবেন তখন উঠে স্নান করে নতুন কাপড় পরে ব্রাহ্মমুহূর্তে মায়ের গুহায় ঢুকতে হবে। নিশ্চিন্ত হয়ে সকলে শুয়ে বসে আছি। রূপলাল আর সুখলাল ওধারে মায়ের জন্যে ভোগ রাঁধছে। আমার পাশে বসে পোপটভাই আর ভৈরবী বকবক করছেন। সবই কানে আসছে।

প্যাটেল জিজ্ঞাসা করলেন, "তাহলে কুন্তী কি আপনার সঙ্গেই থাকবে মা? ওকে নিয়ে গিয়ে কোথায় দেবেন আপনারা?

ভৈরবী বললেন, "ওমা, আমার কাছে থাকবে না তো বাছা যাবে কোথায়?"

একটু চুপ করে থেকে পোপটভাই বললেন, "কিন্তু আপনি জানেন তো, মেয়েটার জাত গেছে। স্বভাব চরিত্রও ভালো নয়। সেই ছোকরা থিরুমল ওর-"

ভৈরবী তাঁকে থামিয়ে বললেন- "জানি, সবই জানি বাবা। কিন্তু সে সমস্ত হাঙ্গামা তো আমার সঙ্গে দেখা হবার আগেই ঘটে গেছে ওর জীবনে। তার হিসেব নিয়ে আমার মাথা ঘামিয়ে লাভ কি? সে হিসেব মায়েরা রাখে না। তা রাখলে কুন্তী এল কি করে এখানে? জগৎজননী সতী-মায়ের এই স্থান। সেই মা তো ওর উপর দয়া করলেন। তাঁর দয়ায়ও শেষ পর্যন্ত এসে পৌঁছল এখানে। এর পরেও কি ওর কোনো পাপ থাকতে পারে নাকি? আর জাতের কথা বলছ বাবা-মায়ের কাছে ছেলেমেয়ের কিছুতেই জাত যায় না। মায়ের কাছে সন্তানের আবার ভিন্ন ভিন্ন জাত আছে নাকি! মায়ের কাছে ছেলেরা হচ্ছে ছেলের জাত। আর ছেলের কাছে মায়েরা হচ্ছে মায়ের জাত। তা কুন্তী তো আমায় মা বলেছে। ওর জাত গেলে আমারও যে জাত থাকে না!"

পোপটভাই-এর আরও প্রশ্ন ছিল, "কিন্তু ওর কি কিছু হবে মা? দেখবেন আবার ও কারও সঙ্গে একটা কিছু করে আপনার অপমান করবে।"

শব্দ করে হেসে উঠলেন ভৈরবী। বললেন, 'আমার আবার অপমান করবে কি ও বেটী? কারও সঙ্গে আবার যদি কিছু ঘটায় তাতে আমার কি ক্ষতি হবে? ও নিজেই আবার জ্বলেপুড়ে মরবে। যতদিন হেসে খেলে মেয়ের মতো আনন্দ করে থাকবে আমার কাছে, ততদিন আমি ওকে বুকে দিয়ে আগলে রাখব। যেদিন ও আমাকে ভুলে গিয়ে অন্য কিছু নিয়ে মেতে উঠবে সেদিনও আমি বাধা দেব না। ছেলেমেয়েরা কি চিরকাল মাকে নিয়ে ভুলে থাকতে পারে বাবা? তা কখনো সম্ভব নয়। না হয় একটু ঘা খেয়েছে, তা বলে ওতেই ওর চিরকালের জন্যে সংসারের উপর ঘেন্না হয়ে গেছে? এতটা আমি আশা করব কেন? পাঁচজনের পাঁচরকম দেখে ও যদি তখন নিজের ভালোমন্দ বুঝে আবার কারও সঙ্গে পা বাড়ায়, তাতে আমার কি ক্ষতি হবে? যে কদিন ও আমার কাছে থেকে নিজে শান্তি পাবে, ততদিন আমিও শান্তি পাব ওকে নিয়ে। তারপর ও কোথাও ভালো ভাবে শান্তিতে আছে এইটুকু জানতে পারলেই আমার শান্তি।"

আরও অনেকে কথাবার্তা হল ভৈরবীর সঙ্গে পোপটলালের। কিন্তু আর আমার কানে কিছু ঢুকল না। আমি তখন চাদর চাপা দিয়ে শুয়ে মাকেই বার বার বলতে লাগলাম, 'তাই করো মা, তাই করো। আমরা যেন কেউ কাকেও ছোট বা বড় না দেখি। ওই বরিশেলে অজমূর্খ ভৈরবীর মুখ দিয়ে যা তুমি আজ আমায় শোনালে, জগৎজোড়া তোমার সব কটি ছেলেমেয়ে যেন ওইটুকু মেনে চলে। মায়েরা হচ্ছে মায়ের জাত আর ছেলেরা হচ্ছে ছেলের জাত। ছেলেমেয়ে যতদিন মাকে নিয়ে ভুলে থাকে ততদিন মায়ের শান্তি। সব চেয়ে বড় কথা হচ্ছে, ছেলেমেয়ের জাত গেলে মায়েরও যে জাত যায়। পাপ-পুণ্য, ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায় এই সব বিদঘুঁটে সমস্যার এর চেয়ে সহজ সরল সমাধান আর কোথায় খুঁজে পাওয়া যাবে!

ঘোর অন্ধকার।

রাত্রির শেষ প্রহর। ঝরনার জল ঘটি করে মাথায় ঢেলে স্নান করে নতুন কাপড় পরে অনেকগুলো ধাপ উঠে আমরা গুহার মধ্যে গিয়ে দাঁড়ালাম। গুহার একেবারে শেষ সীমায় মা হিংলাজের বেদী, অনেক উঁচুতে ছাত। একটিমাত্র প্রদীপ জ্বলছে বেদীর উপর। তাতে ছাদের নীচে আর বেদীর চারপাশে অন্ধকার জমাট বেঁধে রয়েছে। প্রদীপের আলোয় দেখা যাচ্ছে লাল সালুতে মোড়া বেদী। মেওয়া মিছরি নারকেল সাজানো হয়েছে বেদীর উপর। মাঝখানে বসানো হয়েছে ঘি আটা চিনি আর মেওয়া দিয়ে বানানো মস্ত বড় লোটাটা। অনেকগুলো রক্তকরবী ফুল ছিটিয়ে দেওয়া হয়েছে চারপাশে। মোমবাতিগুলোও বসানো হয়েছে বেদীর চতুর্দিকে, এখনও জ্বালিয়ে দেওয়া হয়নি। রূপলাল আর সুখলাল তখনও কি করছে বেদীর

পাশে দাঁড়িয়ে।

আমরা বেদীর সামনে জোড়হাতে ঘেঁষাঘেঁষি করে দাঁড়িয়ে আছি। বার বার নজর করে দেখবার চেষ্টা করেছি কি আছে বেধীর ওধারে! আরও কতদূর যাওয়া যায় ওই অন্ধকারের মধ্যে? বেদীর পিছনের ওই অন্ধকারের মধ্যেই কি জ্যোতিদর্শন হবে? চোখের পলক পড়ছে না, রুদ্ধ নিশ্বাসে চেয়ে আছি-কখন জ্যোতিদর্শন হবে!

অনেকক্ষণ ওই ভাবে কাটল। হঠাৎ কানে গেল, 'বাচ্চা, এখন সময় হয়েছে। শরীরের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ খেলে গেল। কে বললে ও কথা? কিসের সময় হয়েছে? কি হবে এবার?

বেদীর উপর থেকে রূপলাল প্রদীপটা তুলে নিল। প্রদীপ হতে আমাদের সামনে দিয়ে বাঁ দিকে খানিকটা এগিয়ে গেল। এবার কানে এল রূপলালের গলার স্বর

"প্রথমে আসুন স্বামীজি মহারাজ। আপনি এই দলের মোহন্ত। আপনাকেই সর্বপ্রথম যেতে হবে মায়ের গুহার মধ্যে।"

এগিয়ে গেলাম রূপলালের কাছে। ভৈরবীও এসে পাশে দাঁড়ালেন।

হাতের প্রদীপটা রূপলাল নিচু করে ধরলে। তখন চোখে পড়ল প্রদীপের পিছনে দেওয়ালের গায়ে একটি ছোট গহ্বর।

সেই গহ্বরের মুখে প্রদীপ ধরে রূপলাল বললে-'এই হচ্ছে মা হিংলাজের গুহা। হামাগুড়ি দিয়ে যেতে হবে এই গুহার মধ্যে। এই গুহার এধারে একটা মুখ আর একটা মুখ বেদীর ওপাশে। এই গুহার উপরই বেদী, মায়ের আসন। কোনো ভয় নেই, সাবধানে আস্তে আস্তে যাবেন। মাথায় যেন পাথরের ঘা না লাগে। যান, ঢুকুন এবার।"

প্রদীপটা আরো একটু নামিয়ে ধরলে রূপলাল।

সেই অন্ধকার গুহার মধ্যে একবার চাইলাম। পিছন করে ভৈরবীর মুখের দিকে চাইলাম। অন্ধকারে তাঁর মুখ দেখা গেল না। প্রদীপশিখাটার দিকে চেয়ে রইলাম। আবার কানে এল রূপলালের গলা–

"যান, চলে যান এবার। মাকে দর্শন করে আসুন।"

'মাকে দর্শন করে আসুন' কথাটা শুনে সর্বশরীরের ভিতর দিয়ে বিদ্যুৎ ছুটে গেল। চোখের সামনে ভেসে উঠল মায়ের মুখখানি। সেই আধ হাত চওড়া লালপাড় শাড়ির ঘোমটা, কপালে ডগডগে সিন্দুরের ফোঁটা, একমুখ পানদোক্তাসুদ্ধ আমার মায়ের মুখের সেই হাসি, আমার মায়ের সেই চোখের দৃষ্টি! আমার দিকে চেয়ে মা হাসছেন। বসে পড়লাম হাঁটু গেড়ে গুহার মুখে। এক মুহূর্ত ইতস্তত না করে হামাগুড়ি দিয়ে ঢুকে পড়লাম।

বোধ হয় পাঁচ মিনিটও নয়। হঠাৎ বেরিয়ে এলাম বেদীর এপাশে। প্রদীপ হাতে রূপলাল এধারে এসে দাঁড়িয়েছে। আমার সে হাত ধরে টেনে তুলে দাঁড় করালে। লম্বা একটা নিঃশ্বাস টেনে নিলাম বুকের মধ্যে। কানে এল-"যা কিছু দেখতে পেয়েছিস গুহার মধ্যে, জীবনে তা কথা না প্রকাশ করিসনি কারও কাছে। সাবধান ব্যাটা, মায়ের এ আদেশ ভুলবি না।"

আবার চমকে উঠলাম। কে বললে এ কথা? এবার কিছুই ভুল হল না। অন্ধকারের মধ্যে নজর করে দেখতে পেলাম আমার দু হাত দূরেই বেদীর পাশে গুহার দেওয়ালে ঠেস দিয়ে অঘোরী বাবা মালা হাতে দাঁড়িয়ে আছেন। কালো আলখাল্লায় তাঁর সর্বাঙ্গ ঢাকা। সাদা চুলদাঁড়ির জন্যে তাঁকে চেনা গেল।

রূপলাল বললে, "এবার স্পর্শ করুন মায়ের বেদী। আপনার মালা দুগাছা মায়ের বেদীর উপর দিন।"

দু-হাতে মায়ের বেদী স্পর্শ করলাম। মালা আমার নেই। সন্ন্যাসীর কিছুই থাকতে নেই যে। বেদীর উপর মাথা ঠেকিয়ে পিছিয়ে এলাম।

প্রদীপ হাতে আবার ওপাশে চলে গেল রূপলাল। এবার ভেরবীর পালা। পাঁচ মিনিট পরে ভৈরবীও বেরিয়ে এলেন একপাশের মুখ দিয়ে। দু-ছড়া মালা রাখলেন বেদীর উপর। তার একছড়া তুলে নিয়ে রূপলাল ভৈরবীর হাতে দিলে। বললে, "গলায় দিন মালা। এ মালা যতদিন গলায় থাকবে ততদিন মা হিংলাজের দয়ায় কোনো বিপদ-আপদ হবে না। মায়ের

দয়ায় সমস্ত আশা পূর্ণ হবে।”

মালা গলায় দিয়ে কি জানি কেন ভৈরবী আমার পায়ে একটা প্রণাম করলেন।

রূপলালের গলা শোনা গেল, “কুন্তী বহিন, এসো এবার।” তারপর একে একে সকলের নাম ডাকা হতে লাগল। দাঁড়িয়ে আছি প্রদীপশিখার দিকে চেয়ে। চেয়ে থাকতে থাকতে একটা অদ্ভূত ব্যাপার ঘটল। প্রদীপশিখাটা আমার মধ্যে জ্বলতে আরম্ভ করল। আরও কিছুক্ষণ পরে আমি নিজেই সেই শিখার সঙ্গে মিলিয়ে গেলাম। এখন আর কিছুই নেই, শুধু সেই শিখাঁটি। স্থির অচঞ্চল এক আঙুল উঁচু সেই শিখা। ক্রমে সেই শিখার তেজ বাড়তে লাগল, বাড়তে বাড়তে তার উজ্জ্বলতা এমন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠল যে তার দিকে চেয়েই থাকা যায় না। টপ করে চোখ বুজে ফেললাম। এবং এ জীবনের মারাত্মক ভুল হল সেই চোখ বুজে ফেলা। তৎক্ষণাৎ আমি আর প্রদীপশিখা আলাদা হয়ে গেলাম। সব শেষ হয়ে গেল। আবার যেখানকার মানুষ সেখানেই ফিরে এলাম।

ছড়িওয়ালা রূপলাল তখন বলছে, “এবার যান আপনারা, নিজের নিজের ঝোলা কাঁধে নিয়ে দাঁড়ান বাইরে গিয়ে। কোনো জিনিস যেন পড়ে না থাকে। সূর্যদেব উদয় হচ্ছেন। হিংলাজের মোহন্ত মহারাজ এবার আপনাদের এই তীর্থের সর্বশেষ দর্শন যেটি সেটি করবেন। সঙ্গে সঙ্গে আপনারা হিংলাজের দিকে পিছনে ফিরে ঝরনা পার হয়ে ওপারে চলে যাবেন। সাবধান, কেউ ভুলেও মায়ের স্থানের দিকে আর ফিরে চাইবেন না–”

আর একবার শেষবারের মতো হিংলাজের বেদীর দিকে ফিরে চাইলাম। কিছুই নেই আর সেখানে। শুধু লাল সালুর উপর রক্তকরবী ফুলগুলি ছড়ানো রয়েছে। প্রদীপটিও নেই, তার বদলে বেদীর চতুর্দিকে জ্বলে উঠেছে অনেকগুলি মোমবাতি মোমবাতির আলোয় স্পষ্ট দেখা গেল সব কিছু। বেদীর উপরের ত্রিশূল পোঁতা রয়েছে, ত্রিশূলের পিছনেই পাথর। ওই পাথর আর পাথর আর পাথর-এবড়ো খেবড়ো পাথরের চাঙড়, কদর্য-বীভৎস। একেবারে উঠে গেছে ছাত পর্যন্ত মোমবাতির আলোয় সবই স্পষ্ট দেখা গেল। আর কোনোরকমে ভুল ধারণা করবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই। আর কিছুই আশা করা করবার নেই এখানে। এবার জলজ্যান্ত সত্যর জগতে ফিরে এলাম। মা হিংলাজের গুহার উপর ওই বেদী। মা হিংলাজের গুহা কিন্তু চিরঅন্ধকারময়। সেই অন্ধকার জগতে ফিরে যাওয়া যাবে না। একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে বেদীর উপর কপাল ঠেকিয়ে বেরিয়ে এলাম। তারপর ধাপগুলোর উপর দিয়ে নেমে এলাম আঙিনায় এবং ফেলে রেখে যাওয়া ঝোলাঝুলি আবার কাঁধে তুলে নিলাম।

“এবার সকলে চোখ তুলে চেয়ে দেখো এই পাহাড়ের চূড়ায়” বললেন অঘোরী বাবা। বাবা বেরিয়ে এসে দাঁড়িয়েছেন ধাপগুলোর মাথায় গুহার সামনে। মালাসুদ্ধ হাতটি উঠিয়ে আবার বললেন তিনি, “ঐ উপর দিকে চেয়ে দেখো। কী দেখছ?”

আলো এসে পড়েছে পাহাড়ের মাথায়। আকাশের দিকে মুখ তুলে চেয়ে দেখছি একখানা প্রকাণ্ড পাথর। পাথরখানা বেশ খানিকটা বেরিয়ে এসেছে পাহাড়ের গা থেকে।

‘দেখছ সকলে ভালো করে চেয়ে দেখ ওই পাথরের গায়ে কি আঁকা আছে। ওখানে পাহাড়ের গায়ে আঁকা আছে চন্দ্র আর সূর্য! ভগবান রামচন্দ্র এঁকে দিয়ে গেছেন নিজ হাতে। তিনি যে এখানে এসেছিলেন তার চিহ্ন রেখে গেছেন পাহাড়ের গায়ে চন্দ্র-সূর্য এঁকে দিয়ে। ভেবে দেখো, কি করে ওই অসম্ভব সম্ভব হল-কি করে ওই অত উঁচুতে পাথর কেটে চন্দ্র-সূর্য আঁকলেন তিনি। এ কি অন্য কারও দ্বারা সম্ভব? ওই অসম্ভব কাজ একমাত্র ভগবান রামচন্দ্রের দ্বারাই সম্ভব হয়েছিল। এই পৃথিবীতে যতকাল চন্দ্র-সূর্য থাকবে ততকাল এই হিংলাজ পাহাড়ের চূড়ায় আঁকা চন্দ্র সূর্যও থাকবে। আর মানুষ এখানে এসে চাক্ষুষ প্রমাণ পাবে যে, একসময় ভগবান শ্রীরামচন্দ্রও এই তীর্থ দর্শন করতে এসেছিলেন। রাক্ষস রাবণ ছিল ব্রাহ্মণসন্তান। রাবণ বধ করে রামচন্দ্রের ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়েছিল। সেই পাপ থেকে তিনি মুক্তিলাভ করেন এখানে জ্যোতিদর্শন করে।”

অঘোরী বাবা থামলেন। আমরা আকাশের দিকে মুখ তুলে চেয়ে রইলাম পাহাড়ের কপালের উপর। হ্যাঁ, আছেই তো! গোল দুটো কি যেন আঁকা রয়েছে যেখানে। আলো এসে

পড়েছে তার উপর। লাল হয়ে উঠেছে সেখানটা। ভগবান রামচন্দ্রের আঁকা চন্দ্র এসে পড়েছে তার উপর। লাল হয়ে উঠেছে সেখানটা। ভগবান রামচন্দ্রের আঁকা সূর্যের গা থেকে ছটা বেরুচ্ছে। সত্যিই ভেবে পাওয়া যায় না ওখানে পৌঁছলেনই বা কি করে, আর পাহাড়ের গায়ে ছেনি দিয়ে হাতুড়ি ঠুকে ও-কাজ করলেনই বা কিসের উপর দাঁড়িয়ে! সবই সম্ভব। ভগবানদের দ্বারা সব সম্ভব। ছুঁচের গর্তে হাতী চালানো যখন সম্ভব, তখন কি সম্ভব তাঁর দ্বারা! শুধু মানুষের বুদ্ধিবিবেচনাগুলোকে একটু ভোঁতা করে নেওয়া চাই। তা হলেই হল। 'বিশ্বাসে মিলায় বস্তু, তর্কে বহুদূর।"

অঘোরী বাবা বলতে লাগলেন আর সকলে সমস্বরে আওড়াতে লাগল এক লম্বা ফিরিস্তি- আমি অমুকের ছেলে অমুকের নাতি-আমি হাব নদীর ধারে সন্ন্যাস নিয়ে তবে হিংলাজ দর্শনে যাত্রা করেছি। সে সন্ন্যাস আমি এখনও রক্ষা করছি। আমি গুরুশিষ্যের স্থানে জল দিয়েছি, চন্দ্রকূপে গিয়ে বাবার আদেশ নিয়েছি। আরও কত কি করেছি সে সব বলে শেষ করে তারপর হিংলাজের গুহায় ঢুকে মাকে দর্শন করেছি। সুতরাং আমার যাবতীয় জ্ঞাত অজ্ঞাত পাপ, সেই পাপেদের আর এক প্রস্থ লম্বা ফর্দ বলে তারপর বলতে হবে জন্ম-জন্মান্তরে পাপের কথা-সেই সমস্ত পাপ বিলকুল ধুয়ে মুছে সাফ হয়ে গেল মাতৃদর্শনের ফলে।

অঘোরী বাবা মালসুদ্ধ ডান হাত তুলে আশীর্বাদ করলেন, "তোমাদের জয় হোক। যাও, এবার বাড়ি ফিরে যাও।"

তিনবার জয়ধ্বনি দিয়ে আমরা পিছনে ফিরলাম। রক্তকরবীর ঝাড়ের মাঝখানে সরু পথ দিয়ে বেরিয়ে এসে ছোট ঝরনাটি পা টিপে টিপে সাবধানে পার হলাম।

মনটা ভয়ানক ভার হয়ে উঠল। কেন? এ 'কেন'র উত্তর দেওয়া সহজ নয়। সব 'কেন'র উত্তর খুঁজে পেলে দুনিয়ার সব কিছুর মূল্যও কমে এই এতটুকু হয়ে যেত।

হিংলাজ দর্শন করলে আকাশগঙ্গাও দর্শন করতে হয়। ঝরনার এপার এসে আবার আমরা কাঁধের ঝুলি নামালাম। রূপলাল কপালে সিন্দূর দিয়ে হাতে হিংলাজের প্রসাদ দিলে সকলকে-মেওয়া মিছরি নারকেল লোটের টুকরো। এবার চলো সকলে আকাশগঙ্গায়। এই পাহাড় ভেঙ্গে উঠতে হবে। এই পাহাড়ের মাথায় আকাশগঙ্গা। সেই আকাশগঙ্গার জলই নেমে আসছে ঝরনা দিয়ে। আকাশগঙ্গাও মহাতীর্থ 1 আকাশগঙ্গার ধারে আছে এক রকমের গাছ, যার ডাল নিয়ে আসতে হবে। সে জিনিস চক্ষুরোগের মহামূল্যবান ওষুধ; আকাশগঙ্গার জল দিয়ে সেই ডাল ঘষে চোখে অঞ্জন দিলে কানাও দৃষ্টিশক্তি ফিরে পায়।

তা পাক। কানাদের দৃষ্টিশক্তি ফেরাবার জন্যে আবার এখন জঙ্গলের ভিতর দিয়ে এই পাহাড়ের মাথার চড়বার শক্তিসামর্থ্য নেই ভৈরবীর। আকাশগঙ্গার জল নেবার মতো কিছু নেইও আমাদের সঙ্গে। খামকা আর কষ্ট না করে ভৈরবী এখানে বসেই একটু বিশ্রাম করবেন, যতক্ষণ না আমরা আকাশগঙ্গা থেকে ফিরে আসি।

রূপলাল বললে, "আমরা তো আর এধার দিয়ে ফিরব না। আকাশগঙ্গা থেকে আর একটা পথ আছে, অঘোর নদী পর্যন্ত। সেই পথেই আমরা নেমে যাব।"

কুন্তী বললে, "ঠিক হ্যায়। আমরাও একটু আরাম করে নিয়ে চলে যাচ্ছি নদীতে আমরা নদী পর্যন্ত যেতে পারব, এ পথ তো সোজা চলে গেছে নদীতে। কোনো কষ্ট হবে না আমাদের।"

সুতরাং আমিও বললাম, "তবে সেই ভালো। যাও তোমরা আকাশগঙ্গায়। আমরা নদীর পাড়ে গিয়ে তোমাদের জন্য অপেক্ষা করব।"

রূপলাল বললে, "উহুঁ-অপেক্ষা করবেন কেন আমাদের জন্যে? আপনারা যেখানে নদী পার হবেন আমরা তো সেখানে পার হব না, তার অনেক উপরে নদী পার হব। আপনার নদী পার হয়ে অঘোরী বাবার স্থানে চলে আসবেন। আপনারা যেখানে পার হবেন নদী, সেখান থেকে নদীর উপর দিকে খানিকটা গেলেই অঘোরী বাবার স্থান। অঘোরী বাবার স্থানে আমরা আপনাদের জন্যে বসে থাকব।"

তখন ভৈরবী বার বার সাবধান করলেন, সুখলাল যেন কোথাও আছাড়টাছাড় না খায়। রূপলাল, পোপটভাই আমাদের সাবধান করলেন সাবধানে যেন আমরা যাই, নদীটা যেন সাবধানে পার হই, আর বেশি দেরি যেন না করি।

ওরা আর একবার জয়ধ্বনি দিয়ে জঙ্গলের মধ্যে অদৃশ্য হয়ে গেল। আমরাও একটু পরে উঠে এলাম। তাড়াতাড়ি নদী পার হয়ে মায়ের প্রসাদ খাওয়া যাবে।

আবার সেই যক্ষপুরীর ভিতর ঘুরতে আরম্ভ করলাম। কিন্তু এবার আর তত ভয়ঙ্কর মনে হল না দু-পাশের পাহাড়ের দৃশ্য। পথও চট করে ফুরিয়ে গেল। সামনেই অঘোর নদী। এ ঠিক সেই জায়গা যেখানে আমরা আসবার সময় নদী পার হয়েছিলাম।

এবার একটা মতলব ঠাওরানো হল যাতে কুন্তীকে আর নাকানি-চোবানি খেয়ে জল গিলতে না হয়। কুন্তী আমাদের মাঝখানে দুজনের কাঁধ ধরে ঝুলে থাকবে-সেই অবস্থায় তাকে নিয়ে আমরা নদী পার হয়ে যাব। তাই হল, সুশৃঙ্খলে নদী পার হওয়া গেল। শুধু নদীর মাঝখানে আমাদের দু-জনের কাঁধে ঝুলতে ঝুলতে কুন্তী বারকতক চিল-চেঁচালে।

নদীর এপারে উঠেও জল খাওয়া হল না। নদীর জলও খুব ঘোলা। ঠিক হল অঘোরী বাবার আশ্রমে পৌঁছে জল খাওয়া হবে, অঘোরী বাবার আশ্রমে নিশ্চয়ই পরিষ্কার জল মিলবে। তখন চলতে আরম্ভ করলাম নদীর উজানের দিকে। আকাশের দিকে চেয়ে দেখলাম সূর্য পোয়াটাক পথ এগিয়ে এসেছেন।

চলছি তো চলছিই। বার বার ডান দিকে ঘাড় ফিরিয়ে দেখছি। কই, কোথাও পিছু নেই! বালির পাড় ক্রমশ উঁচু হয়ে উঠতে লাগল। তখন বাধ্য হয়ে আমরা সেই উঁচু পাড়ের উপর উঠলাম। নদীর জল অনেক নীচে রয়ে গেল।

সেই উঁচু বালির পাহাড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে চতুর্দিকে নজর করে দেখলাম। কই, কোথাও কিছু দেখা যায় না যে! অঘোরী বাবার আশ্রম কি তাহলে পিছনে ফেলে এলাম? হঠাৎ ভৈরবী চেঁচিয়ে উঠলেন-"ওই যে ওই–ওই দেখা যাচ্ছে কালো মতো!" নজর করে দেখলাম-ঠিকই, একটা বালির টিলার পাশ দিয়ে কালো মতো কি উঁচু হয়ে রয়েছে। নিশ্চয়ই অঘোরী বাবার আশ্রমের চাল। চললাম সেই দিকে এগিয়ে। তখন নদীর জলও চোখের আড়ালে চলে গেল।

তারপর অনেকক্ষণ ধরে চলতে লাগলাম, সেই কালো মতো যা দেখেছিলাম তার দিকে। একবার একটা বালির টিলার মাথায় উঠি আবার নেমে যাই। আবার সামনের টিলাটার মাথায় উঠি।

বার বার মনে হতে লাগল, ওই তো দেখা যাচ্ছে অঘোরী বাবার আশ্রমের ছাত, সামনের ওই বালির টিলাটা পার হলেই হয়। শেষে একসময় খেয়াল হল-তাই তো, নদীর কাছ থেকে এতদূরে কি অঘোরী বাবার আশ্রম! ওই বুড়ো মানুষ, এত দূর থেকে নদীতে যান! এত দূর থেকে মা হিংলাজের স্থানে আসা-যাওয়া করেন! এ কখনই সম্ভব নয়, আমরা অনর্থক ভুল জায়গায় ঘুরে মরছি।

কথাটা বললাম ওদের। ভৈরবীর মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম ফুটে উঠল। কুন্তীর চোখে ফুটে উঠল ত্রাস। এই প্রথমবার কুন্তী বলল, "জল খাব।"

মাথার উপর চেয়ে দেখলাম সূর্যদেব অনেকটা পথ পার হয়েছেন। ভৈরবী তাঁর শুকনো ঠোঁট একবার জিব দিয়ে চাটলেন। বললেন-"সেই ভালো, চলুন নদীর ধারেই ফিরে যাই। নিশ্চয়ই আমরা ফেলে চলে এসেছি অঘোর বাবার আশ্রম। নদীর ধার খুঁজলেই পাওয়া যাবে।"

ফিরে চললাম আবার। আবার সেই একবার একটা বালির ঢেউ-এর মাথায় চড়া আবার নামা, আবার চড়া। ফিরছি তো ফিরছি। যতবার উঠছি একটা ঢেউ-এর মাথায় ততবার নজর করে দেখছি নদী দেখা যায় কিনা। না, দেখা যাচ্ছে না নদী। কিন্তু নিশ্চয়ই দেখা যাবে ওই সামনের ঢেউটার মাথায় চড়লে। মনে জোর এনে আবার পা চালাচ্ছি। আবার প্রাণপণে উঠছি সামনের টিলাটার মাথায়। কপালের উপর হাত রেখে রোদটাকে আড়াল করে দেখছি-কই, কোথায় নদী? শুধু ধূ ধূ করছে বালি আর বালি। আদিগন্ত খাঁ খাঁ করছে। হঠাৎ খেয়াল

হল হিংলাজ পাহাড়ের কথা নদীর এ-পাড় থেকে ও-পাড়ের পাহাড়টাকে দেখতে পাওয়া যায়। ডাইনে বাঁয়ে, সামনে পিছনে কোনো দিকে কোথাও পাহাড়ের চিহ্নমাত্র নেই। ভৈরবীর মুখের দিকে একবার চাইলাম, কুন্তীর মুখের দিকেও। ওরা রুদ্ধ নিশ্বাসে প্রতীক্ষা করছে আমার মুখ থেকে কিছু শোনবার জন্যে। কিন্তু কি বলব আমি, বলবার আছে কি! কোনো কথা যোগাল না মুখে। একটা ঢোক গিলতে গেলাম। ঢোক গিলব কি, গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে।

মাথার উপর অগ্নিবৃষ্টি হচ্ছে। চোখেও ঝাপসা দেখছি, পায়ের তলা পুড়ে যাচ্ছে। আবার একবার ওদের মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম। কুন্তী কেমন যেন অদ্ভুতভাবে চেয়ে আছে আমার দিকে। ভৈরবী চোখ বুজে ফেলেছেন। যা হয়েছে তা আর মুখ ফুটে বলতে হল না। তিনজনেই তিনজনের বুকের ভিতর কি হচ্ছে স্পষ্ট বুঝতে পারছি। দ্বিতীয়বার কুন্তী উচ্চারণ করলে, "জল খাব।"

চোখ চেয়ে ভৈরবী বললেন, "জল কোথায়?" বলে রক্তবর্ণ চোখে আমার দিকে ফ্যালফ্যাল করে চেয়ে রইলেন।

সজোরে নিজের মাথায় একটা ঝাঁকানি দিলাম। চোখের দৃষ্টি একটু পরিষ্কার হল। দু-হাতে ওদের দু-জনের হাত ধরে টান দিলাম। "চলো-এগিয়ে চলো আমার সঙ্গে। সামনেই নদী, নদীর ধারে না গেলে জল পাবে কোথায়?"

কুন্তীর চোখ ঘোলাটে হয়ে গেছে। সে তৃতীয়বার উচ্চারণ করলে, "জল খাব।"

চললাম আবার ওদের দুজনকে টেনে নিয়ে।

যাচ্ছি, কোথায় যাচ্ছি তা নিজেও জানি না। কেন যাচ্ছি তাও জানি না। তবু যাচ্ছি, কারণ না গিয়ে করবই বা কি? যতক্ষণ শক্তিতে কুলোয় যাব। যেতে যেতে একসময় নিশ্চয়ই বালি শেষ হয়ে যাবে। কোথাও না কোথাও নিশ্চয়ই এর শেষ আছে। সেইখান পর্যন্ত পৌঁছতে হবে। তিনজনেই মুখ বুজে যাচ্ছি, ওরা হাত ছাড়াবার জন্যে জোর করছে না। মাঝে মাঝে শুধু ওদের হাত টান দিতে হচ্ছে। যখন টান দিচ্ছি তখন ওরা চোখ খুলে আমার মুখের দিকে চেয়ে দেখছে। দেখে আবার চোখ বন্ধ করে হাঁটছে। কোনো আপত্তি নেই। আমি যেখানে নিয়ে যাব সেখানেই যাবে কিন্তু আমি এদের কোথায় টেনে নিয়ে চলেছি!

ওদের হাত ছেড়ে দিলাম। ওরাও দাঁড়িয়ে পড়ল। চতুর্থবার কুন্তী বলল, "জল খাব।" কিন্তু এবার আর চোখ চেয়ে বললে না। কি রকম যেন জড়িয়ে গেল তার কথা।

ভৈরবী চোখ চাইলেন। চতুর্দিকে নজর করে কি দেখতে লাগলেন। তারপরে একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে চোখ বুজে ফেললেন।

একটা ঢোক গিলবার চেষ্টা করলাম। নোনতা বিস্বাদ লাগল গলার মধ্যে। তবু গলার ভিতরটা একটু ভিজল। তখন বললাম ভৈরবীকে-"কি, হয়েছে কি আমাদের যে এরই মধ্যে আমরা জল জল করে এলিয়ে পড়েছি! শিবারাত্রির উপোস করে চব্বিশ ঘণ্টা জল না খেয়ে কাটাই। মহাষ্টমীর দিন কোনো কোনো বার ভোর হয়ে যায় জল খেতে। আর কাল অর্ধেক রাতে জল খেয়েছি, এখনও অর্ধেক দিন পার হল না, এর মধ্যে জল জল করে মরে যাচ্ছি? কেন, হয়েছে কি আমাদের?"

বাংলা কথা কুন্তী বুঝলে না। তবে কাজ হল। তার চোখের ঘোর কেটে গেল। ভৈরবীও একটু চাঙ্গা হয়ে উঠলেন–"তবে কোথাও একটু বসা যাক না। মিছিমিছি ঘুরে মরছি কেন রোদের মধ্যে? রোদ কমলে আবার তখন হাঁটা যাবে।"

কুন্তী জিজ্ঞাসা করল, "কি হয়েছে?"

বললাম, কিছুই হয়নি। এই রোদের মধ্যে অনর্থক ঘুরে ঘুরে আরও তেষ্টা বেড়ে যাচ্ছে। চলো কোথাও একটু বসি। রোদ পড়ুক, তখন খুঁজে দেখা যাবে কোথায় নদী।"

কুন্তী আর কিছু বললে না। তখন চললাম আবার তিনজনে, যদি কোথাও একটু ছায়া পাওয়া যায় এই আশায়।

কোথায় ছায়া? একটি গাছপালা কোথাও নেই। তবু চলেছি। মনে হচ্ছে আর খানিকটা এগোলেই হঠাৎ চোখে পড়বে নদী; তরতর করে বয়ে যাচ্ছে জল, নদীর নাম অঘোর। আর

একবার নজর করে দেখলাম, কোনো দিকে পাহাড় দেখা যাচ্ছে না তো? পাহাড় দেখা গেলেই নদী পাওয়া যাবে। নদী বয়ে যাচ্ছে পাহাড়ের কোল দিয়ে। কোথায় পাহাড়, শুধু বালি আর রোদ, রোদ আর বালি। মাথার উপর মার্তণ্ডদেব কিছুতেই নড়লেন না।

তবু চলেছি। অন্তিম চেষ্টায় দাঁতে দাঁত দিয়ে চলেছি। আবার ওদের দুজনের হাত ধরে টেনে নিয়ে চলেছি। একবার বসে পড়লে যদি আর উঠতে না পারি। যতক্ষণ চলব ততক্ষণ একটা না একটা কিছু ঘটবার আশা আছে, কোথাও না কোথাও পৌঁছবই শেষ পর্যন্ত। কিন্তু বসে পড়া মানে একেবারে সব শেষ। আর কিছুই আশা করবার থাকবে না। বসে পড়লে আস্তে আস্তে যেখানে গিয়ে পৌঁছব সেখান থেকে আর ফিরে আসা যায় না।

একটা টিলা থেকে নামলাম। সামনেই আর একটা টিলা। জায়গাটা গর্তের মতো। ছায়া আছে, ভৈরবী জোর করে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে সেখানে বসে পড়লেন, "নাঃ আর এক পা-ও যাব না। অনর্থক ঘুরে মরবার কোনো মানে নেই। যতক্ষণ সূর্যাস্ত না হচ্ছে এখানেই পড়ে থাকব।"

কুন্তীর হাত ছেড়ে দিলাম। সেও বসে পড়ল। তখন ওদের দিকে চেয়ে একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে কাঁধের ঝোলাটা নামিয়ে আমিও বসে পড়লাম ওদের পাশে...

এইখানে হিংলাজ-কাহিনী বলা সমাপ্ত হল। সেদিন সেই বালির গর্তে বসে পড়বার পরে মরুতীর্থ সম্বন্ধে আর কিছুই বলার রইল না। এর পর যা যা ঘটেছিল তার সঙ্গে মহাতীর্থ হিংলাজের কিছুমাত্র সম্পর্ক নেই, তা গুছিয়ে বলার শক্তিও আমার নেই। প্রবৃত্তি হয় না তার পরের ঘটনাগুলো মনে করবার। এখনও প্রাণপণ চেষ্টা করছি যদি কোনোরকমে ভুলতে পারি, একেবারে মুছে ফেলতে পারি মন থেকে যা কিছু ঘটেছিল তারপর। কিন্তু তা হবার উপায় নেই।

আজ উঠতে বসতে শত সহস্রবার নিজেকে নিজে ধিক্কার দিচ্ছি সেদিন সেই বালির গর্তে বসে পড়েছিলাম বলে। তারও আগে হিংলাজের গুহা থেকে বেরিয়ে রূপলালের সঙ্গে আকাশগঙ্গায় যেতে চাননি বলে ভৈরবী এখনও লুকিয়ে নিজের কপাল নিজে ঠোকেন। এই যে চোখ দুটো কপালের উপর জ্বলজ্বল করে জ্বলছে, এই চোখ দুটোই সেদিন চরম বেইমানি করেছিল। 'ওই অঘোরী বাবার আশ্রমের চাল দেখা যাচ্ছে' এই বলে জলের কাছ থেকে, নদীর ধার ছেড়ে, মিথ্যে মরিচীৎকার পিছনে ছুটেছিলাম এই চোখ দুটির বেইমানির জন্যেই। বাজারে গিয়ে যখন চোখে পড়ে থরে থরে ডাব সাজানো রয়েছে, তার পাশে রয়েছে লাল টকটকে তরমুজ আনারস পেঁপে লেবু আম, তখন চোখ দুটো জ্বালা করে ওঠে। বরফ আর শরবতের দোকানের সামনে দিয়ে হাঁটতে চাই না। ও সব এখন আমার দু চোখের বিষ। কেবলমাত্র একবার একটু ভাতের সঙ্গে ভিন্ন সারা দিন-রাতে তেষ্টায় ছাতি ফেটে গেলেও ভৈরবী এক ফোঁটা জল মুখে ছোঁয়ান না। বন্ধুবান্ধব আত্মজন কারও বাড়ি গেলে যখন শুনি, "একটু জল খাও", তখন কেন যে চমকে উঠি তা বলতে পারি না। আষাঢ়-শ্রাবণে যখন আকাশ ভেঙে নামে, তখন গভীর রাতে বিছানায় শুয়ে জল পড়ার শব্দ শুনতে শুনতে কেন যে পোড়া চোখ দুটোর জলে বালিশ ভিজতে থাকে, তার সঠিক কোনো অর্থ খুঁজে পাই না।

এখন যেদিকে তাকাই সেদিকেই জল। ফলে-ফুলে, আকাশে-বাতাসে লোকের চোখ-মুখে সর্বত্র জল। কিছুই শুকনো নয়। সবই সরস, সবই সজীব। দুনিয়ার এত জল-কিন্তু সেদিন এই পোড়া চোখ দুটোর বেইমানির জন্যে এক ফোঁটা জল কোথাও মিলল না।

জল।

অতি তুচ্ছ জিনিস। সকাল হবার আগেই পাইপ লাগিয়ে ফট ফট ফটাস শব্দে রাস্তায় ঢালতে থাকে, রাজপথ ধোয়া হয়। ঘুম থেকে উঠে কুলকুচো করতে লাগে দু ঘটি, সারাদিন পায়ে ঢালতে হয় দশ ঘটি, স্নান করতে কত ঘটি মাথায় ঢালি তার কি হিসেব আছে। সেদিন যখন সূর্যদেব শেষ পর্যন্ত সত্যই অস্ত গেলেন তখন আবার আমরা নিজেদের টেনে তুললাম, আবার চললাম জলের খোঁজে, আবার শুয়ে পড়লাম বালির উপর। তারপর ধমকানি খোশামুদি গালাগলি এই সমস্ত করে আবার উঠে দাঁড়ালাম সকলে, আবার খানিক ছোটাছুটি

করে পড়লাম এক জায়গায়। কি করে যে সারারাত কাটল, কে কাকে কি বললাম, সে কাহিনী মনের মধ্যে গুছিয়ে রাখবার মতো কি অবস্থা ছিল তখন, না তার সরস বিবরণ দেওয়া আজ সম্ভব! সে রাতের চরম কথাটা হচ্ছে এই যে, যতক্ষণ উঠে দাঁড়াবার সামর্থ্যটুকু ছিল শরীরে ততক্ষণ ছোটাছুটি করে কাটল সেই বালির সমুদ্রে। তারপর শেষবারের মতো শুয়ে পড়লাম তিনজনেই। তখন আমাদের অন্তিম অবস্থাটুকু দেখে আমোদ পাবার জন্যে সূর্যদেব ফিরে এলেন আকাশের গায়ে।

তার পরের ঘটনাটুকু অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত। মনে আছে কুন্তী চলে যাচ্ছিল বলে তাকে চুল ধরে টেনে এনে ফেলেছিলাম। একবার ভৈরবীর চোখে দু ফোঁটা জলও দেখেছিলাম। আর একবার খাড়া হয়ে বসে যখন ধাক্কা দিয়েও ওদের দুজনকে জাগাতে পারলাম না, তখন তিনটে ঝোলার সমস্ত জিনিসপত্র ঢেলে কি যেন খুঁজেছিলাম। তারপর ভৈরবীর আর কুন্তীর মুখ তাদের আঁচল দিয়ে ঢেকে দিয়েছিলাম। নিজেও শুয়ে পড়েছিলাম তারপর তপ্ত বালির উপর মুখ গুঁজড়ে। ব্যাস-আর কিছু মনে নেই।

তলিয়ে যেতে লাগলাম। সে কি অন্ধকার! নেমে যাচ্ছি সেই আঁধারের মধ্যে। কোনো জ্বালা নেই যন্ত্রণা নেই। বরফের মতো ঠান্ডা অন্ধকারের মাঝে ডুবে যাচ্ছি। অনবরত নামছি, আর নামছি সেই আঁধার-সমুদ্রে। এর যেন আর তল নেই। অনন্তকাল ধরে শুধু নেমেই যাব। কতক্ষণ ধরে যে ডুবে রইলাম সেই আঁধারের মাঝে তা বলতে পারব না। হঠাৎ কিসে গিয়ে ঠেকলাম। তৎক্ষণাৎ দপ করে আলো জ্বলে উঠল। পরিষ্কার দিনের আলো। চোখ চেয়ে দেখলাম।

এ কি! এ সব কি দেখছি! কি করছে ও?

বাধা দিতে গেলাম। কুন্তী টেরই পেলে না। বার বার বুক ফাটিয়ে চিৎকার করলাম-কুন্তী শুনতেই পেলে না। সে তার নিজের কাজ করে যেতে লাগল।

ভৈরবীর মুখের আঁচল সরিয়ে তাঁর মাথাটা ধরে টানাটানি করতে লাগল। জোর করে চোখের পাতা ফাঁক করে কি দেখলে। মুখের মধ্যে আঙুল দেবার চেষ্টা করলে বার বার। তারপর আস্তে আস্তে মাথাটা বালির উপর নামিয়ে রেখে আছড়ে এসে পড়ল আমার বুকের উপর। কি ভীবৎস দেখাচ্ছে কুন্তীর মুখ! ওর নাক দিয়ে রক্ত বেরুচ্ছে কেন? চোখের জলে চুলে রক্ত মিশে কি ভয়ঙ্কর দেখাচ্ছে কে!

কুন্তী আমার মাথাটা কোলের উপর তুলে নিল। নিয়ে ভয়ঙ্কর দৃষ্টিতে চেয়ে রইল আমার মুখের দিকে। কি কতকগুলো গজগজ করে বললে কাঁদতে কাঁদতে। বার বার আমার মুখের ভিতর আঙুল দিতে গেল। দু-হাতে নিজের দু-মুঠো চুল ছিঁড়ে ফেললে। তাতেও হল না, নিজের ডান হাতের পিট নিজের মুখে চেপে ধরল। ধরে দম বন্ধ করে রইল কিছুক্ষণ। হাতটা যখন মুখ থেকে নামাল তখন টপ টপ করে রক্ত পড়ছে হাতের পিঠ দিয়ে। কামড়ে মাংস ছিঁড়ে নিয়েছে কুন্তী নিজের হাত থেকে।

আরও সব পাগলামো করতে লাগল সে। তাকে বাধা দিতে গেলাম, বুক ফাটিয়ে চিৎকার করলাম, ধরলাম চেপে তার হাত। কুন্তী এবারও কিছুই টের পেলে না।

সে তখন তার জামাটা টেনে ছিঁড়ে ফেললে গা থেকে। নিজের পরনের কাপড়খানাও খুলে ফালা ফালা করে ফেলে দিলে। আবার ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল আমার বুকের উপর। মুখের উপর তার স্তন দুটি জোর করে আমার মুখে গুঁজে দিতে চেষ্টা করতে লাগল। তাতেও যখন কিছু হল না, তখন ঠাস ঠাস করে গোটাকতক চড় লাগাল আমার দু-গালে। আমার মাথার চুল দু-হাতের মুঠোয় ধরে অনবরত ঝাঁকাতে লাগল। শেষে অনেকক্ষণ ধরে চেয়ে রইল আমার চোখের দিকে।

তারপর কুন্তী আমাকে ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। দাঁড়িয়ে আবার কি ভেবে একবার আমার উপর ঝুঁকে পড়ে কি কতকগুলো বললে। কিছুই বুঝতে পারলাম না তার কথা। তার সেই রক্তমাখা ভয়ঙ্কর চেহারার দিকে চেয়ে রইলাম।

তখন কুন্তী আমাকে ছেড়ে দিয়ে উলঙ্গ অবস্থাতেই নিজের শরীরটাকে টানতে টানতে

হামাগুড়ি দিয়ে উঠতে লাগল বালির উপর টিলার উপর।

শেষবারের মতো প্রাণপণে চিৎকার করলাম, “কুন্তী, যাসনি, ফেলে যাসনি আমাদের!’

কুন্তী শুনতেই পেলে না।

আবার তলিয়ে যেতে লাগলাম অন্ধকারের মাঝে, বরফের মতো ঠাণ্ডা আর জমাট বাধা অন্ধকার। ব্যাস আর কিছু মনে নেই।

হাঁ, মনে পড়ছে বটে, একবার যেন সেই অন্ধকারের তল থেকে ফিরেছিলাম কয়েক মুহূর্তের জন্যে। সেই সময় যেন গুলমহম্মদের চিৎকারও শুনেছিলাম। চোখ মেলে দেখেছিলাম আমার মুখের উপরে একটা উটের মুখ। উটটা নাক দিয়ে আমার মুখ শুঁকছে। আর কিছুই মনে পড়ছে না। আবার তলিয়ে গেলাম সেই অন্ধকার সমুদ্রে।

এরপর এক রাত্রে একবার ঘুম ভেঙেছিল। চোখ চেয়ে দেখলাম টিমটিম করে একটা আলো জ্বলছে। মাথার কাছে বসে আছেন ভৈরবী। অতি কষ্টে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম–”আমরা কোথায়?” তিনি মুখের উপর ঝুঁকে পড়ে কানের কাছে মুখ এনে বললেন, “শোনবেণী ধর্মশালায়”। বলে আমার চোখের উপর হাত বুলিয়ে চোখ বন্ধ করে দিলেন। আবার ঘুমিয়ে পড়লাম!

১৩৫৩ সাল, ভাদ্র মাস।

করাচীর আর একপ্রান্তে সমুদ্রের কিনারায় একদিন বিকেল তিনটের সময় শেঠ ভগবান দাসের প্রকাণ্ড গাড়ি থেকে আমরা নামলাম। ডানদিকে কাঁটাতারের বেড়ার মধ্যে শত শত সি-প্লেন বালির উপর ডানা মেলে ঝিমোচ্ছে। বাঁদিকে ওই নীচে জলের ধারে সমুদ্রগামী প্রকাণ্ড পালের নৌকোটা ডাঙার দিকে কাত হয়ে রয়েছে।

ওই নৌকোতে ছ-দিন ছ-রাত সমুদ্রের বুকে পাড়ি দিয়ে কোটেশ্বর দর্শন করতে যাচ্ছি। কাছভুজের পশ্চিম দিকের শেষপ্রান্তে ভৈরব কোটেশ্বরের স্থান। মহাপীঠ হিংলাজ দর্শন করলে কোটেশ্বর দর্শন করতেই হবে। মা কামাখ্যার ভৈরব উমানন্দ, কালীর ভৈরব নকুলেশ্বর, তেমনি হিংলাজের ভৈরব কোটেশ্বর। ভৈরব দর্শন না করলে মহাপীঠ দর্শনের ফল হয় না।

লরিতে করে এল বড় বড় নতুন ছটা কলসি। কলসিতে আছে খাবার জল ছ দিনের। সমুদ্রের উপর ছ-দিন ওই জল খাব আমরা। মুখবন্ধ টিনে ঝুড়িতে টুকরিতে ফল মিষ্টি আরও কত কি। ছ-দিনের জন্যে ছ-মাসের খাদ্য নৌকোয় উঠছে।

শেঠজি, তাঁর পত্নী, করাচীর বন্ধুবান্ধবরা-যাঁরা আপ্রাণ চেষ্টায় আমাকে খাড়া করেছেন– তাঁরা সবাই এসেছেন নৌকোয় তুলে দিতে। ফুল, ফুলের মালা, প্রণামী, আতর, সিন্দূর-কুমকুমের ছড়াছড়ি। ক্লিক ক্লিক ফোটো উঠছে।

জোয়ার আসছে জলে। মাঝি-মাল্লারা নৌকার উপর ছুটাছুটি করছে। আমরা উঠে গেলাম। লম্বা কাঠখানা টেনে তুলে ফেললে নৌকোর উপর।

দুজনে পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছি ডাঙার দিকে চেয়ে। ভৈরবী কানের কাছে মুখ এনে বললেন, “আর দুটো দিন করাচীতে থেকে গেলে হত। গুলমহম্মদ বলে গেছে যে সে কুন্তীর খবর নিয়ে ফিরে আসবে। তাদের দেশসুদ্ধ লোক কুন্তীকে খুঁজছে। নিশ্চয়ই তাকে পাওয়া গেছে এতদিনে।

গোটাকতক পাল একসঙ্গে উঠে গেল উপরে দড়ির টানে। হই-হই করে উঠল নৌকোর লোকেরা। নৌকাখানাও হঠাৎ ঘুরে গেল। করাচীর ডাঙা চোখের আড়ালে চলে গেল।

তিরবেগে নৌকো ছুটল সমুদ্রের বুকে। পালে বেশ বাতাস ধরেছে।

*****

অবধূত (১৯১০ – ১৩ এপ্রিল, ১৯৭৮) বা কালিকানন্দ অবধূত ছিলেন একজন বিশিষ্ট ভারতীয় বাঙালি ঔপন্যাসিক ও তন্ত্রসাধক। তাঁর প্রকৃতনাম দুলালচন্দ্র মুখোপাধ্যায়। জন্ম কলকাতার ভবানীপুরে। পুত্র অমল মুখোপাধ্যায়ের জন্মের পর প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু হলে উজ্জয়িনীর মহাকাল মন্দিরে সন্ন্যাস (অবধূত) গ্রহণ করেন। সন্ন্যাসজীবনে তাঁর নাম হয় কালিকানন্দ অবধূত। সন্ন্যাসজীবনে তাঁর ভৈরবী স্ত্রীও ছিল। হুগলি জেলার চুঁচুড়ায় স্বপ্রতিষ্ঠিত রুদ্রচণ্ডী মঠে তাঁর মৃত্যু হয়।

অবধূত ছদ্মনামে তিনি একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। ১৯৫৪ সালে 'মরুতীর্থ হিংলাজ' নামক উপন্যাস রচনা করে খ্যাতি অর্জন করেন। এই উপন্যাসটি অবলম্বনে একটি জনপ্রিয় চলচ্চিত্রও নির্মিত হয়, যার কেন্দ্রীয় চরিত্রে অভিনয় করেন বিকাশ রায় ও উত্তমকুমার। তাঁর অপর বিখ্যাত গ্রন্থ উদ্ধারণপুরের ঘাট (১৯৬০)।

হংসনারায়ণ ভট্টাচার্য তাঁর সম্পর্কে লিখেছেন, "উদ্ভট কাহিনী-কল্পনা, বীভৎস রস, তান্ত্রিক ধর্মসাধনার গুহ্য রহস্য ও উৎকট যৌনাচার অবধূতের রচনার বৈশিষ্ট্য,–শক্তিমত্তা সত্ত্বেও শিথিল বিন্যাস ও যৌনতার আধিক্য ত্রুটিরূপে গণ্য।" শিশিরকুমার দাশের মতে, "তাঁর রচনার বৈশিষ্ট্য ভয়াবহ ও বীভৎস রসের আধিক্য। প্রবল জনপ্রিয়তা সত্ত্বেও কোনো কোনো সমালোচক তাঁর বিষয়-নির্বাচন ও প্রয়োগরীতির প্রতি সংশয়ী ছিলেন।"

উপন্যাসতালিকা

অবধূত রচিত উপন্যাসগুলি হল :

মরুতীর্থ হিংলাজ (জুলাই, ১৯৫৪), হিংলাজের পরে, বশীকরণ, তাহার দুই তারা (১৯৫৯), উদ্ধারণপুরের ঘাট (১৯৬০), ক্রীম (১৯৬০), পিয়ারী (জুলাই, ১৯৬১), বহুব্রীহি, ভোরের গোধূলি, টপ্পা ঠুংরী (১৩৭৬ বঙ্গাব্দ), ভূমিকা লিপি পূর্ববৎ, কান পেতে রই, তুমি ভুল করেছিলে, অনাহত আহুতি, স্বামীঘাতিনী, ফক্করতন্ত্রম্ (১ম, ২য় ও ৩য় পর্ব), দুর্গম পন্থা (১৩৬৮ বঙ্গাব্দ), নীলকণ্ঠ হিমালয়, মন মানে না, সাচ্চা দরবার, উত্তর রাম চরিত, সুমেরু কুমেরু, একটি মেয়ের আত্মকাহিনী।